ভারতের শাসন ব্যবস্থা

ও

রাজনীতি

নির্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য

নবজাতক প্রকাশন

এ-৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলি-১২

প্রথম প্রকাশ
১৭ই মে, ১৯৬২

প্রকাশক
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ-৭৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১৩

মুদ্রক
সুধীর পাল
সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১৪/১এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
খালেদ চৌধুরী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি

যে সকল লিখিত আইন ও অলিখিত প্রথাসমূহের দ্বারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে শাসনতন্ত্র বা Constitution বলা যায়। শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতা ও গঠনপ্রণালী, নাগরিকগণের অধিকার এবং সরকার ও নাগরিকবর্গের আইনগত সম্বন্ধ বর্ণিত হয়। শাসনতন্ত্র জাতীয়-জীবনকে সংহতি দান করে এবং রাষ্ট্রের অধিবাসীগণের জীবনধারাকে একটি বিশিষ্ট রূপ দেয়। দেশের শাসনব্যবস্থা দ্বারা নাগরিকবৃন্দের চিন্তা ও মনন, রাজনৈতিক চরিত্র ও নীতিবোধ যে অনেক পরিমাণে প্রভাবিত হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায় যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা জাতির জীবনকে একটা বিশিষ্টরূপে গড়িয়া তোলে। সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্রে অর্থনৈতিক ও সর্বপ্রকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবেশে মানুষের জীবন নির্বাধায় নানাভাবে বিকশিত হইবার সুযোগ পায়। একনায়কত্বভিত্তিক শাসনতন্ত্র মানুষের জীবনকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেয় না। কারণ সেইরূপ রাষ্ট্রে নাগরিকগণের চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নাই। তাহার ফলে মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ব্যাহত হয়।

শাসনতন্ত্র জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যপক্ষে জাতির ইতিহাস, ধ্যান-ধারণা ও জীবনবোধ অনেকাংশে শাসনতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি ঐ দেশের মানুষের চিন্তা ও ইতিহাসের সৃষ্টি। বিভিন্নকালে স্বৈরাচারী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জাতির পুনঃপুনঃ সংগ্রাম ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রকে একটি বিশিষ্ট রূপ দান করিয়াছে। ভারতের বর্তমান সংবিধান ও শাসন-ব্যবস্থাকে সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে ভারতে ব্রিটিশ আমলের শাসনপদ্ধতি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত-বাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করা প্রয়োজন হয়। শুধু রাজনৈতিক ইতিহাস নহে, শাসনতন্ত্রের মূল ও তাহার প্রকৃতি সন্ধান করিতে হইলে জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিবৃত্তের মধ্যেও প্রবেশ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। এই কারণে শাসনতন্ত্রকে শুধুমাত্র প্রশাসনিক নিয়মাবলী বলিয়া গণ্য করা ঠিক নহে। ইহাকে জাতীয় জীবন ও চরিত্রের পরিচায়করূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতে শাসনব্যবস্থার মূলসূত্র

পতন ও অভ্যুদয়ের বন্ধুর ও অন্তহীন পথ ব্যাপ্ত করিয়া ইতিহাসের ধারা প্রসারিত। খৃ: পূঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেকার মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পার যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত বিভিন্ন কালে, বিচিত্র ঐতিহাসিক পরিবেশ প্রভাবে এই মহান দেশে এবং তাহার বিভিন্ন অঞ্চলে নানাপ্রকারের রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী এই সকল রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা নানা আকার ধারণ করিয়াছে। সাধারণভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্র ও রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যতন্ত্র এই তিন প্রকারের শাসন-ব্যবস্থাই উদ্ভূত হইয়াছিল।

সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে, প্রাচীন মুদ্রা ও শিলালিপিতে এবং বৈদেশিক পরিব্রাজক ও বিবরণী লেখকগণের বর্ণনায় যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যাদি আস্তীর্ণ রহিয়াছে, তাহা হইতে পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে যদিও প্রাচীন ভারতে সাম্রাজ্যতন্ত্র বা রাজতন্ত্রই অধিকাংশ রাষ্ট্রে প্রচলিত ছিল, তথাপি প্রজাতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতিরও অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রাচীন ভারতে প্রজাতন্ত্রকে 'বৈরাজ্য' আখ্যা দেওয়া হইত। প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহারের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রজাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার প্রকারভেদ দেখা যায়। কোনো কোনো প্রাচীন প্রজাতন্ত্রে সর্বোচ্চ শাসক জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। নির্বাচিত শাসককে রাজা আখ্যা দেওয়া হইত। কোনো কোনো প্রজাতন্ত্রের প্রথানুযায়ী ধনী বা অভিজাত শ্রেণী হইতে তাহাদেরই দ্বারা শাসক বা শাসকমণ্ডলী নির্বাচিত হইতেছেন দেখা যায়। কোনো কোনো প্রজাতন্ত্রে সভা বা সমিতিকে রাজ্যশাসনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেওয়া হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সভা বা সমিতির সভ্যবর্গ ছিলেন কেবল ধনী বা অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, দরিদ্র জনসাধারণ বা নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোনো রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। নির্বাচিত শাসক (যাহাকে রাজা আখ্যা দেওয়া হইত) সভা বা সমিতির পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করিতে বাধ্য থাকিতেন।

বৈদিক আর্যগণের ইতিহাসের প্রথম যুগে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ছিল উত্তরাধিকারভিত্তিক রাজতন্ত্র (hereditary monarchy)। কিন্তু রাজার ক্ষমতা 'সভা' বা 'সমিতি' নামক গণতান্ত্রিক সংগঠন কর্তৃক সীমাবদ্ধ ছিল। এই সীমাবদ্ধ রাজশক্তি কতকাংশে পাশ্চাত্য সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের (Limited monarchy) অনুরূপ। বৈদিক সভ্যতার দ্বিতীয় যুগে দেখা যায় যে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই যুগেও রাজাকে অভিষেকের সময় যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত, তাহার দ্বারা

প্রমাণিত হয় যে রাজার ক্ষমতা একেবারে নিরঙ্কুশ ছিল না। অভিষেকের সময়ে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইত যে তিনি কখনো প্রজাপীড়ক হইবেন না এবং ব্রাহ্মণকুল ও সভার মতামত মানিয়া চলিবেন।[1]

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুকুশ হইতে গোদাবরী নদীর উত্তর পর্যন্ত নানা শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহার কতকগুলি রাজতান্ত্রিক আবার কতকগুলি প্রজাতান্ত্রিক। উত্তর বিহারের 'ভৃজ্জী-লিচ্ছভী' রাষ্ট্র গোষ্ঠী (federation) ছিল প্রজাতান্ত্রিক। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধাচারী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপেই এই প্রজাতন্ত্রগুলির আবির্ভাব ঘটে। ইহাদের প্রশাসন ও বিচার কার্যাদি গণবৈঠকে নিয়ন্ত্রিত হইত। এই গণবৈঠকগুলির নাম ছিল পরিষদ। প্রশাসনিক ক্ষমতা সমাজপ্রধানদের হাতে ন্যস্ত ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে মগধাপতি বিম্বিসারের পুত্র রাজা অজাতশত্রু উত্তর বিহারের 'ভৃজ্জী-লিচ্ছভী' প্রজাতন্ত্রকে জয় করিয়া মগধের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। শাসনতন্ত্রের ইতিহাসের দিক হইতে বিবেচনা করিলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে রাজতন্ত্রেরই ধারাবাহিকতা দেখা যায়। প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের সংঘাতে তাহা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে নাই।

সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ 324-300) তাঁহার দরবারে প্রেরিত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস্ তদানীন্তন মৌর্য রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতির বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে তদানীন্তন শাসনতন্ত্র প্রশাসন বিভাগ, সমর বিভাগ, বিচার বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। অর্থশাস্ত্র প্রণেতা কৌটিল্য তৎকালীন শাসনপদ্ধতি বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য অপরিসীম। 'অমাত্যবর্গ' সম্রাটকে প্রশাসন সম্পর্কে সহায়তা করিতেন এবং জরুরী অবস্থায় সম্রাট মন্ত্রী পরিষদ নামক একটি সংস্থার সহিত পরামর্শ করিতেন। রাজধানী পাটলিপুত্রে নগর-শাসনের ভার ত্রিশজন সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিষদের হাতে ন্যস্ত ছিল। পাঁচজন করিয়া সদস্য লইয়া ছয়টি সমিতি বা কমিটি গঠিত হইত। তাহাদের উপর নগর সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের কার্যের ভার দেওয়া ছিল। বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনের জন্য বিভিন্ন প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল। গ্রাম শাসন-ব্যবস্থারও ভার ছিল

1 প্রাচীন ভারতে প্রজাপীড়ক ও রাজার বিরুদ্ধাচরণ ন্যায়সংগত বলিয়া বিবেচিত হইত। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে লিখিত হইয়াছে : "যিনি (রাজা) প্রজা রক্ষা করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কলিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ মিলিত হয়ে বধ করবে।" রাজশেখর বসু : মহাভারত, পৃঃ 618।

'গ্রামীন' বা গ্রাম প্রধানদের উপর। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সম্রাটকে প্রজা-কুলের সেবক হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন যে প্রজাবর্গের সুখ-সমৃদ্ধি ও তাহাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলেই সম্রাটের সুখ-সমৃদ্ধি এবং কল্যাণ। এই আদর্শ অনুযায়ী যদি সম্রাট কর্তব্য সম্পাদন করেন তাহা হইলেই সম্রাট প্রকৃত সম্রাটরূপে পরিগণিত হইতে পারেন।

মৌর্যযুগের আর একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার মত। সেই সময়ে রাষ্ট্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিত। বৃহৎ খনিসমূহ, সূতা তৈরী ও বয়নশিল্প কিছু পরিমাণে রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন ছিল। কিন্তু এই সকল শিল্পে রাষ্ট্র একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করে নাই। অন্যান্য মালিকদেরও খনি, সূতা, ও বয়ন শিল্পে পৃথকভাবে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার ছিল। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও ব্যক্তিগত মালিকানার সহ-অবস্থান নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল। এই সকল ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত মালিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার স্থান ছিল। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যায় যে মৌর্যযুগে সীমিতভাবে State Socialism বা রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। তাই মৌর্যযুগের উৎপাদন ব্যবস্থা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।[1]

গুপ্ত সম্রাটগণের (খৃঃ চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দী) রাজত্বকালেও সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার জন্য প্রশাসন ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। বিচার বিভাগ, সমর বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে সম্রাটকে সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রী নিযুক্ত হইতেন। সম্রাট আপন ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুযায়ী মন্ত্রীবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ভারত ইতিহাসে গুপ্তযুগের সূচনা হইতে অর্থাৎ খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের আর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবলমাত্র গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়।

যখন রাজতন্ত্র কায়েম হইয়াছে, তখনও রাজা প্রজাবর্গের বা তাহাদের মধ্যে বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিগণ দ্বারা রাজপদে অভিষিক্ত হইতেছেন, এরূপ দৃষ্টান্তও প্রাচীন ভারতে বিরল ছিল না। পাল বংশের (খৃঃ অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী) প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোপাল বাংলার 'প্রকৃতি-পুঞ্জ' (Constituent elements) কর্তৃক নৃপতিরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ঠিক সেইরূপে নন্দী বর্মণ পল্লব মল্ল 'মূল-প্রকৃতি' (Basic elements)

কর্তৃক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। থানেশ্বর রাজ হর্ষ (খৃঃ সপ্তম শতাব্দী) ও গুজরাটের রাজা কুমার পাল অভিজাতবর্গের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজমুকুট লাভ করেন। কাশ্মীর রাজ যশস্কর ব্রাহ্মণ সভা কর্তৃক রাজপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু এই গণতান্ত্রিক প্রথা শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যায়। গুপ্ত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তীকালে এই ঐতিহ্য আর দেখা যায় না। এই সূত্রে গুপ্তযুগের একটি স্তম্ভলিপি উল্লেখযোগ্য। সমকালীন এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই লিপির মূলে যে নীতি লক্ষিত হয় তাহা ইউরোপের Divine Right of Kings নামক তত্ত্বের সহিত তুলনীয়।[1]

মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থার মূলসূত্র

মধ্যযুগে শক্তিশালী সার্বভৌম রাজতন্ত্র ছিল ভারতের একমাত্র শাসন-ব্যবস্থা। শাসনতন্ত্রের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আফগান রাজন্য-বর্গের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন শেরশাহ। তিনি যে শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তাহা অনেকাংশে মোগল সম্রাটেরা এবং পরবর্তীকালে ইংরেজ শাসবকর্গও কিয়ৎ পরিমাণে অনুসরণ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক কীন্ বলিয়াছেন যে শেরশাহ নূতন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ। ইংরেজরাও তাহা দিতে পারেন নাই। "No Government—not even the British has shown so much wisdom as this Pathan." (Keane)[2]

পাঠান সম্রাট শেরশাহের (ষোড়শ শতাব্দী) শাসনব্যবস্থায় সমস্ত ক্ষমতা তার নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত ছিল সত্য, কিন্তু সেই ক্ষমতা সর্বদা প্রজাসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হইত। সাম্রাজ্য সাতচল্লিশটি সরকারে বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল এবং প্রতি প্রদেশ কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল। গ্রামের শাসনব্যবস্থা গ্রাম্য প্রধানের হাতে ন্যস্ত ছিল। শের শাহের ভূমি সংক্রান্ত আইন ও রাজস্ব সংগ্রহের বন্দোবস্ত যেমন সুচিন্তিত তেমনই জনগণের কল্যাণকর ছিল। তিনি নিষ্ঠাবান্ মুসলমান

হইলেও কখনো গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নাই। শাসনের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মসলমানের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নাই। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর যে ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন শেরশাহ তাহার সূচনা করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ্ বলেন যে শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেও আকবর অনেক বিষয়ে শেরশাহের প্রশাসন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হন। ভারতীয় শাসকবর্গের মধ্যে বাদশাহ আকবরের রাজত্ব শুধু ভারতের ইতিহাসে নহে, বিশ্ব ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। আকবর শাহের শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্রের একটি উদাহরণ বটে, কিন্তু তাঁহার শাসনতন্ত্রের গঠন ও পরিচালনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রজাবর্গের কল্যাণসাধন। সম্রাট আকবরের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিত ছিল, তাহার ভূমি আইন ও রাজস্বব্যবস্থা সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। সম্রাট আকবর কর্তৃক হিন্দু-তীর্থ যাত্রী কর ও জিজিয়া কর রদ, সম্রাটের সকল ধর্মের মানুষের প্রতি সমদর্শিতার পরিচায়ক।

স্বায়ত্বশাসন

প্রাচীন ভারতে ও মধ্যযুগে স্বায়ত্ব শাসনের নিদর্শন গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন যুগে স্বায়ত্বশাসন দক্ষিণ ভারতে বিশেষভাবে স্থায়িত্ব এবং শক্তি অর্জন করিয়াছিল। 'উত্তর-মালুড়' লিপি ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। আফগান ও মুঘল রাজন্যবর্গও ভারতের প্রাচীন স্বায়ত্বশাসনমূলক ব্যবস্থার কাঠামো মূলতঃ প্রচলিত রাখিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে গণতান্ত্রিক 'জনপদ পরিষদ' (Zonal Council), 'পৌরসভা' (Town Council) ও 'গ্রামসভা' (Village Council) শহর ও পল্লী অঞ্চলের শাসন নিয়ন্ত্রিত করিত। ইহা ব্যতীত 'শ্রেণী' (Trade Guilds অথবা Caste Guilds) বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের ও জাতির (Caste) জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মাবলী গঠন করিবার অধিকারী ছিল।

এল্‌ফিন্‌স্টোন, মান্‌রো, হেনরী মেইন প্রমুখ ইংরেজ শাসক ও ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলির সপ্রশংস আলোচনা করিয়াছেন। উভয় যুগেই গ্রামীণ পঞ্চায়েৎকে স্থানীয় প্রশাসনিক অধিকার ও কতকগুলি বিষয়ে বিচার ক্ষমতা দেওয়া হইত। ইংরেজ আমলে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে শাসনক্ষমতা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত করার ফলে ভারতীয় গ্রামীণ

স্বায়ত্বশাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলি লয় প্রাপ্ত হয়। লক্ষণীয় যে, প্রাচীন ভারতে খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে এবং মধ্যযুগে আফগান ও মুঘল আধিপত্যের কালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল, কিন্তু. তথাপি রাজা বা সম্রাটের পক্ষ হইতে স্থানীয় শাসনপদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। কিন্তু ইংরেজ আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসনের অবসান হয়। তার ফলে ভারতীয়েরা আত্মশক্তি, স্বনির্ভরতা ও স্বাধিকারে বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে এবং জাতির নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনপদ্ধতি (1607–1858)

বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার

ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ডস্ প্রভৃতি দেশে একটি নূতন অর্থনীতির উদ্ভব হয়। সামন্ততন্ত্রের অবনতি ঘটে। সামন্ত শ্রেণীর স্থলে বণিক শ্রেণী সমাজে ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করিতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকেরা তাহাদের বৈদেশিক বাণিজ্য সমুদ্র পারে, দেশ-দেশান্তরে বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। এই বণিক শ্রেণীই পরবর্তীকালে পুঁজিপতিরূপে বর্তমান ধনতান্ত্রিকতার গোড়াপত্তন করে।

পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফরাসীজাতির বণিকশ্রেণী ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লাভবান হইতে থাকে। এই সকল জাতির মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র ইংরেজ ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাণিজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষাকল্পে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। তাই বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে তাল রক্ষা করিয়া ইংরেজের সাম্রাজ্য বিস্তার চলিতে থাকে। ভারতবর্ষের সহিত ইংরেজের সম্পর্কের সূত্রপাত হইয়াছিল বাণিজ্যসূত্রে। কিন্তু কালক্রমে 'বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে' দেখা দিল। 1760 সালের অনতিকাল পরে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে। নূতন উৎপাদন প্রথা দেখা দেয়। বাণিজ্য বিস্তারের সময় যেমন সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রয়োজন হইয়াছিল ঠিক তেমনি শিল্পবিপ্লব হইতে উদ্ভূত নূতন ধনতান্ত্রিক যুগে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রসার অপরিহার্য হইয়া উঠে। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনে ব্রিটেন ভারতে বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া বসিল। এই রূপান্তর দীর্ঘ তিনশত চল্লিশ বৎসরে (1607–1947) ঘটিয়াছিল।

ব্রিটেন কর্তৃক ভারত শাসনের ইতিহাস চারটি যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(1) প্রথম যুগ : 1607-1757

(2) দ্বিতীয় যুগ : 1757-1858

(3) তৃতীয় যুগ : 1858-1919

(4) চতুর্থ যুগ : 1919-1947

প্রথম যুগ : 1607-1757

প্রথম যুগের বৈশিষ্ট্য এই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক একটি বণিক প্রতিষ্ঠান 1600 খৃঃ ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে চার্টার বা সনদ লাভ করে এবং 1607 সালে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সনদ অনুযায়ী কোম্পানী ভারতে ব্যবসা-সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার ও সীমিত আইন বা নিয়মাবলী প্রণয়ন-ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। এই দেশে আসিয়া এই বিদেশী বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান মোগল সম্রাট ও দেশীয় রাজণ্যবর্গের নিকট হইতে বাণিজ্যের অধিকার ও কতকগুলি রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা পায়। এই সুযোগসমহ ধীরে ধীরে ব্যাপকতালাভ করে এবং ক্রমশঃ কোম্পানী কিছুটা ভারতীয় ভূ-খণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ভারতে কোম্পানীর ব্যবসায় ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারও কোম্পানীকে নানাভাবে সহায়তা করিতে থাকে। ভারতীয় রাজশক্তির দুর্বলতা ও একতাহীনতা এবং পরস্পরের প্রতি হীন বিদ্বেষের সুযোগ লইয়া ছলে, বলে, কৌশলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল।

সি, পি, ইলবার্ট মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতে ব্রিটেনের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস দুইটি। প্রথম, ব্রিটিশরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সনদসমূহ এবং পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত আইন। দ্বিতীয়, মোগল সম্রাট ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের নিকট হইতে সনদ বলে প্রাপ্ত বা বলপূর্বক আদায় করা অধিকার সমূহ।[1]

1600 খৃঃ প্রদত্ত প্রথম সনদের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের নিকট হইতে যে সকল সনদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাভ করিয়াছিল তাহার মধ্যে 1609, 1661, 1683, 1686, 1693, 1698, 1757 ও 1758 সালের সনদ কয়টি উল্লেখযোগ্য। 1758 সালের পর নূতন সনদ বহুবার দেওয়া হয় কিন্তু তাহা দেওয়া হইয়াছিল পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন বলে। রাজকীয় সনদগুলিকে বলা হইত শুধুমাত্র চার্টার, পার্লামেণ্ট প্রণীত চার্টারগুলিকে চার্টার এ্যাক্ট বলা হয়। 1600 খৃঃ হইতে 1766 পর্য্যন্ত, দীর্ঘ একশত ছেষট্টি বৎসর রাজকীয় সনদ দ্বারা কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। শেষোক্ত সালেই সর্বপ্রথম পার্লামেণ্ট কোম্পানীর ভারতশাসন ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে। ইহার পর হইতে পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা কোম্পানীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল।

---

1 C. P. Ilbert : 'Government of India', Historical Survey (1922) p. 1.

কিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত অভ্যন্তরস্থ সংগঠনগুলি আইন প্রণয়ন, বিচার ও শাসন পরিচালন প্রভৃতি রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল তাহা অতিশয় কৌতূহলজনক ও গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথ যে রাজকীয় সনদ কোম্পানীকে দান করিয়াছিলেন, তাহার সাংগঠনিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ঐ সনদের দ্বারা কোম্পানীকে যে নিয়মাবলী বা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল, তাহা দ্বারা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা করিতে পারিত। কোম্পানীর অধীনস্থ সর্বশ্রেণীর কর্মচারী, কুঠির পরিচালক, শিক্ষানবিশ প্রভৃতি সকলেরই উপর এই আইন বা বিধি নিষেধগুলি প্রযোজ্য ছিল। সি, পি, ইলবার্ট বলিতেছেন যে প্রথম দিকে প্রস্তুত আইন বা নিয়মাবলীর দলিলের সন্ধান পাওয়া যায় না বটে কিন্তু এই সকল আইনের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। কারণ এইরূপে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের আইন ক্ষমতার সূত্রপাত হয়।

আইন প্রণয়ন ব্যবস্থার ন্যায় প্রশাসনিক পদ্ধতির সূত্রপাতও তাৎপর্যপূর্ণ। 1612 সালে সুরাটে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। সেখানে আটজন সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ (Council) ও তাহার একজন সভাপতি (President) কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হন। 1661 সালে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস প্রদত্ত রাজকীয় সনদ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থার কাঠামো আরও স্পষ্ট আকার ধারণ করে। ঐ সনদ অনুসারে কোম্পানীকে তাহাদের কুঠি ও দুর্গের প্রশাসনিক ব্যবস্থা স্থির করিবার অধিকার দেওয়া হয়। তদনুযায়ী প্রতি দুর্গে একজন গভর্ণর ও তাহার কাউন্সিল বা পরিষদ গঠন করা হইল। গভর্ণর ঐ পরিষদের সভাপতি হইলেন। বিভিন্ন সময়ে মাদ্রাজ, কলিকাতা ও বোম্বাই অঞ্চলগুলিতে ঐরূপ শাসন-পদ্ধতি স্থাপিত হইল। এমনি করিয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থা শুরু হয় এবং ধীরে ধীরে বিবর্তিত হইতে থাকে। 1683 সালের চার্টার অনুযায়ী কোম্পানীকে দেশীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও তাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইল। এই সনদবলে সৈন্যদল গঠন ও সামরিক আইন জারি করিবার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। 1683 সালের চার্টার দ্বারা নৌ-বাহিনী গঠন ও তজ্জন্য এ্যাড্‌মিরাল, ভাইস-এ্যাড্‌মিরাল প্রভৃতি নৌ-বাহিনী নায়কদের নিয়োগের ক্ষমতাও কোম্পানী পাইল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রের যে সকল ক্ষমতা প্রয়োজন, সে সকলই ধীরে ধীরে কোম্পানীকে দেওয়া হয় এবং তাহারা তাহা ব্যবহার করিতে থাকে।

আইন ও প্রশাসনের ন্যায় বিচার ক্ষমতার উদ্ভবও কৌতূহলজনক।

রাণী প্রথম এলিজাবেথের সনদ অনুযায়ী কোম্পানীকে তাহাদের বাণিজ্য কেন্দ্রে বিচারালয় স্থাপনের অধিকার দেওয়া হয় নাই। রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ 1661 সালের সনদের দ্বারা এই ক্ষমতা কোম্পানীকে দান করেন। কিন্তু এই সনদের বলে যে বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা দীর্ঘকাল কার্যকর থাকে না। 1678 সালে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম এই ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়। এই সময়ে মাদ্রাজ ছিল কোম্পানীর ব্যবসায়ের একটি প্রধান কেন্দ্র। সেখানে দুই বা ততোধিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে ছোট ছোট অপরাধের (petty cases) বিচার করিতে দেখা যায়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ-সংক্রান্ত মামলার বিচারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। 1678 সালেই তাহার ব্যবস্থা করা হইল। ঐ বৎসর মাদ্রাজ কেন্দ্রের এজেণ্ট ও ওখানকার কাউন্সিল স্থির করেন যে সবরকম গুরুতর দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা ইংলণ্ডের আইন অনুযায়ী শুনানীর জন্য গভর্ণর ও তাহার পরিষদ সপ্তাহে দুইদিন বিচারক হিসাবে বসিবেন। তাহারা আরও সিদ্ধান্ত করেন যে বিচারের রায় কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু ছোট ছোট মোকদ্দমার বিচার পূর্ববৎ চলিবে। এইরূপে বিচার ক্ষমতার সূত্রপাত হইল। এইভাবে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে যে ব্যাপক আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলেন তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় যুগ : 1757-1858

1757 সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করিল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা নিহত হইলেন। ইংরেজ বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসাইল। সার্বভৌম ক্ষমতা বা ইংরেজের প্রশাসনিক অধিকার আইনগতভাবে হাতে আসিল না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসন ক্ষমতা ইংরেজের হাতেই ছিল। নবাব ক্লাইভকে প্রচুর উৎকোচ ও জায়গীর দিলেন এবং ক্লাইভের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও ঘুষ দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। 1760 সালে দেখা গেল মীরজাফরের আর বেশি ঘুষ দেওয়ার আর্থিক সামর্থ্য নাই। ওদিকে কোম্পানীর অর্থের প্রয়োজন। তাই মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া 1760 সালে নবাবীর পদে বসানো হইল মীরকাশীমকে। ইহার পুরস্কার স্বরূপ মীরকাশীম বাংলার গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টকে প্রচুর উৎকোচ দিলেন এবং কোম্পানী লাভ করিল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম তিনটি জেলার উপর কর্তৃত্ব। এইরূপে বিধিগতভাবে কোম্পানী বাংলায় আঞ্চলিক প্রশাসন ক্ষমতা লাভ করিল।

1765 সালে কোম্পানী মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের নিকট হইতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং কার্যতঃ ঐ তিনটি প্রদেশে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করিবার সুযোগ পায়। সেইজন্য ইলবার্ট লিখিয়াছেন: "The year 1765 marks a turning point in Anglo-Indian history, and may be treated as commencing the period of territorial sovereignty by the East India Company,"[1] অর্থাৎ 1765 সালে কোম্পানীর সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের সূচনা হয়। নবাব নামেমাত্র শাসক ছিলেন।

এই সময়ে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহাকে Double Government বা দ্বৈত শাসন বলা যায়। এই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা 1765 হইতে 1772 সাল পর্যন্ত চলে। ইংরেজের হস্তের ক্রীড়নক নবাব ফৌজদারী আদালত ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানীর হাতে রহিল রাজস্ব সংগ্রহ ও সৈন্যদলের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব। অর্থাৎ অর্থ ও সেনাবিভাগ, যাহার দ্বারা সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থা পরিচালন সম্ভব, তাহা পৃথকীকৃত হইল বিচার ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব হইতে। ইহার ফলে প্রকৃত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল কোম্পানীর হাতে, কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইল নবাবকে। কোম্পানী পাইল দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাবের ভাগ্যে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব। বলা বাহুল্য, এই শাসনের ফলে দেশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

1766 সালে পার্লামেণ্ট সর্বপ্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনে হস্তক্ষেপ করে। ঐ বৎসর বিলাতের সমগ্র কমন্‌স্ সভার কমিটি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া কয়েকটি সুপারিশ করে। এই সুপারিশ অনুযায়ী 1767 সালে পাঁচটি আইন পাশ হয়। এই আইনগুলি-দ্বারা কোম্পানীর লভ্যাংশ বিলি সম্বন্ধে কয়েকটি বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ হয়। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দুইটি আইন দ্বারা হুকুম করা হইল যে কোম্পানীর প্রতি বৎসর ব্রিটিশ সরকারকে চার লক্ষ পাউণ্ড দিতে হইবে। পরপর দুই বৎসর এই অর্থ দেওয়ার শর্তে কোম্পানী দুই বৎসরের জন্য ভারতে অধিকৃত অঞ্চল ও সংগৃহীত রাজস্ব ভোগ-দখল করিবার অধিকারী হয়। এই বিষয়ে সি. পি. ইলবার্ট মন্তব্য করিয়াছেন যে "This was apparently the first recognition by Parliament of the territorial acquisition of the Company."[2] অর্থাৎ এইভাবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে

---

1 Ilbert C. P. : Government of India : Historical Survey (1922) p. 37.

2 Ilbert. C. P. : Government of India : Historical Survey (1922), p. 39 (foot note)

কোম্পানী কর্তৃক রাজ্যাধিকার মানিয়া লয়। তিনি আরও বলেন যে ভারত হইতে লব্ধ সম্পদের অংশ পার্লামেণ্ট এই সময়েই প্রথম দাবি করে এবং ঘোষণা করে যে ভারতবর্ষে কোম্পানী কর্তৃক বিজিত অধিকার নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে।

1773 সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দারুণ অর্থ সংকট উপস্থিত হয়। তদানীন্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারত-শাসন ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার সুযোগ পাইলেন। ঐ সময়ে দুইটি পার্লামেণ্টীয় আইন পাশ হয়। একটি দ্বারা কোম্পানীকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা ও কোম্পানী সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৈষয়িক বন্দোবস্ত করা হয়। অন্য আইনটি শাসন সংস্কারমূলক। এই দ্বিতীয় আইনটি রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ (1773) নামে পরিচিত। এই আইনটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হইবার পূর্বে কোম্পানী কর্তৃক ভারত শাসন-ব্যবস্থায় কোম্পানীরই প্রভাব বর্তমান ছিল। প্রথমতঃ বিলাতে দুইটি সংস্থা ছিল; একটির নাম কোর্ট অফ্ প্রোপ্রাইটারস্ অর্থাৎ কোম্পানীর শেয়ারের মালিকগণের প্রতিষ্ঠান। ইহার একটি কার্য নির্বাহক সমিতি ছিল। এই সমিতিই ভারত শাসন ও কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয় পরিচালনা করিত। এই সমিতি কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ নামে পরিচিত ছিল। এই দ্বিতীয় সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ছিল চব্বিশ। ইহারা এক বৎসরের জন্য কোর্ট অফ্ প্রোপ্রাইটরস্ কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন। লক্ষণীয় যে যাঁহারা পাঁচ শত পাউণ্ড মূল্যের শেয়ারের মালিক তাঁহারাই কেবল এই নির্বাচনে ভোট দিবার অধিকারী হইতে পারিতেন এবং যাঁহারা দুই হাজার পাউণ্ড মূল্যের শেয়ারের মালিক তাঁহারাই কেবল কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারসের সদস্য নির্বাচিত হইতে পারিতেন।

কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থা ও ব্যবসা পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে যেমন দুইটি সর্বোচ্চ কোর্ট ছিল, তেমনি ভারতবর্ষে কোম্পানী অধিকৃত প্রতি ভূ-খণ্ডে অর্থাৎ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একজন করিয়া গভর্ণর ও তাহার পরিষদ কোর্ট অফ্ ডিরেক্টারস্গণের নির্দেশ অনুযায়ী ভারতবর্ষে কোম্পানীর শাসনকার্য ও বাণিজ্য পরিচালনা করিত। প্রতি প্রদেশে গভর্ণর ছিলেন ঐ প্রদেশস্থিত পরিষদের সভাপতি বা প্রেসিডেণ্ট। এইজন্য প্রতিটি কোম্পানা অধিকৃত ভূ-খণ্ড অর্থাৎ বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী নামে পরিচিত ছিল। পরিষদীয় সদস্যদের সংখ্যা বারো হইতে ষোলজন হইত। গভর্ণর ও পরিষদের সদস্যগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিশন কর্তৃক মনোনীত হইত। প্রতি প্রেসিডেন্সীর কার্যাবলী পরিষদের

অধিকাংশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সম্পন্ন হইত। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে গভর্ণর বা প্রেসিডেণ্ট এবং পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণের যৌথ দায়িত্ব ছিল। প্রতিটি প্রেসিডেন্সী স্বতন্ত্র ছিল অর্থাৎ কোনটির অপরের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না।

রেগুলেটিং এ্যাক্ট 1773

1773 সালের রেগুলেটিং আইন অনুসারে উপরোক্ত শাসন-ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। সর্বপ্রধান লক্ষণীয় বিষয় এই যে এই সময় হইতে পার্লামেণ্ট সক্রিয়ভাবে ভারতে কোম্পানীর শাসন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল। ঐতিহাসিক সার এ্যাল্‌ফ্রেড লায়াল তাঁহার The Rise and Expansion of British Dominion of India পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "The Act gave a parliamentary title to their (Company's) administration in India"[1] অর্থাৎ 1773 সালের আইন বলে কোম্পানীর ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পার্লামেণ্টে কর্তৃক স্বীকৃত হইল। 1773 সালের আইন পাশ হইবার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করিয়া ঘোষণা করে: "That all acquisition, made under the influence of a military force, or by treaty with foreign princes do of right belong to the State". অর্থাৎ যুদ্ধের দ্বারা বা বিদেশী নৃপতিগণের সহিত সন্ধির বলে যে সকল ভূখণ্ড কোম্পানীর দখলে আসিয়াছে তাহা সকলই রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইবে।[2] অধ্যাপক বেরিডেল কীথ তাহার Constitutional History of India গ্রন্থে 1773 সালের শাসন সংস্কার বিষয়ে বলিয়াছেন যে এই আইন কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন আনিয়া দেয়: (1) বিলাতে অবস্থিত কোম্পানীর সংগঠন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে, (2) ভারত শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে, (3) ভারতে কোম্পানীর রাজস্বের বিভিন্ন অংশকে অনেক পরিমাণে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনস্থ করে, এবং (4) ভারতে কোম্পানীর শাসন-ব্যবস্থার উপর ব্রিটিশ সরকারের পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে।[3]

---

1 Ghoshal. A.K. Development of Indian Constitution, Quoted, p. 23.

2 Keith, A. B. : Constitutional History of India (1936) Chapter III, p. 70.

3 Keith, A. B. : Constitutional History of India (1936) Chapter III, p. 70-71.

এই আইনবলে যে নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হইল তাহার বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থাগুলি এইরূপ, যথা, (1) বাংলা প্রেসিডেন্সীর সর্বোচ্চ শাসন-কর্তাকে গভর্ণর জেনারেল আখ্যা দেওয়া হইল ; (2) বাংলার গভর্ণর জেনারেল ও তাহার চারজন পরিষদীয় সদস্যগণের উপর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন ভার প্রদান করা হইল ; ওয়ারেন্ হেষ্টিংস গভর্ণর জেনারেল নিযক্ত হইলেন এবং ফিলিপ ফ্রান্সিস্ মন্সন্, ক্লেভারিং ও বারওয়েল পরিষদীয় সদস্য নিযুক্ত হইলেন ; (3) ব্যবস্থা হইল যে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল পরিষদের সভায় উপস্থিত অধিকাংশের মতানুযায়ী শাসন পরিচালনা করিবেন। তবে সভায় কোন বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে সমান-সংখ্যক ভোট পড়িলে পরিষদের সভাপতি গভর্ণর-জেনারেলের একটি অতিরিক্ত ভোট থাকিবে। (4) স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুইটির শাসন-ব্যবস্থা পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। স্থির হইল যে ঐ দুইটি প্রেসিডেন্সীর গভর্ণর ও পরিষদ-দ্বয় কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বা শান্তি স্থাপনে লিপ্ত হইবার পূর্বে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলের পূর্বানুমতি লইবেন। কিন্তু হঠাৎ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইলে বা ব্রিটেন-স্থিত কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারস্দের বিশেষ অনুমতিলাভ করিতে পারিলে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অনুমতির প্রয়োজন হইবে না ; (5) বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর স-পরিষদ গভর্ণর-দ্বয় ঐ দুই প্রেসিডেন্সীর সমস্ত ঘটনা ও কার্যাবলী সম্বন্ধে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে ওয়াকিবহাল রাখিতে বাধ্য থাকিবেন ; (6) স-পরিষদ গভর্ণর জেনারল বিলাতের কোম্পানীর কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারস্কে ভারতবর্ষে কোম্পানীর স্বার্থ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং তাঁহাদের আজ্ঞানুযায়ী প্রশাসন পরিচালনা করিবেন ; (7) 1773 সালের রেগুলেটিং আইনদ্বারা সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হয় ; (8) স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলকে সীমিত আইন প্রণয়ন এবং ঐ আইনভঙ্গের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। প্রকাশ থাকে যে ঐ আইনাদি কোনক্রমেই ব্রিটেনের আইন-বহির্ভূত হইতে পারিবে না। আরও ব্যবস্থা করা হয় যে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল-কৃত সমস্ত আইন সুপ্রীমকোর্টের সম্মতি সাপেক্ষ এবং ঐ সর্বোচ্চ আদালতে সমস্ত আইন রেজেষ্ট্রি করাও আবশ্যিক। আইন সম্বন্ধে আরও ব্যবস্থা থাকে যে উহা প্রণয়নের দুই বৎসরের মধ্যে ব্রিটেনের রাজা বা রাণী উহা বাতিল করিয়া দিতে পারেন ; (9) 1773 সালের রেগুলেটিং আইনদ্বারা গভর্ণর-জেনারেল তাহার পরিষদীয় সদস্য বা যে কোন স্তরের

সরকারী কর্মচারী দ্বারা কোন উপঢৌকন, উপহার বা দান গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। কোম্পানীর কর্মচারিগণ কর্তৃক ব্যক্তিগত বাণিজ্যও এই আইন দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়; (10) এতদ্ব্যতীত এই আইনবলে বিলাতের কোর্ট অফ্ প্রোপ্রাইটারস্ ও কোর্ট অফ্ ডাইরেকটারস্-এর গঠন-পদ্ধতি পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং উভয়ের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

কিন্তু 1773 সালের আইনের কতকগুলি গুরুতর গলদ ছিল। (1) পার্লামেণ্টের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ রাজ, কোম্পানীর ডিরেক্টর সভা (Court of Directors) ও ভারতীয় প্রশাসনের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষা করা। কিন্তু আইনে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতাবলী বিস্তারিতভাবে ও পরিষ্কার করিয়া উল্লিখিত হয় নাই। ইহার ফলে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘন ঘন মতবিরোধ ও তজ্জন্য অচলাবস্থার সৃষ্টি হইতে লাগিল। (2) সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। অল্পকালের মধ্যে দেখা গেল যে পরিষদের তিনজন সদস্য গভর্ণর-জেনারেলের বিরুদ্ধে একটি দল গঠন করিয়াছেন; ইহার ফলে প্রধান কর্মকর্তা গভর্ণর-জেনারেল, যাঁহার উপর প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল, তাঁহার সকল কাজে বাধা সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং প্রশাসন অচল হইয়া পড়িল। (3) 1773 সালের আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে অন্য দুইটি প্রেসিডেন্সী অর্থাৎ বোম্বাই ও মাদ্রাজের স-পরিষদ গভর্ণর-দ্বয়ের প্রশাসন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে যুদ্ধ-বিগ্রহের ন্যায় জরুরী অবস্থায়, অথবা কোন বিষয়ে যদি সপরিষদ গভর্ণর বিলাতের কোর্ট অব্ ডাইরেক্টরদের অনুমতিলাভ করিতে পারেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সপরিষদ গভর্ণর-জেনারেল-এর নিয়ন্ত্রণ অধিকার হইতে মুক্ত থাকিবে। বোম্বাই ও মাদ্রাজের শাসনতন্ত্র শেষোক্ত দুইটি ছিদ্র পথে কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করিতে শুরু করেন। ইহার ফলে কলিকাতার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীদ্বয়ের সরকারগুলির প্রায়শঃ বিরোধ হইতে লাগিল। (4) সুপ্রীম কোর্টকে স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেল কৃত আইন অনুমোদনে ক্ষমতা দেওয়া হয়। ইহার ফলে সুপ্রীম কোর্ট ও প্রশাসন বিভাগের মধ্যে সংঘর্ষ হইতে থাকে এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার পরিষদীয় সদস্যগণ তাঁহাদের সরকারী কার্যাবলীর জন্যও সুপ্রীম কোর্টের অধীন ছিলেন। ইহাতেও শাসন পরিচালনা সুকঠিন হইয়া উঠে।

1781 সালের একটি নূতন আইন দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত ক্ষমতার বিলোপ করা হয়। 1783 সালে সুপ্রসিদ্ধ হুইগ নেতা চার্লস্ জেমস্ ফক্স্ মন্ত্রী হইয়া পার্লামেণ্টে একটি খসড়া আইন উপস্থাপিত করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল 1773 সালের আইনের দোষগুলি দূর করা। এই বিলটি কমন্স্ সভায় গৃহীত হয় কিন্তু লর্ড সভা ঐ বিল অগ্রাহ্য করিয়া দেন। লর্ড নর্থ ও ফক্স-এর কোয়ালিশন সরকার ঐ কারণে পদত্যাগ করে। উইলিয়াম পিট প্রধান মন্ত্রী হন এবং 1784 সালে পার্লামেণ্ট কর্তৃক একটি বিল পাশ করাইয়া লন যাহা পিটের ভারত শাসন আইন বা Pitt's India Act নামে পরিচিত। কিন্তু পিটের এই আইনটি অনেকাংশে ফকস্-এর ইণ্ডিয়া বিলের অনুরূপ ছিল।

পিটে'র ভারত শাসন আইন (1784)

পিট্ কৃত আইনের প্রশাসন নীতিসমূহ মোটামুটিভাবে 1858 সাল পর্যন্ত প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। তাই এই আইনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। 1784 সালে ভারতে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। শাসন ক্ষমতার কিয়দংশ রহিল কোম্পানীর হাতে, আবার কিয়দংশ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিল। এই আইনের মূলধারাগুলি এইরূপ: (1) আইনে লিখিত হইল যে ব্রিটেনের চান্স্লার অফ্ দি এক্স্চেকার অর্থাৎ অর্থমন্ত্রী, একজন সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্ বা মন্ত্রী এবং চারজন প্রিভি কাউন্সিলার লইয়া ছয়জন সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড কোম্পানীর ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই কমিটি বোর্ড অব্ কনট্রোল নামে পরিচিত হইতে থাকে। বোর্ড-এর একজন সভাপতি নিযুক্ত হইল। কালক্রমে তিনিই বোর্ডের সর্বময় কর্তা হইয়া দাঁড়াইলেন, কারণ অন্য সদস্যবর্গ বোর্ডের কাজে কোন ঔৎসুক্য দেখাইতেন না। (2) ভারতের গভর্ণর-জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা চার হইতে কমাইয়া তিনজন করা হইল; এতদ্ব্যতীত কোম্পানীর সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ককে (Commander-in-Chief) ঐ পরিষদের সদস্য করা হয়। (3) বোম্বাই ও মাদ্রাজের পরিষদের সদস্য সংখ্যাও তিন হইবে ধার্য হয়; তদুপরি প্রতি প্রেসিডেন্সীর প্রধান সেনাপতি ঐ পরিষদের সদস্য হইবেন স্থির হয়। (4) স-পরিষদ গভর্ণর-জেনারেলকে দুই প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন ব্যাপারে বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হয়। (5) গভর্ণর-জেনারেলকে প্রশাসনিক স্বার্থে তাঁহার পরিষদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া নিজ মতানুযায়ী প্রশাসন কার্য

চালাইবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। (6) আরও ব্যবস্থা করা হয় যে গভর্ণর-জেনারেল, প্রধান সেনাপতি ও পরিষদসমূহের সদস্যবর্গ কোর্ট অব্ ডাইরেক্টারস্ কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। বোর্ড অফ্ ডিরেক্টরস্‌গণকে ঐ সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

1793 সালের পার্লামেণ্টকৃত আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর শাসন ব্যবস্থার উপর গভর্ণর-জেনারেলের ক্ষমতা আরও বর্ধিত করা হয়। গভর্ণর-জেনারেল ইচ্ছা করিলে তাহার পরিষদের অধিকাংশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যে কোন নীতি অবলম্বন করিতে পারিবেন—এই ক্ষমতাটি বিশদভাবে লিখিত হয়।

1812 সালে পার্লামেণ্ট নিযুক্ত অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট, যাহা Fifth Report (পঞ্চম রিপোর্ট) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহা প্রকাশিত হয়। এ রিপোর্টটি ভারত শাসন সম্বন্ধে বিস্তারিত অনুসন্ধানের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। এই রিপোর্ট অনুযায়ী 1813 সালে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর পরিষদত্রয়ের প্রশাসনিক ক্ষমতা বর্ধিত করা হয়। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার সঙ্কুচিত করিয়া চীনের সহিত বাণিজ্য ও চা-ব্যবসায়ে সীমাবদ্ধ করা হয়। ইহা ছাড়া 1813 সালের আইন দ্বারা কোম্পানী অধিকৃত ভারতীয় ভূ-খণ্ডের উপর ব্রিটিশরাজের সার্বভৌম ক্ষমতা ঘোষণা করা হয়।

1833 সালের আইন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই আইন দ্বারা আইনগত ও প্রশাসনিক ক্ষমতা ভারত সরকার অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল ও তাহার পরিষদের হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রথমতঃ, এই আইনের বলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আইন প্রণয়ন ক্ষমতার অবসান হইল। দ্বিতীয়তঃ, "ভারতের গভর্ণর জেনারেলের" (Governor General of India) পদ সৃষ্টি এবং ভারত সরকারকে অপ্রতিহত প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতার অধিকারী করা হয়। তৃতীয়তঃ, এই আইনদ্বারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক ক্ষমতার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো হইল। চতুর্থতঃ, এই আইন বলে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদে একজন Law Member বা আইন সদস্য নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে পূর্ণ সদস্য-রূপে গ্রহণ করা হয় না।

1853 সালের আইনে Law Member বা আইন সদস্যকে গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের পূর্ণ সদস্যপদ দেওয়া হইল। এই পরিবর্তনের দ্বারা পরিষদের সদস্যসংখ্যা পুনরায় চার-এ দাঁড়াইল। আইনসভার বিবর্তনের

ইতিহাসে 1853 সালের চার্টার আইন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আইনের বলে ব্যবস্থা হইল যে স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেল যখন আইন প্রণয়ন করিবেন, তখন ঐ কার্যে সাহায্য করিবার জন্য ছয়জন অতিরিক্ত সদস্য-কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য পরিষদভুক্ত করিতে হইবে। এই ছয়জনের মধ্যে (1) একজন হইলেন সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও (2) ঐ আদালতের অন্য একজন বিচারপতি এবং (3) মাদ্রাজ, বোম্বাই ও ইউনাইটেড প্রভিন্স অব্ আগ্রা এ্যাণ্ড আউধ অর্থাৎ আগ্রা ও অযোধ্যার সংযুক্ত প্রদেশ ও বাংলা—এই কয়টি প্রাদেশিক সরকারের একজন করিয়া প্রতিনিধি। শেষোক্ত চারজন অতিরিক্ত সদস্যদের জন্য বৎসরে 5000 পাউণ্ড বেতন ধার্য করা হয়। 1833 সালের চার্টার আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীদ্বয়ের পরিষদের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। 1853 সালের আইনের বলে এই ক্ষমতা সীমিতভাবে পুনরর্পণ করা হয়। কিন্তু 1853 সালের আইনে আরও ব্যবস্থা থাকে যে কতকগুলি বিষয়ে প্রাদেশিক আইন প্রণয়নের পূর্বে গভর্ণর জেনারেলের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হইবে, অন্য কতকগুলি বিষয়ে তাহার আবশ্যক হইবে না। উভয় ক্ষেত্রেই প্রাদেশিক আইন প্রকৃতপক্ষে আইনরূপে গৃহীত হইতে হইলে গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদন আবশ্যিক বিবেচিত হইত। বলা বাহুল্য এই ব্যবস্থায় ভারতীয়দের কোন স্থান ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রিটেনের ভারত শাসনপদ্ধতি (1858–1919)

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, যাহা ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া পরিচিত, তাহা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বিরাট পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্রিটেনে রাজনৈতিক মহলে ধারণা জন্মে যে, নূতন পরিস্থিতির সহিত মোকাবিলা করিতে হইলে ভারত শাসন ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন। 1784 সাল হইতে 1858 পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সরকারের যে দ্বৈতশাসন চলিতেছিল তাহার অবসান কাম্য বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া 1858 সালের আইন প্রণীত হয়। এই আইনটি 1858 সালের ভারত শাসন আইন বলিয়া পরিচিত।

ভারত শাসন আইন : 1858

এই আইন ভারত শাসন-ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করে। (1) পুরাতন বোর্ড অফ্ কনট্রোলের বিলোপ সাধন করা হইল। (2) ব্রিটিশ রাজ ভারত শাসনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। (3) কোম্পানির স্থল ও নৌ-বাহিনী ব্রিটিশরাজের অধীনস্থ হইল। (4) বোর্ড অফ্ কনট্রোল ও কোম্পানির কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারস্‌গণের হাতে যে ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তাহা ভারত শাসন সংক্রান্ত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী অর্থাৎ সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া (ভারত সচিব) এবং India Council বা পনেরোজন সদস্যবিশিষ্ট নবগঠিত ভারত শাসন পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত হইল। আরও লিপিবদ্ধ হইল যে পনেরজন সদস্যগণের মধ্যে আটজন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন ; অন্য সাতজন নিযুক্ত করিবেন কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টারস্। কিন্তু শেষোক্ত সাতজনের স্থলে কোন পদ শূন্য হইলে তাহা ভারত শাসন পরিষদই পূরণ করিবেন। ভারত সচিব তাহার পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। ব্যবস্থা হইল যে ভারত শাসন সংক্রান্ত কোন জরুরী ও গোপনীয় বিষয় ভারতসচিব ইচ্ছা করিলে India Council বা ভারতশাসন পরিষদে পেশ না করিয়া নিজেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহার ফলে, ভারতশাসন পরিষদ অথবা ভারতসভা

সম্পূর্ণরূপে ভারতসচিবের কেবলমাত্র পরামর্শসভায় পরিণত হয়। (5) সকল বিষয়ে ভারতসচিব পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিবেন, এইরূপ নীতিও আইনে লিখিত হয়। (6) বোর্ড অফ্ কনট্রোলের কর্মচারীরা ভারত পরিষদের কর্মচারীরূপে পরিগণিত হইতে থাকেন। তাহাদের বেতনাদি বাবদ সমস্ত খরচ ভারত পরিষদের সমগ্র ব্যয় এবং ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব হইতে দিতে হইবে, এইরূপ বিধানও গৃহীত হয়। (7) ব্রিটিশরাজ গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর, শাসন পরিষদের (Executive Council) সদস্যগণ ও এ্যাড্ভোকেট জেনারেল প্রভৃতি সর্বোচ্চ রাজ কর্মচারীগণকে নিয়োগ করিবেন; ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে স-পরিষদ ভারতসচিবের হস্তে ক্ষমতা দেওয়া হয়।

1861 সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতে দুই শ্রেণীর আদালত ছিল। প্রথমতঃ, সুপ্রীম কোর্ট; ইহা 1773 সালের পার্লামেণ্টের আইন (রেগুলেটিং এ্যাক্ট) অনুযায়ী স্থাপিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর আদালত, অর্থাৎ সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত। শেষোক্ত এই দুইটি আদালত কোম্পানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং মোগল আমলের বিচার পদ্ধতি অনুসারে গঠিত। মোগল দরবারের অবসান হইল 1857 সালের পর। এইজন্য ঐ দুইটি আদালত বিলুপ্ত করিবার পথে কোন বাধা রহিল না। 1861 সালের ভারতীয় আইন অনুসারে বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে সুষ্ঠু বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইতে থাকে।

1861 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনের পটভূমিকা

1757 সালের পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতির পরাজয় ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করে। শুরু হইল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ। ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রথম যে আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহা ছিল বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহের আকারে। 1783 সালের রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ, 1789 সালের বিষ্ণুপুরের কৃষক অভ্যুত্থান, 1770-1790 কুড়ি বৎসর ব্যাপী উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, 1795 হইতে 1799 সালের চুয়াড় বিদ্রোহ ইংরেজ ও জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল। কৃষকগণের প্রাচীন চিরন্তন অধিকার হরণ ও জুলুম করিয়া নানা অজুহাতে খাজনার অতিরিক্ত অর্থ ছলে-বলে-কৌশলে আদায় করার অত্যাচারে মরিয়া হইয়া কৃষককুল বিদ্রোহী হইয়া উঠে। একই কারণে সাঁওতাল কৃষককুল

খণ্ড খণ্ড ভাবে বিদ্রোহ করিয়াছিল। উনিশ শতকের প্রথমভাগে ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যেও কৃষকদের প্রতিবাদ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার নীলচাষীদের বিদ্রোহও উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য, ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসকবর্গ এই সকল আন্দোলনকে দমন করিতে সমর্থ হন। ভারতের শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনের উপর এই সকল আন্দোলনের প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না সত্য, কিন্তু এই সকল বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলী জনগণের শোষণবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

রামমোহন রায় ভারতে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রবর্তক। তিনি দাবি করিয়াছিলেন যে শাসনকার্যে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য। রামমোহনের যুগান্তকারী সামাজিক আন্দোলন যখন চলিতেছে, তখন ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যবর্গ অথবা ইয়ংবেঙ্গল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভারতে ইংরেজ সরকারের তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করেন। যে সকল প্রতিষ্ঠান এইরূপ ভূমিকা গ্রহণ করে তাহার মধ্যে 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন' ও 'সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশন অফ জেনারেল্ নলেজ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন বিচার ও পুলিশী ব্যবস্থা সম্বন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি ও তাঁহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেও আক্রমণ করেন।

1837 সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নেতৃত্বে 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এ্যাডাম 1839 সালে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলেন। 1843 সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য জর্জ টমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে এদেশে আসেন। তাঁহার উৎসাহে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামক রাজনৈতিক সমিতি গঠিত হয়। 1851 সালে প্রতিষ্ঠিত হইল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন'। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' ও 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' মিলিত হইয়া একটি স্থায়ী শক্তিশালী রাজনৈতিক সমিতি গড়িয়া উঠে। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই বোম্বাই-এ 'বম্বে এ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হইল। এই সকল প্রতিষ্ঠান শাসন-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি দরীকরণের জন্য প্রস্তাব গ্রহণ এবং ডেপুটেশন প্রভৃতি পন্থা অবলম্বন করিতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল প্রতিষ্ঠান নরমপন্থায় অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদের

রাজনীতিকে অনুরোধ-উপরোধের রাজনীতি বলিয়া অভিহিত করা যায়। দীর্ঘকাল কুশাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইতেছিল তাহার বিস্ফোরণ ঘটিল প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রামে যাহাকে ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন। এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ইংরেজ সরকারকে নূতনভাবে ভাবিতে বাধ্য করে। ভারতীয়েরা বরাবর ইংরেজ শাসন নির্বিবাদে মানিয়া লইবে, এই ধারণায় ফাটল ধরে। এই জন্যই ব্রিটিশরাজ 1858 সালের আইনবলে ভারত-শাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা (Queen's Proclamation) এই সূত্রে উল্লেখ্য। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পশ্চাতে ভারতীয় সমর্থন লাভের জন্যই ভায়তীয়দের অধিকার সম্বন্ধীয় অনেক শ্রুতি-মধুর বাণী এই ঘোষণায় গ্রথিত হয়। 1861 সালের আইন দ্বারা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় পরামর্শের মূল্য পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লন। কারণ ব্রিটিশ সরকার সিপাহী বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা হইতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনযন্ত্র জনগণের সঙ্গে যোগাযোগহীন। ঐ আইন দ্বারা ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের মতামত জানিবার একটি দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন : 1861

1861 সালে "Indian Councils Act" বা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন পাশ হয়। এই আইনটি কয়েকটি কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, ইহা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ সাধনে দ্বিতীয় পদক্ষেপ; 1853 সালের আইনকে প্রথম পদক্ষেপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। 1833 সালে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। 1861 সালের আইন দ্বারা বোম্বাই ও মাদ্রাজের স-পরিষদ গভর্ণরকে এবং সুবিধানুযায়ী অন্যপ্রদেশের স-পরিষদ শাসনকর্তাকে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। এইরূপে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কিয়ৎ পরিমাণে পুনরায় বিকেন্দ্রীকৃত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই আইন দ্বারা কেন্দ্রে বা প্রদেশে কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন ব্যাপারে বেসরকারী ব্যক্তিগণের জন্য অতিরিক্ত সদস্য হিসাবে পরিষদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকিবার সুবিধা সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারী অতিরিক্তসদস্যগণের মধ্যে ভারতীয়রাও থাকিতে পারেন, ইহা পরোক্ষভাবে স্বীকৃত হয়। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই আইনটি গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, এই আইনটি প্রশাসনিক ক্ষমতা হইতে আইন প্রণয়ন ক্ষমতার পৃথকীকরণের সূত্রপাত করে।

1861 সালের আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলি এইরূপ :—

(1) এই আইনের বলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর স-পরিষদ গভর্ণরকে আইন প্রণয়নের সীমিত ক্ষমতা পুনরায় দেওয়া হয়। শর্ত থাকে যে কতকগুলি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে হইলে মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার গভর্ণর জেনারেলের পূর্ব-সম্মতি গ্রহণ করিবে। এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে 1833 সালের আইন দ্বারা প্রদেশগুলির এই ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। এইরূপ আইন বা অন্য কোন প্রকার আইন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইবার পর গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি গ্রহণ আবশ্যিক করা হয়। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত উহা আইনে পরিণত হইতে পারিত না। স্থির হয় যে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় চার হইতে আটজন সদস্য গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য মনোনীত হইতে পারিবে এবং ঐ সংখ্যার অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে। 1861 সালের আইন অনুযায়ী বাংলায় 1862 সালে এবং আগ্রা ও অযোধ্যাসহ উত্তরপ্রদেশে 1886 সালে ব্যবস্থাপক সভা স্থাপিত হয়।

(2) আইন প্রণয়নের জন্য গভর্ণর জেনারেলের পরিষদে ছয় হইতে বারজন পর্যন্ত গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত সদস্যের স্থান করা হয়। নিয়ম থাকে যে সদস্যদের মোট সংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক বেসরকারী ব্যক্তি হইবেন। সদস্যদের কার্যকাল দুই বৎসর ধার্য হয়।

(3) এইরূপে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাকে কেবলমাত্র আইন আলোচনা করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

(4) গভর্ণর জেনারেলের পরিষদের সদস্য সংখ্যা একজন বৃদ্ধি করা হয়। তাই পরিষদের 1861 সালের আইন অনুযায়ী, সংখ্যা পাঁচে দাঁড়াইল।

(5) এখানে উল্লেখযোগ্য যে 1853 সালের আইন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপক সভা কেবলমাত্র আইন আলোচনার জন্য গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সভা শুধু আইন আলোচনায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই ; প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করিতে ও সরকারের দোষত্রুটি বিষয়ে আলোচনা করিতে থাকে। ইহারা একটি ক্ষুদে পার্লামেণ্ট হিসাবে বিলাতের পার্লামেণ্টের নিয়মপদ্ধতি অনুযায়ী চলিতে থাকে। 1861 সালের আইনে তাই বিধান করা হয় যে এই আইন দ্বারা গঠিত ব্যবস্থাপক সভা সমূহের কেবলমাত্র আইন আলোচনা করিবার অধিকার থাকিবে।

1892 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনের পটভূমিকা

1861 সাল হইতে 1892 সাল—এই একত্রিশ বৎসর ভারতের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ সময়। 1857 সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জনসাধারণের পক্ষে উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা লাভের সুযোগ প্রসারিত হইল। ইহার ফলে একটি উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর মানুষেরাই রাজনৈতিক আন্দোলনে অগ্রসর হইলেন এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকার দাবি করিতে আরম্ভ করিলেন। রেলপথ, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফের সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন অংশে ধীরে ধীরে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইতে থাকে এবং জাতীয় একতার সূচনা দেখা দেয়। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস হইতে বাধ্য হইয়া বিদায় গ্রহণের পর রাজনৈতিক আন্দোলনে অবতীর্ণ হন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিয়া জাতীয় একতার সত্রপাত করেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে 'বম্বে এ্যাসোসিয়েশন' 1851 সালের অল্পকাল পরেই স্থাপিত হইয়াছিল। মাদ্রাজের মহাজন সভা ও তাহার অনতিকাল পরে 1872 সালে পুণায় 'সার্বজনিক সভা' প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার ফলে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীগণ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন। 1876 সালে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টার ফলে 'ভারত সভা' (Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সভা মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত শ্রেণীর দাবি-দাওয়া সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিল। 1878 সালে লর্ড লীটন আইনবলে দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দিলেন। ইহার ফলে ভারতে জাতীয়তাবাদী সংস্থা সমূহ তুমুল আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলনের ফলে পরবর্তীকালে লর্ড রিপনের শাসন-কালে ঐ আইন প্রত্যাহৃত হয়। 1878 সালে লীটনের অস্ত্র আইন পাশ আর একটি ঘটনা যাহার ফলে শিক্ষিত শ্রেণী আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে যে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্য স্থাপন ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম নীতি। কুখ্যাত লর্ড লীটনের সময়ে 1877 সালে ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়াকে ভারতের সাম্রাজ্ঞী বলিয়া ঘোষণা করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে একটি বিরাট দরবার করা হয়। ঠিক সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতে দারুণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে মরিতেছিল তখন বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া দিল্লী দরবারের অনুষ্ঠান হৃদয়হীনতার একটি চরম নিদর্শন মনে করিয়া রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়েরা দারুণভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। 1883 সালে ইলবার্ট

বিল আন্দোলনের সময় পুনরায় স্পষ্ট হইয়া উঠে যে শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায়দের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত করা ইংরেজরা কিছুতেই সহ্য করিবে না।

1883 সালে ভারতসভা (Indian Association) 'ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন' (Indian National Conference) নামে একটি সম্মেলন কলিকাতায় আহ্বান করেন। ইহাকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্বগামী সংস্থা হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। 1885 সালে ঐ সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় মিলিত হয়। অন্য দিকে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ান হিউমের প্রচেষ্টায় জাতীয় কংগ্রেস গঠনের বন্দোবস্ত চলিতেছিল। কলিকাতায় যখন দ্বিতীয় জাতীয় সম্মেলন মিলিত হইয়াছে সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) প্রথম অধিবেশন বোম্বাই নগরীতে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। 1885 সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। জাতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ উদারপন্থী রাজনৈতিক সংস্কার, বিশেষতঃ ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির সম্প্রসারণ ও গণতন্ত্রীকরণ দাবি করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ব্রিটেনের জনমত এই সকল দাবি সমর্থন করে না। ঐ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ভারতে নিযুক্ত শাসনকর্তাগণ রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তাই 1892 সালে যে ব্যবস্থাপক সভা আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হইল তাহা ভারতীয় প্রাগ্রসর জনমতকে সন্তুষ্ট করিতে নাই।

1892 সালের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন

1892 সালের আইন প্রধানতঃ 1861 সালের আইনের দুইটি পরিবর্তন সাধন করে। প্রথমতঃ, ব্যবস্থাপক সভাগুলির অতিরিক্ত সদস্যদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। স্থির হয় যে গভর্ণর জেনারেলের সভায় দশ হইতে ষোল জন অতিরিক্ত সদস্য থাকিবে এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের সংখ্যা থাকিবে আট হইতে কুড়িজন। বাংলা, আগ্রা ও অযোধ্যা সমেত উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সংখ্যা যথাক্রমে কুড়ি ও পনেরজনের বেশী হইবে না। এই আইন দ্বারা আরও ব্যবস্থা করা হয় যে অতিরিক্ত সদস্যদের দুই-পঞ্চমাংশ বেসরকারী ব্যক্তি হইতে হইবে। তাহা ছাড়া, বিধিবদ্ধ হয় যে কতকগুলি নির্বাচন কেন্দ্র হইতে প্রার্থীগণ পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হইয়া আসিবেন বটে, কিন্তু এই নির্বাচন গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ অতিরিক্ত সদস্যরূপে গণ্য হইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ, এই আইনবলে গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক প্রণীত

নিয়মানুসারে ব্যবস্থাপক সভাগুলির ক্ষমতা কিয়ৎপরিমাণে বর্ধিত করা হয়। সদস্যবর্গকে প্রশাসনিক ব্যাপার সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, বাজেট সমালোচনা করিবার সীমিত অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু অতিরিক্ত প্রশ্ন করা অথবা বাজেটের উপর ভোট গ্রহণ দাবি করার ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে দেওয়া হয় নাই। এমন কি কোন প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকারও এই সভাগুলির ছিল না।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যে বৎসর স্থাপিত হয় অর্থাৎ 1885 সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে ব্যবস্থাপকসভা কথঞ্চিৎ পরিমাণে গণতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে সকল দাবি উত্থাপিত হইয়াছিল তাহা স্পষ্ট ও বর্ধিত আকারে 1886 সালে কলিকাতা অধিবেশনে পুনরুত্থাপিত হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। 1892 সালের আইন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় জনমতের বিশেষ কোন মূল্য তৎকালীন ইংরেজ সরকার স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রিটিশ সরকারের এইরূপ মনোভাবের দরুণ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

1909 সালের ব্যবস্থাপক সভা আইনের পটভূমিকা

ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতিক্রিয়ারূপে দেশে দেখা দিল চরমপন্থী আন্দোলন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহারাষ্ট্রে ঠাকুর সাহেব প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। বাল গঙ্গাধর তিলক নূতন পথে জাতীয় কংগ্রেসকে পরিচালিত করিবার নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে আবেদন-নিবেদনের (Prayers and petition) দেউলিয়া রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া কংগ্রেসকে আত্ম-নির্ভরশীল হইয়া দেশবাসীকে নবশক্তিতে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থা পরিহার করিয়া বিক্ষোভ ও তীব্র আন্দোলনের পন্থায় অগ্রসর হইয়া কংগ্রেসকে দেশবাসীর দাবি ব্রিটেনের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে কাড়িয়া লইতে হইবে। যে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলন মহারাষ্ট্রে এই সময় জন্মলাভ করিল তিলক তাহার সমর্থক ছিলেন। এই নূতন নীতি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তিলকের আহ্বানে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেসের মধ্যে আন্দোলন শুরু করেন। 1906 সালে অরবিন্দ ঘোষও এই চরমপন্থী (Extremist) আন্দোলনের সামিল হন। বঙ্গভঙ্গের (1905-1911) সময় বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ স্বদেশী, স্বরাজ, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষার আদর্শ জনসমাজে প্রচার করেন। অন্যদিকে বিক্ষুব্ধ তরুণ সমাজ ভগিনী নিবেদিতা ও

অরবিন্দের প্রেরণায় বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়া বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন এবং বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত হয়। জাতীয় আন্দোলনকে হীনবল করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানগণ বড়লাট লর্ড মিণ্টোর উৎসাহে 1906 সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ গঠন করেন এবং এই নূতন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধিগণের পৃথক নির্বাচন (Separate Electorate) ব্যবস্থা দাবি করিতে থাকেন। কংগ্রেসের ও মুসলীম লীগের রাজনীতির মধ্যে একটি বিভেদ রেখা দেখা দিল। তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড মিণ্টো মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনের দাবি মানিয়া লইলেন। কংগ্রেসের নরমপন্থীদলের (Moderates) ফিরোজশা মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ স্বরাজ, বয়কট, প্রভৃতি আদর্শের বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু জনসাধারণ তিলক-বিপিনপাল-অরবিন্দের নেতৃত্বে প্রাগ্রসর রাজনীতির পক্ষপাতী হইয়া উঠে। জাতীয় কংগ্রেস 1903 ও 1906 সালে বার্ষিক অধিবেশনে ব্যবস্থাপকসভাগুলির সম্প্রসারণ ও তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবি করিয়া প্রস্তাব পাশ করে। এইরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য 1909 সালের ব্যবস্থাপক সভা আইন বিলাতের পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত হইল। এই আইনটি মর্লি-মিণ্টো আইন (Morle-Minto Act) নামে পরিচিত। কারণ ভারত সচিব জন্ মর্লি ও বড়লাট মিণ্টোর আগ্রহে এই আইনটি পাশ হয়।

1909 সালের আইনের মূল কথা

কয়েকটি দিক হইতে 1909 সালের আইন লক্ষণীয়।

(1) এই আইনের বলে 1892 সালের তুলনায় কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভা সমূহের সদস্যসংখ্যা বর্ধিত হইয়া এইরূপ দাঁড়াইল, যথা ;

	1892 সালে	1909 সালে
গভর্ণর জেনারেলের সভায়	16	60
প্রধান প্রধান প্রদেশ (বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ)	20	50
অন্যান্য প্রদেশে	15 হইতে 20	30

পদাধিকার বলে সদস্য, মনোনীত সরকারী সদস্য, মনোনীত বেসরকারী সদস্য ও নির্বাচিত সদস্যগণ ব্যবস্থাপক সভায় স্থান পাইলেন। কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের সর্বোচ্চ কর্তা অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্ণর এবং তাহাদের শাসন পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ (Members of the Executive Council) পদাধিকারে (ex-officio) কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সভায় স্থান লাভ

করিলেন। কেন্দ্রীয় সভায় সরকারী সদস্যগণের গরিষ্ঠতা রক্ষা হইল কিন্তু প্রাদেশিক বেসরকারী (নির্বাচিত ও মনোনীত) সদস্যগণের গরিষ্ঠতা রাখা হইয়াছিল। এই আইনে বাংলায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের গরিষ্ঠতা রাখা হয়।

(2) নির্বাচন প্রথা সরাসরিভাবে মানিয়া লওয়া হয়। 1892 সালে পরোক্ষ নির্বাচনের পর আবার কর্তৃপক্ষ দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তিবর্গের সদস্য হিসাবে সরকারী অনুমোদনের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু 1909 সালের আইনে এই অপমানজনক নীতিটি পরিহার করা হয়।

(3) সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা 1909 সালে সৃষ্ট হয়। মুসলমানগণের জন্য কতকগুলি কেন্দ্র ও আসন সংরক্ষিত হইল। ইহার দ্বারা বিভিন্ন সমপ্রদায়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি প্রসারলাভ করে। ব্রিটেনীয় সরকার সু-পরিকল্পিত-ভাবেই এই নীতি আমদানী করিয়াছিলেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল একতা-বদ্ধ জাতীয়তাবোধের প্রসারকে বাধা দেওয়া। তাহাদের ঐ উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এমনকি পরবর্তীকালে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টেও বলা হইয়াছে যে সংসদীয় গণতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথার ভিত্তিতে কখনই গড়িয়া উঠিতে পারে না। ইহা দ্বারা বিভেদই বাড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য, 1909 সালে যে বিভেদের বীজ সরকার রোপণ করিয়াছিলেন তাহাই ধীরে ধীরে বর্ধিত হইয়া স্বাধীনতার প্রাক্কালে বিষবৃক্ষে পরিণত হয়। ভারত বিভাগ তাহারই ফল।

(4) ব্যবস্থাপক সভাগুলির কথঞ্চিৎ ক্ষমতা বৃদ্ধিও এই আইনের আর একটি বিশেষত্ব। এই আইনে বাজেট আলোচনা এবং তাহার উপর কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন ও ঐ প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষমতার ব্যবস্থা থাকে। অন্যান্য প্রস্তাব উত্থাপন এবং কর্তৃপক্ষকে প্রশাসনিক ব্যাপারে প্রশ্ন ও সীমিতভাবে অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়। লক্ষণীয় যে বাজেটের উপর প্রস্তাবই হউক, আর অন্য বিষয়ের প্রস্তাবই হউক ব্যবস্থাপক সভাগুলির ভোট কেবলমাত্র অনুরোধ আকারেই কর্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছাইত। গভর্ণর জেনারেল ও তাহার পরিষদ (Executive Council) অথবা প্রাদেশিক সর্বোচ্চ শাসনকর্তা ও তাহার পরিষদ (Executive Council) ঐ ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব গ্রহণও করিতে পারিতেন আবার অগ্রাহ্যও করিতে পারিতেন। সর্বোপরি প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও গভর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বা আইন বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন।

চতুর্থ অধ্যায়

স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস (1919–1939)

1919 সালের আইনের পটভূমিকা

1909 সালের ভারতশাসন সংস্কার আইন কংগ্রেসের প্রাচীনপন্থী নেতৃবৃন্দ সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে: "The Congress welcomed them and Mr. Gokhale spoke of their 'generous and fair nature' but very soon deprecatory criticism began to manifest itself and dissatisfaction has steadily increased".[1] অর্থাৎ কংগ্রেস 1909 সালের ভারতশাসন সংস্কার আইন অভিনন্দিত করিলেন এবং গোখ্‌লে উহাকে 'উদার ও ন্যায্য' বলিয়া অভিহিত করিলেন কিন্তু শীঘ্রই নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশ পাইতে লাগিল ও অসন্তোষ নিশ্চিতরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু এইরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা মোটেই অযৌক্তিক নহে, কারণ 1909 সালের আইনদ্বারা ভারতবাসীর হস্তে কোন প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। সেইজন্যই মণ্টেগু ও চেম্‌স্‌ফোর্ড লিখিতেছেন: "······Morley-Minto constitution ceased within a brief space of ten years' time to satisfy the political hunger of India"[2]. অর্থাৎ মাত্র দশ বৎসরের মধ্যেই দেখা গেল যে মর্লি-মিণ্টো শাসনব্যবস্থা ভারতের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে অপারগ।

1914 সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিপ্লবীগণ এই সুযোগ লইয়া সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। জার্মানীর নিকট হইতে মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিবার চেষ্টা চলিতে থাকিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। ভারত সরকার ভারতরক্ষা নামক একটি জরুরী আইন প্রণয়ন করিয়া বিপ্লবীদের দমন করিতে অগ্রসর হইলেন। এজন্য যে বিক্ষোভ দেশে সৃষ্টি হইল তাহার পরিমাণ কম ছিল না। কিন্তু কংগ্রেস এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাপকসভার সদস্যগণ ব্রিটিশ সরকারকে পূর্ণ সমর্থনের নীতি অবলম্বন করিলেন। ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে 150 কোটি

---

1 Montague—Chelmsford Report, p 3

2 Montague—Chelmsford Report, p 65

টাকা যুদ্ধ তহবিলে দান করা হইল। আট লক্ষ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করে এবং আরও চার লক্ষ অ-যোদ্ধা হিসাবে সৈন্যদলে যায়। যুদ্ধে সহায়তার পুরস্কার হিসাবে 1917 সালের 20-শে আগষ্ট ব্রিটেনের সরকার ঘোষণা করিলেন যে যুদ্ধোত্তরকালে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্কার প্রবর্তন করা হইবে যাহার ফলে ভারতবর্ষ উত্তরোত্তর দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতির দিকে অগ্রসর হইবে। এই ঘোষণাটি তদানীন্তন ভারতসচিব এডউইন স্যামুয়েল মন্টেগুর নামের সহিত জড়িত। এই ঘোষণায় দেশে জনসাধারণের একাংশ কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইল বটে কিন্তু শীঘ্রই নানা বিরুদ্ধ ঘটনা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে জটিল করিয়া তুলিল। 1907 সাল হইতে 1915 সাল পর্যন্ত চরমপন্থীরা তিলকের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। 1917 সালে তাঁহারা কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ক্ষমতাধিকারী হইয়া উঠেন। তিলক, মহাত্মা গান্ধী, মিসেস এ্যানি বেশাণ্ট ও চিত্তরঞ্জন দাশ কংগ্রেসের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। তিলক ঘোষণা করিলেন যে স্বরাজ ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার এবং ভারতবাসী তাহা লাভ করিতে বদ্ধপরিকর। 1916 সালে লক্ষ্মৌতে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের মধ্যে একটা চুক্তি রফা হয় এবং যুক্তভাবে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্বশাসনমূলক রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে। এই চুক্তি কংগ্রেস-লীগ চুক্তি নামে পরিচিত। মিসেস বেশাণ্ট প্রতিষ্ঠিত 'হোমরুল লীগ' দায়িত্বশীল সরকার দাবি করিতে আরম্ভ করিল। ভারত সরকার তাঁহাকে ও তাঁহার দুইজন সহকর্মীকে ভারতরক্ষা আইন অনুযায়ী অন্তরীণ করিলেন। অন্যদিকে বিপ্লবী আন্দোলন ব্যাপক হইয়া উঠিল। সরকার বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসবাদ দমন করিবার জন্য একটি পরামর্শ কমিটি নিযুক্ত করিলেন (1917)। বিলাতের বিচারপতি রাওলাট এই কমিটির সভাপতি ছিলেন বলিয়া এই কমিটি 'রাওলাট কমিটি' নামে পরিচিত। ব্যাপক তদন্তের পর কমিটির অধিকাংশ সদস্য দমনমূলক দুইটি নূতন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেন। যখন প্রথম বিলটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে আলোচিত হইতেছিল তখন মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে যদি এই দুইটি আইন ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় পরিষদে সরকারী সদস্যগণের ভোটের জোরে পাশ করিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ভারতবাসী অহিংস সংগ্রাম দ্বারা ঐ আইনটিকে প্রতিরোধ করিবে। মহাত্মাজীর এই প্রস্তাব ব্যাপক সমর্থন লাভ করে। কিন্তু ভারত সরকার তাহাতে কর্ণপাত করে না। আইন পাশ হইয়া যায় (1919)। মহাত্মাজী এই সম্পর্কে হরতালের আহ্বান জানান। দিল্লী, পাঞ্জাব প্রভৃতি নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। মহাত্মাজীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর

দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। সরকার কঠোর হস্তে গুলি চালাইয়া তাহা দমন করিতে থাকে। পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বর হত্যাকাণ্ড (1919) এই সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাহারা এই হত্যার জন্য দায়ী, জেনারেল ডায়ার ও পাঞ্জাবের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর ও'ডাইয়ার, তাহারা বিলাতের স্বদেশবাসীদের পরিপূর্ণ সমর্থন লাভ করেন এবং জেনারেল ডায়ারের পুরস্কার হিসাবে বিপুল অর্থ বিলাতের জনসাধারণ তাহাকে দান করে। ইহাতে ভারতীয় জনমত দারুণভাবে আহত হয়। রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালা-বাগ হত্যাকাণ্ড ও কংগ্রেস আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ঘটনা। এই সময় হইতে ভারতের রাজনীতিতে মোড় ফিরিয়া গেল। ভারতবাসী নূতন পথে চলিতে শুরু করিল। এইরূপ অবস্থায় 1919 সালের আইন বিলাতের পার্লামেণ্টে পাশ হইল। কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস এই আইনটির বিরোধিতা করে এবং ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাব ও অন্যান্য প্রশাসনিক অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

1919 সালের আইনের বিশেষত্ব

(1) পূর্বে বিলাতের ভারত সচিবের (Secretary of State for India) বেতন ভারতীয় রাজস্ব হইতে দেওয়া হইত। এই আইনে ব্রিটেনের রাজস্ব হইতে তাহা দেওয়া হইবে ব্যবস্থা হইল।

(2) স-পরিষদ গভর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসাবে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত হইল। তাঁহার অফিস লণ্ডনে স্থাপিত হইল।

(3) কেন্দ্রে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থাপকসভা প্রতিষ্ঠিত হইল ও প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হইল।

(4) কতকগুলি বিষয়ে, যথা, কেন্দ্রীয় রাজস্ব বা জাতীয় দেনা (Public debt), সমর বিভাগ, ভারতের সঙ্গে বহির্দেশের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে গভর্ণর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত কোন আইন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক-সভায় আনা নিষিদ্ধ ছিল।

(5) গভর্ণর জেনারেলকে যে কোন আইন বাতিল করিবার প্রকৃত ক্ষমতা এই আইন দ্বারা দেওয়া হয়। ব্রিটিশরাজের হাতেও অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয়। গভর্ণর জেনারেল জরুরী অবস্থায় যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষমতাধিকারী রহিলেন।

(6) রাজস্বের কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকসভা গভর্ণর

জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত আলোচনা করিতে পারিত না, তাহার উপর ভোট নেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। ইহা ব্যতীত অন্য সকল বিষয় ভোটে দেওয়া হইত।

(7) কেন্দ্রীয় সভাদ্বয়ের প্রশাসনকে সমালোচনার ক্ষমতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয় বটে, কিন্তু তাহাও গভর্ণর জেনারেলের সর্বময় ক্ষমতাদ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও ক্ষমতা সীমিত ছিল।

(8) প্রশাসনিক বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় বিষয় ও প্রাদেশিক বিষয়—এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইল। সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধীন ছিল। প্রাদেশিক বিষয়, প্রাদেশিক সরকারের আয়ত্তে দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা, রেল, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বন্দর, বিমান চলাচল প্রভৃতি ছিল কেন্দ্রীয় বিষয়। স্বায়ত্বশাসন, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি প্রাদেশিক বিষয়রূপে গণ্য হইল।

(9) প্রাদেশিক শাসনপদ্ধতিতে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন করা হইল এই যে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দুইভাগে ভাগ করা হইল। একটি অংশকে বলা হইল হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred subject) অপর অংশটি সংরক্ষিত বিষয় (Reserved subject) বলিয়া অভিহিত হইল। প্রথমোক্ত বিষয়গুলি যথা, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন, জনস্বাস্থ্য, ভারতীয়গণের শিক্ষা (এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়গণের শিক্ষা ব্যতীত), পূর্ত বিভাগ, শিল্প (বয়লার, শ্রম, কল-কারখানা, ইলেক্‌ট্রিসিটি, জলবিদ্যুৎ, খনি ব্যতীত) সমবায়, আবগারী বিভাগ। এই বিভাগগুলি গভর্ণর কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রীগণ পরিচালনা করিতেন। মন্ত্রীরা সকলেই প্রাদেশিক বিধানসভার সদস্য ছিলেন। সংরক্ষিত বিষয়গুলি গভর্ণর কর্তৃক নিযুক্ত পরিষদ সদস্যগণের আয়ত্তাধীন ছিল।

উপরোক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যসকল প্রশাসনিক বিষয় সংরক্ষিত বলিয়া ঘোষিত হইল; যথা, বিচার, পুলিশ, অর্থবিভাগ, সেচ, কল-কারখানা, জল-বিদ্যুৎ, দুর্ভিক্ষ, রাজস্ব, সংবাদপত্র, গৃহনির্মাণ, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি ছিল সংরক্ষিত বিষয়। অর্থাৎ একই অবিভাজ্য সরকারের কার্যাবলী দুইভাগে ভাগ করা হইল। এই পদ্ধতিকে দ্বৈরাজ্য (Dyarchy) বলা হইয়াছে। ইংরেজ রাজনৈতিক লায়নেল কার্টিস এই পন্থার উদ্ভাবক।

(10) কেন্দ্রীয় সরকারের কেন্দ্রীয় বিষয়সম্বন্ধীয় প্রশাসনিক কর্তব্যসাধন ছাড়া, প্রাদেশিক সরকারের উপর তদারকির ভার রহিল। প্রয়োজন হইলে গভর্ণর জেনারেল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপকমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত আইন অথবা যে কোন প্রাদেশিক আইন বাতিল করিয়া দিবার অধিকারী ছিলেন। তেমনি

প্রদেশে গভর্ণর বিধানসভায় গৃহীত যে কোন আইন অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারিতেন।

(11) কেন্দ্রীয় সরকারের উপর বিলাতস্থ ভারত সচিবের ক্ষমতা পূর্বের ন্যায় থাকে। ভারত সরকারের মাধ্যমে প্রাদেশিক সংরক্ষিত বিষয় সম্বন্ধেও তাহার তদারকি ক্ষমতা অব্যাহত রহিল, কিন্তু হস্তান্তরিত বিষয় সম্বন্ধে তাহার ক্ষমতা হ্রাস পাইল।

(12) ভারত সচিবের উপদেষ্টা পরিষদ ইণ্ডিয়া কাউন্সিল পরিবর্তিত আকারে চলিতে লাগিল।

1917 সালের 20 আগষ্টের ঘোষণায় বলা হইয়াছিল যে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আদর্শে পেঁ ৗছিবার জন্য নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানসকল গড়িয়া তোলা হইবে। 1919 সালের আইনদ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। কারণ মন্ত্রীদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ছিল। দেশ-গঠনমূলক কয়েকটি বিভাগের কিয়দংশ তাহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেই বিভাগগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিতে হইলে যে অর্থ প্রয়োজন তাহার উপর কোন কর্তৃত্ব তাহাদের ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, হস্তান্তরিত ও সংরক্ষিত বিভাগের বণ্টন ব্যবস্থা ছিল অতিমাত্রায় ত্রুটিপূর্ণ। কৃষি ছিল মন্ত্রীদের কর্তৃত্বে আর সেচ রাখা হয় সংরক্ষিত ক্ষেত্রে। শিল্প হস্তান্তরিত বিষয় কিন্তু শ্রম, কল-কারখানা, বয়লার, বিদ্যুৎ (জলবিদ্যুৎসহ) ছিল সংরক্ষিত বিষয়। তৃতীয়তঃ, প্রদেশে গভর্ণর ও কেন্দ্রে গভর্ণর জেনারেলের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। চতুর্থতঃ, সাম্প্রদায়িকভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা জাতীয়তা ও গণতন্ত্র গড়িয়া উঠিবার পক্ষে দারুণ বাধাস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল।

1919 হইতে 1935 সালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী

(1) সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ, জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, ভারতে ব্রিটিশ সরকারের রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এবং যুদ্ধোত্তর তুরস্কের সহিত সন্ধিতে খালিফের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদে কংগ্রেস 1920 সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবটি 1920 সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে এবং ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ একযোগে এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই আন্দোলন ভারত ইতিহাসে অসহযোগ আন্দোলন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। গান্ধীজী ছিলেন ইহার প্রবর্তক ও

অবিসংবাদী নেতা। স্কুল-কলেজ, বিচারালয়, বিদেশীবস্ত্র প্রভৃতি বর্জন ও ভারত সরকারের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগ ত্যাগ ছিল এই আন্দোলনের মূল নীতি। তদনুযায়ী, কংগ্রেস 1919 সালের আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। তুমুল আন্দোলন সুরু হয়। সমগ্র ভারতে গান্ধীজী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, মতিলাল নেহেরু, জহরলাল নেহেরু, সরোজিনী নাইডু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাক্তার আনসারী, হাকিম আজমল খাঁ এবং আরও অনেক নেতৃবৃন্দসহ লক্ষাধিক লোক কারাবরণ করেন। অসহযোগ ক্রমে ব্যাপকতা-লাভ করে এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন সত্যকার গণ আন্দোলনে পরিণত হয়। সরকার শঙ্কিত হইয়া উঠে, কিন্তু 1921 সালে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরীচৌরায় আন্দোলনকারীগণ কর্তৃক কয়েকজন পুলিশ হত্যার দরুণ মহাত্মাজী এই আন্দোলন প্রত্যাহার করেন (ফেব্রুয়ারী, 1922)। কংগ্রেস মহাত্মাজীর নেতৃত্বে গ্রাম সংগঠনের কাজে মনোনিবেশ করে। ব্যবস্থা পরিষদগুলিতে প্রবেশের বিরুদ্ধে বাধানিষেধ বলবৎ থাকে। আন্দোলন প্রত্যাহার করার ফলে হিন্দু-মুসলমানের একতাবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাব দানা বাঁধিতে থাকে।

(2) এই সময়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁহার কারামুক্তির পর প্রস্তাব করেন যে ইংরাজ প্রযোজিত দ্বৈরাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যবস্থাপকসভার অভ্যন্তরে চালাইয়া দ্বৈরাজ্যকে বিপর্যস্ত করিয়া ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয় মনোভাবের উপযুক্ত জবাব দিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদের ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়া, সরকারের সঙ্গে যাহারা সহযোগিতা করিতে চাহেন তাদের পরাজিত করিয়া নিয়মতান্ত্রিক সরকারকে অচল করিয়া দিতে হইবে। 1922 সালে গয়া কংগ্রেসে (সভাপতি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ) দেশবন্ধুর এই মত অগ্রাহ্য হইয়া যায়। 1923 সালে দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে এই নীতি গৃহীত হয় এবং এই বৎসরই কোকনদ কংগ্রেসে (সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি) কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তাহা সমর্থিত হয়। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ দল গঠন করিলেন। মতিলাল নেহেরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এই দলে যোগদান করেন। স্বরাজদল নির্বাচনে উল্লেখযোগ্যভাবে সাফল্যলাভ করিয়া কয়েকটি রাজ্যে ব্যবস্থাপক সভার ভিতরে সরকারকে বাধা দিতে থাকে। বাধাদান কার্যে বাংলায় ও মধ্যপ্রদেশে স্বরাজদল লক্ষণীয় সাফল্যলাভ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায়ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে স্বরাজদল উল্লেখযোগ্যভাবে ভারতসরকারকে বাধা দিতে থাকে। 1923 সাল হইতে

1926 সাল পর্যন্ত মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলে এবং জাতীয় একতা বিঘ্নিত হয়। 1927 সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে যে পূর্ণ স্বাধীনতাই কংগ্রেসের চরমলক্ষ্য।

1927 সালের শেষে পার্লামেণ্টে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য সাইমন কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব, উত্থাপনকালে ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড্ বলেন যে ভারতবাসীগণ কখনই সকল দল ও সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য কোন সংবিধান প্রস্তুত করিতে পারিবে না। সেইজন্যই তাহারা স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত সাইমন কমিশনেও কোন ভারতীয় স্থান পাইল না। এই সকল ঘটনায় সকল রাজনৈতিক দল বুঝিলেন যে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কার ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ভারতবর্ষের জন্য সর্বদল ও সম্প্রদায় কর্তৃক গ্রহণযোগ্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করিবার উদ্দেশ্যে 1927 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। শুরুতেই মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। সর্বদলীয় সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বোম্বাই নগরে অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু ও মুসলমান-গণের মধ্যে মতভেদ তখন আরও শঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে। এই সম্মেলনে মতিলাল নেহেরুকে সভাপতি করিয়া একটি সর্বদলীয় কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত মূলনীতি 1928 সালে আগষ্ট মাসে লক্ষ্ণৌ সর্বদলীয় সম্মেলনে প্রাথমিকভাবে গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে দাবি করা হয় যে ভারতবর্ষে ডোমিনিয়নের ভিত্তিতে সংবিধান গঠন করিতে হইবে। রিপোর্টটি যোগদানকারী বিভিন্ন দলের নিকট প্রেরিত হয়। বিভিন্ন দলের রিপোর্টসহ 1928 সালে ডিসেম্বর মাসে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে পেশ করা হয়। মুসলিম লীগ কলিকাতার সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদান করে না। কিন্তু মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া বলেন যে কয়েকটি সর্বনিম্ন দাবি মানিয়া না লইলে মুসলমানগণ কোন মতেই সন্তুষ্ট হইবে না।

এই ন্যূনতম দাবীর মধ্যে ছিল প্রধানতঃ এইগুলি : (ক) প্রদেশসমূহে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র গঠন এবং সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব। (খ) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ এবং পৃথক নির্বাচন কেন্দ্র গঠন। (গ) প্রদেশে যেখানেই মুসলমানগণ সংখ্যালঘু সেই সব প্রদেশে মুসলমানদের জন্য weightage-এর ব্যবস্থা অর্থাৎ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধির সংখ্যা

অপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিত্ব। (ঘ) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্যাবিনেটে মুসলমানগণকে ন্যায্য ও উপযুক্ত সংখ্যায় গ্রহণ। সর্বদলীয় সম্মেলন এই সকল দাবি অগ্রাহ্য করে এবং নেহেরু রিপোর্ট পাশ হইয়া যায়। কংগ্রেসের অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র বসু যে স্বাধীনতা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও অধিকাংশের ভোটে অগ্রাহ্য হইয়া যায় এবং নেহেরু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়নের ন্যায় দায়িত্বশীল শাসন-তন্ত্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়। আরও স্থির হয় যে 1929 সালের 31শে ডিসেম্বরের মধ্যে ব্রিটেনের সরকার যদি ভারতবর্ষের জন্য ডোমিনিয়নভিত্তিক সংবিধান গঠনের দাবি স্বীকার না করে তাহা হইলে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিবে। ইহার পর জিন্নাহ্ ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ মুসলিম লীগের নেতৃত্বে 1929 সালের পয়লা জানুয়ারী সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলন আহ্বান করেন এবং মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবিসমূহ উত্থাপন করেন। এই দাবিগুলি জিন্নাহ্র চৌদ্দ দফা দাবি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 1929 সালের এই সর্বভারতীয় মুসলমান সম্মেলনের পর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বিভিন্ন পথে চলিল।

1927 সালে পূর্ব নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী সাইমন কমিশন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার সম্বন্ধে সুপারিশ করিবার জন্য ভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। 1927-28 সালে তাহারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেন। কংগ্রেস এই কমিশন বর্জন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মুসলীম লীগ ও নরমপন্থীদের প্রতিষ্ঠান জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশন (National Liberal Federation) একই পথ অবলম্বন করে। কমিশন যেখানেই যান সেখানেই বিক্ষোভ দেখানো হয় ও হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলন সরকার সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগে নিষ্পেষিত করিবার চেষ্টা করে। যে অসংখ্য ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয় তাহাদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা লালা লাজপৎ রায়।

1930 সালের পয়লা জানুয়ারী কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতাকে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করে এবং প্রতি বৎসর 26শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 1929 সালের 31শে অক্টোবর ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে গভর্ণর জেনারেল্ লর্ড আরউইন্ ঘোষণা করেন যে ডোমিনিয়নে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলিত সেই প্রকার শাসনতন্ত্র ভারতে প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারের চরম লক্ষ্য। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে সাইমন কমিশন্ রিপোর্ট পেশ করিবার পর বিলাতে গোল টেবিল বৈঠক হইবে। এই বৈঠকে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের সকল দল এবং রাজন্যবর্গ প্রতিনিধি

পাঠাইবার সুযোগ পাইবেন। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে ভারতের সংবিধান প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা একমাত্র ভারতীয়দের গণভোটে নির্বাচিত সংবিধান পরিষদেরই আছে। কংগ্রেস ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কোন সংবিধান গ্রহণ করিবে না। 1930 সালে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কমিশন প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সুপারিশ করে। ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইবে তাহাও উল্লিখিত হয়। ঐ বৎসরই গান্ধীজীর নেতৃত্বে লবণ-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় এবং ঐ আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক মানুষ কারাবরণ করে। ব্রিটিশ সরকারের দমন-নীতি চরম আকার ধারণ করে এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের বিক্ষোভ আরও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে।

1930 সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে রাজন্যবর্গ দাবি করেন যে তাঁহারা সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে পারেন, যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি কেন্দ্রীয় সংসদের নিকট দায়িত্বশীল সরকারে পরিণত করা হয়। কংগ্রেস প্রথম বৈঠকে যোগদান করে না। তখন সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু 1931 সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অবসানে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হইবার পর গান্ধীজী কংগ্রেসের পক্ষ হইতে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায় ঐ বৈঠকে একমত হইতে পারে না। কংগ্রেসের বিরোধিতা চলিতে থাকে এবং 1932 সালে কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। এই সময়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয়। ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট 1935 সালে একটি সংবিধান আইন পাশ করে।

1935 সালের আইনের মূলনীতি

(1) এই আইনদ্বারা প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

(2) সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ব্যবস্থা এই সংবিধানের একটি বিশেষত্ব। সমস্ত প্রদেশগুলির যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজ্য সম্বন্ধে তাহা স্বেচ্ছামূলক থাকে।

(3) কেন্দ্রে দ্বৈরাজ্য শাসনব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করা হয়। 1919 সালের আইনে প্রদেশে দ্বৈরাজ্য ব্যবস্থা ছিল। 1935-এর সংবিধানে প্রদেশে স্বায়ত্ব-শাসন এবং কেন্দ্রে দ্বৈরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

(4) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দুইকক্ষবিশিষ্ট হইল। নিম্ন পরিষদ যুক্তরাষ্ট্রীয় সভা (Federal Assembly) ও উচ্চ পরিষদ রাজ্য পরিষদ (Council of States) নামে অভিহিত হইল।

(5) কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন মণ্ডলীর ক্ষমতা খুব সীমিত করা হয়।

(6) এই আইন দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত (Federal Court) স্থাপিত হইল।

(7) বিলাতের ভারতীয় পরিষদ নামক পরিষদ বাতিল করা হয়।

(8) 1919 সালে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে বিলাতে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত একজন হাইকমিশনার থাকিবে। ইহার কোন পরিবর্তন হয় না।

1935 সালের আইন কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দলকে খুশি করিতে পারে নাই। এমনকি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পর্যন্ত বলিয়াছিলেন যে 1935 সালের সংবিধান সম্পূর্ণরূপে অসার, মূলতঃ দোষাবহ ও একেবারেই গ্রহণের অযোগ্য ("Thoroughly rotten, fundamentally bad and thoroughly unacceptable")। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলেন যে ঐ সংবিধানের বহির্ভাগ গণতান্ত্রিক কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অন্তঃসারশূন্য। জওহরলাল নেহেরুর মতে 1935 সালের সংবিধান এমন একটি মোটরের সহিত তুলনীয় যাহার ইঞ্জিন নাই কিন্তু ব্রেক খুব শক্তিশালী ("machine with strong brakes and no engine") অর্থাৎ এই সংবিধান দ্বারা দেশের অগ্রগতির সম্ভাবনা নাই বরং দেশের প্রগতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

1935 সালের সাংবিধানিক আইন আংশিকভাবে 1937-এর পয়লা এপ্রিল প্রবর্তিত হইল। দেশীয় নৃপতিবর্গ যোগদান করিলেন না। তাই সংবিধানের যে অংশটুকু সর্বভারতীয় শাসন-পদ্ধতির সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কিত অংশ তাহা কার্যকর করা হয় নাই। কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্ব-শাসন সংক্রান্ত অংশটুকু চালু করা হইল। কংগ্রেস প্রথমে 1935 সালের আইন অনুযায়ী নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে কিন্তু পরে কংগ্রেসদল নির্বাচনে ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টির বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে; যথা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ। বাংলা, আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে না পারিলেও, ঐ তিনটি প্রদেশে বিধানসভায় কংগ্রেস দলই ছিল সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দল। অল্পদিনের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিধানসভায় কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সুতরাং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ ছিল কিন্তু কংগ্রেসের নীতি অনুযায়ী এই দল মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। কংগ্রেসের বক্তব্য ছিল এই যে 1935 সালের আইনে প্রকৃত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয় নাই, কারণ প্রাদেশিক

শাসনকর্তা গভর্ণর ইচ্ছা করিলে মন্ত্রীসভার যে কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারেন। তাই যখন 1937 সালের পয়লা এপ্রিল সংবিধান প্রবর্তিত হইল তখন কংগ্রেস দল মন্ত্রীসভা গঠনে অস্বীকৃত হয়। 1937 সালের 21 জুন গভর্ণর জেনারেল ঘোষণা করেন যে প্রাদেশিক শাসনক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর সিদ্ধান্তই বলবৎ থাকিবে, গভর্ণর কোন হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই ঘোষণার পর 1937 সালের জুলাই মাসে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সরকার গঠনে অগ্রসর হয়, এই শর্তে যে কংগ্রেস সরকারসমূহ 1935 সালের আইনের অবাঞ্ছিত অংশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবে এবং কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী কাজ করিয়া যাইবে।

বিশেষ লক্ষণীয় যে 1937 সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত চারশত বিরাশীটি আসনের মধ্যে মাত্র একান্নটি দখল করিতে সমর্থ হয়[1]। পাঞ্জাব মুসলমান-গরিষ্ঠ প্রদেশ কিন্তু এখানেও মুসলিম লীগ ইউনিয়নিষ্ট দলের নিকট পরাজিত হয়। এই দলটি ছিল মুসলমান, হিন্দু, শিখ সম্প্রদায়ের মিলিত কৃষক-স্বার্থভিত্তিক দল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও মুসলমান গরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু ঐ স্থানেও মুসলিম লীগ সংখ্যা-গরিষ্ঠতালাভ করিতে পারে নাই।

1938 সালে সিন্ধুপ্রদেশে ও আসামে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্য কয়েকটি দল কোয়ালিশন বা যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করে। কেবল বাংলা ও পাঞ্জাবের মন্ত্রীসভাদ্বয় কংগ্রেসের প্রভাবের বাহিরে থাকিয়া যায়।

এই সময়ে কংগ্রেসের সহিত মুসলিম লীগের যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠনের কথা উঠে। জিন্নাহ্ স্বয়ং এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। কংগ্রেস এই সম্বন্ধে মন্তব্য করে যে যদি বিধানসভার মুসলিম লীগপন্থী সদস্যগণ তাহাদের পৃথক সত্তা বিলুপ্ত করিয়া কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ (discipline) স্বীকার করিয়া লয় তাহা হইলে ঐরূপ যুক্ত মন্ত্রীসভা গঠন করা যাইতে পারে। লীগ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং কংগ্রেস নিয়ন্ত্রিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার হইতেছে এইরূপ দোষারোপ করিয়া তীব্র প্রচার আরম্ভ করে। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং 1940 সালের মার্চমাসে অনুষ্ঠিত মুসলীম লীগ সম্মেলনের দ্বিজাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান প্রস্তাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। এই সূত্রে অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড বলেন "...There might be some truth in the charges but that did not mean that the congress ministers had lent themselves to a policy of communal injustice, still less deli-

1 Ghosal, A. K. Development of Indian Constitution, p. 261.

berate persecution."[1] অর্থাৎ মুসলিম লীগের প্রচারের মধ্যে সামান্য সত্য থাকিতে পারে, কিন্তু কংগ্রেস মন্ত্রীগণ ইচ্ছাপূর্বক সাম্প্রদায়িক অত্যাচার চালাইয়াছেন, এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্ণর স্যার হ্যারী হেইগের উক্তি উদ্ধৃতি করিয়াছেন। স্যার হ্যারী বলিতেছেন "In dealing with communal issues Ministers had normally acted with impartiality and a desire to do what was fair."[2] অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বিরোধের ক্ষেত্রে মন্ত্রীগণ নিরপেক্ষভাবে যাহা ন্যায্য তাহাই করিয়াছেন।

আর. কুপল্যাণ্ড আরও লিখিয়াছেন যে, "··taken as a whole the records of the ministers was one in which the congress could take a reasonable pride."[3] অর্থাৎ কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি তাহাদের কাজের জন্য গর্ব অনুভব করিতে পারেন। সত্যই কংগ্রেস মন্ত্রীসভাসমূহ সীমিত সুযোগগুলি দেশোন্নতির কাজে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, ভূমি ব্যবস্থা, মাদক দ্রব্য নিবারণ, অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, ইংলণ্ডের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্বীকৃত কতকগুলি সুষ্ঠুনীতি তাহারা কংগ্রেস প্রদেশগুলিতে গভর্ণর বা রাজ্যপালের সাময়িক বাধাদানের চেষ্টা সত্ত্বেও, সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

1 Coupland R. India ; A Re-statement, p. 188.

2 Ghosal, A. K. Developmeut of Indian Constitution, p. 267 (Quoted)

3 Coupland R. India ; A Re-statement, pp 160-61.

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনের ক্রান্তিকাল (1939–1947)

এই যুগটিকে নিম্নলিখিতরূপে সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করা চলে।

(1) 1939 সাল হইতে 1940

1939 সাল হইতে 1947 সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের ইতিহাস যেমন ঘটনাবহুল তেমনি জটিল। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্নকালে, 1939 সালের আগষ্ট মাসে ঘোষণা করে যে কংগ্রেস সর্বপ্রকার ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের ঘোর শত্রু বটে; কিন্তু ব্রিটিশ পক্ষও সাম্রাজ্যবাদী। তাই আসন্ন যুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহে। 1939 সালের পয়লা সেপ্টেম্বর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রিটেন ঐ দিনই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লিনলিথগো ভারতের জনমতের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপন না করিয়া এমনকি কেন্দ্রীয় বিধানমণ্ডলীর কোন প্রকার মতামত গ্রহণ না করিয়াই ঘোষণা করিলেন যে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ একতরফা ঘোষণায় ভারতীয় জনমত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। 1939 সালের চৌদ্দই সেপ্টেম্বর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের তীব্র নিন্দা করিয়া ঘোষণা করে যে যদি ব্রিটেনের সরকার অবিলম্বে কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন করিতে সম্মত হয় এবং যুদ্ধান্তে সাম্রাজ্যবাদের অবসান সাধন করিয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস ভারতসরকারের সহিত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত হইবে।

কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার চারদিন পর, আঠারই সেপ্টেম্বর তারিখে মুসলিম লীগের কার্য্যনির্বাহক সমিতি দাবি করে যে (ক) কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে মুসলমানদের প্রতি ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (খ) মুসলিম লীগের সম্মতি ব্যতীত কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করা চলিবে না; (গ) লীগ আরও দাবি করে যে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানগণের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক

প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই শর্তগুলি পূরণ হইলে মুসলমানসমাজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত থাকিবে।

কংগ্রেস ও লীগের উপরোক্ত প্রস্তাবদ্বয়ের উত্তর স্বরূপ বড়লাট লিনলিথগো 1939 সালের সতেরই অক্টোবর একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন। তাহার মর্ম এই যে : (ক) ভারতে ডোমিনিয়ন ধরনের দায়িত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ব্রিটিশ সরকারের চরম লক্ষ্য ; (খ) বিবৃতিতে বড়লাট ভারতীয় জাতীয় জীবনে অনৈক্যের উল্লেখ করেন এবং বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আশ্বাস দেন যে তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া তৎকালের প্রচলিত শাসনতন্ত্র অর্থাৎ 1935 সালের ভারতশাসন আইনের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না ; (গ) তিনি আরও বলেন যে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য একটি যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটি ভারতে নিয়োগ করা যাইতে পারে ; (ঘ) যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল রাজন্যবর্গের প্রতিনিধিগণের সহিত 1935 সালের ভারতশাসন আইনের কি কি পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়, তাহা আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছে।

ঐ ঘোষণার চারদিন পর 1939 সালে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বড়লাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দেয় এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেসী মন্ত্রীপরিষদগুলিকে বড়লাটের ঘোষণার প্রতিবাদস্বরূপ পদত্যাগ করিতে আদেশ দেয়। সাতটি প্রদেশের কংগ্রেস মন্ত্রী পরিষদের পদত্যাগের পর মুসলীম লীগ আনন্দ প্রকাশ করে এবং ঐ পদত্যাগের দিনটিকে লীগ 'মুক্তি দিবস'-রূপে সাড়ম্বরে পালন করে।

ইহার পর কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি 23শে নভেম্বর (1939) তারিখে পুনরায় স্বাধীনতা দাবি করে এবং ঘোষণা করে যে স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপরিষদের দ্বারাই প্রণীত হইবে। গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত গণপরিষদই সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত সংস্থা। লক্ষণীয় যে ঐ প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি যদি ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহা হইলে গণপরিষদে তাহাদিগকে জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথক নির্বাচন নীতির ভিত্তিতে সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

এইস্থলে মনে রাখা প্রয়োজন যে 1928 সালে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র দাবি সমূহ সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক অগ্রাহ্য হইবার পর হইতে মুসলীম লীগ এবং বস্তুতঃ রাজনীতিতে প্রভাবশীল মুসলমান সমাজের একটি বৃহদংশ মনে করিল যে হিন্দুগণ ও কংগ্রেস তাহাদের দাবি কিছুতেই মানিয়া লইবে

না। ইহার পর হইতে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন একশ্রেণীর মুসলমান ও প্রভাবশীল একশ্রেণী হিন্দুগণের মধ্যে বিভেদরেখা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উদ্ভব হয়। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বাণী প্রচার করিতে থাকেন কিন্তু তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। 1928 হইতে 1940 সালের ভারতীয় ইতিহাস সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতির দ্বারা কণ্টকিত। এই সময়ে দেশ বিভাগের পটভূমি প্রস্তুত হইতে থাকে। ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে মুসলমান সমাজের বিভেদপূর্ণ-মনোভাবের অগ্নিতে ইন্ধন জোগাইয়া অবস্থাটি আরও জটিল করিয়া তুলিলেন।

মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ চৌদ্দই ডিসেম্বর 1939 গণপরিষদ সম্বন্ধীয় কংগ্রেস-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ঘোষণা করেন যে প্রস্তাবিত গণপরিষদ কংগ্রেসরই একটি তাঁবেদার সভায় পরিণত হইবে। 1940 সালের মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনের সভাপতিরূপে মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ মন্তব্য করেন যে মুসলমানগণ একটি পৃথক জাতি, সম্প্রদায় নহে, এবং পৃথকজাতি হিসাবে তাহারা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দাবি করিবার অধিকারী। এই মর্মে লাহোরে 1940 সালে মার্চ মাসে মুসলিম লীগ পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র দাবি করিয়া বসে। এই প্রস্তাবটি পাকিস্তান প্রস্তাব হিসাবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। এইরূপে দেশ বিভাগের দাবি উত্থাপিত হইল। এই প্রস্তাবে দাবি করা হয় যে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি দিতে হইবে। ইহাই ভারতের সমগ্র মুসলমান সমাজের দাবি বলিয়া মুসলিম লীগ প্রচার চালাইতে থাকে।

বলা বাহুল্য, ভারতের অগণিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান সমাজ এই মতের ও বিশেষতঃ, দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করিতে থাকেন। তাঁহারা বলেন যে ধর্ম কখনও জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হইতে পারে না। জাতি গঠনের যে সকল উপাদান তাহার মধ্যে ইতিহাস ও ভাষা সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ। ইতিহাস ও ভাষা ভারতের হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গাঁথিয়াছে। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের কালে, 1857 সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে, বিপ্লবী আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে, দীর্ঘকাল-যাবৎ গান্ধীজীর নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে ও মৃত্যুবরণ করিয়াছে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি এই নীতি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। জাতীয়তা-বাদী মুসলমানগণ আরও বলেন যে ভারতের বিভাগ সমগ্রদেশে দারুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। অগণিত দরিদ্র মুসলমানসমাজ প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইউরোপে ব্রিটিশ পক্ষের দারুণ পরাজয় ঘটিতে থাকে এবং পরাজিত, পলায়নপর ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ডানকার্কে অভাবনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। প্রচুর লোকক্ষয় হয় ও শোচনীয় পরাজয় বরণ করিয়া এবং বিরাট সমরোপকরণ পশ্চাতে ফেলিয়া ব্রিটিশবাহিনী কোনক্রমে দেশে পলায়ন করে। ব্রিটিশ জাতির এই চরম দুর্গতির মুহূর্তে হিটলার ব্রিটেনের উপর বিমান আক্রমণ শুরু করেন। ব্রিটেনের এই সংকট কালে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে ব্রিটেনের সর্বনাশের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষ স্বাধীনতা কামনা করে না ("We do not seek our independence out of Britain's ruin")।

(2) 1940—1942

1940 এর জুলাই মাসে পুনায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করে যে দুইটি শর্তে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে প্রস্তুত। প্রথমটি এই যে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধান্তে ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবেন এবং কেন্দ্রে অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকার গঠিত হইবে এবং এই সরকার কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল হইবে।

1940 সালের আটই আগষ্ট ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিক্রমে ঘোষণা করেন যে ভারতের জাতীয় জীবনে একতার অভাবের দরুন কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গঠন সম্ভব নহে। তবে একটি যুদ্ধ উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা যাইতে পারে এবং বড়লাটের পরিষদে কয়েকজন অতিরিক্ত সদস্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। যুদ্ধ শেষে ভাবী শাসনতন্ত্র আলোচনা করিবার জন্য ভারতের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি বৈঠক ডাকা হইবে। ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা এই সভাকে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সমূহ, দেশীয় রাজন্যবর্গ, প্রতিরক্ষা ও সরকারী কর্মচারীগণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পরিহার করিতে পারিবেন না। বড়লাট তাহার ঘোষণায় আরও বলেন যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে স্বীকৃত হইবে না, ব্রিটিশ সরকার সেইরূপ পরিবর্তনে রাজি হইবে না। বড়লাটের এই ঘোষণা আগষ্ট ঘোষণা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই ঘোষণায় মুসলীম লীগের দেশ বিভাগপন্থী নীতিকেই মদৎ দেওয়া হইল।

কংগ্রেস কার্যনির্বাহক সমিতি 1940 সালের আঠারই আগষ্ট তারিখের

একটি প্রস্তাব দ্বারা বড়লাটের প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করে। গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে বড়লাটের প্রস্তাব রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পরিপন্থী। ইহার দ্বারা ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে বিভেদই বাড়াইয়া দিয়াছে।

মুসলিম লীগ সরকারী প্রস্তাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় অংশটি গ্রহণ করে এবং দাবি করে যে বড়লাটের পরিষদের অতিরিক্ত সদস্যদের মধ্যে অর্ধেক আসন মুসলীম লীগের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। উদারনৈতিক দল বড়লাটের ঘোষণা নীতিগত ভাবে গ্রহণ করিয়া মন্তব্য করে যে ঘোষণাটির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রয়োজন। লিবারেল বা উদারপন্থী দল আরও মন্তব্য করে যে এক শ্রেণীর সংখ্যালঘু ও রাজন্যবর্গ প্রভৃতির স্বার্থরক্ষার অজুহাতে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক বিবর্তন স্তব্ধ করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অচলাবস্থার অবসানের জন্য কংগ্রেস এই সময়ে গণসত্যাগ্রহ-প্রস্তাব বিবেচনা করিতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতার জন্য সে প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল না। তিনি বলেন যে যখন ব্রিটিশ পক্ষ নাৎসীদের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন সংগ্রামে লিপ্ত, তখন ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রত করা সত্যাগ্রহীর নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু বড়লাটের প্রস্তাবের প্রতিবাদ স্বরূপ কংগ্রেস ব্যক্তিগত প্রতীক সত্যাগ্রহ নীতি গ্রহণ করে। বিনোভা ভাবে ছিলেন এই আন্দোলনের প্রথম সত্যাগ্রহী। তিনি ও তাঁহার পর সমগ্র ভারতে হাজার হাজার মানুষ এইরূপে কারাবরণ করেন এবং এই নৈতিক প্রতিবাদ দেশে ও বিদেশে ভারতের ন্যায্য দাবি সম্বন্ধে জনমত সচেতন করিয়া তোলে।

অন্য দিকে যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষের বিপর্যয় অব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ সরকারের শুধু সামরিক নহে নৈতিক বলেরও অবক্ষয় ঘটে। এই অবস্থায় ভারতীয় বিক্ষোভ উপশমের উদ্দেশ্যে আগষ্ট ঘোষণা অনুসারে সাতজন সদস্যবিশিষ্ট বড়লাটের পরিষদে আরও পাঁচজন ভারতীয়কে অতিরিক্ত সদস্য-রূপে নিযুক্ত করা হয়। বেসরকারী মনোনীত সদস্যদের লইয়া জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদ নামে একটি সংস্থাও গঠিত হইল। কিন্তু ইহাতে কংগ্রেসের বা মুসলিম লীগের নীতির কোন পরিবর্তন ঘটিল না।

1941 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্টের হস্তক্ষেপে সুপ্রসিদ্ধ এ্যাট্লাণ্টিক চার্টার রুজেভেল্ট ও চার্চিল কর্তৃক 1941 সালে চৌদ্দই আগষ্ট স্বাক্ষরিত হয়। এ্যাট্লাণ্টিক চার্টার মিত্রপক্ষের যুদ্ধোত্তর উদ্দেশ্যাবলী সংক্রান্ত একটি দলিল।

এই দলিলে অন্য বিষয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা হইল যে প্রতি জাতির নিজ নিজ শাসন পদ্ধতি স্থির করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার আছে। রুজেভেল্ট মনে করিয়াছিলেন যে এই নীতি সকল দেশে প্রযুক্ত হইবে। কিন্তু ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের নয় তারিখে চার্চিল একক ভাবে ঘোষণা করেন যে এই নীতি ভারতবর্ষে খাটিবে না। ইহাতে ভারতের উপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কায়েমী অধিকার বজায় থাকিবে, এই রূপই ইঙ্গিত করা হইল।

1941 এর ডিসেম্বর মাসের আট তারিখে জাপান অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান করে এবং দ্রুত ফিলিপিন, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, মালয় ও সিঙ্গাপুর দখল করিয়া ফেলে। অক্ষশক্তির এই অভাবনীয় সাফল্য কংগ্রেসকেও শঙ্কান্বিত করিয়া তোলে। কংগ্রেসের নীতি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বারদৌলিতে মিলিত হইয়া কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি একটি নূতন প্রস্তাব গ্রহণ করে। কংগ্রেস স্থির করে যে কংগ্রেস ভারত সরকারের সহায়তা করিতে পারে দুইটি শর্তে: (ক) যুদ্ধান্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে এবং (খ) কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সরকার গঠন করিতে হইবে।

অক্লান্ত বিপ্লবী, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেসের অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ শক্তির শত্রু যে কোন জাতির সামরিক সাহায্যে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। 1941 সালে গৃহবন্দী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় পুলিশের নজর এড়াইয়া আফগানিস্তানের পথে বার্লিন যান এবং সেই স্থান হইতে জার্মানীর সাবমেরিনে টোকিওতে উপস্থিত হন।

জাপান 1942-এর প্রথম ভাগে ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করে এবং 7-ই মার্চ রেঙ্গুন দখল করিয়া লয়। ভীত, চকিত ব্রিটিশ সামরিক নেতৃত্ব জাপানের সহিত যুদ্ধে চরম ভীরুতার পরিচয় দেয় এবং পরাজয় বরণ করিয়া ভারত অভিমুখে পলায়ন করে। সিঙ্গাপুরে এবং ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী-ভুক্ত কয়েক হাজার ভারতীয় সৈন্য বন্দী হয় এবং পরবর্তীকালে তাহাদের এক বৃহদংশ জেনারেল মোহন সিং-এর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজে সংগঠিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসু কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ (India Independence League) গঠন করিয়াছিলেন। তিনি মোহন সিং-এর সহিত একযোগে কাজ করিতে থাকেন। সুভাষচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় উপস্থিত হইলে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতীয়

স্বাধীনতা সংঘের নেতৃত্ব তাহারই হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি সিঙ্গাপুরে 1943 সালে একটি ঐতিহাসিক ঘোষণা দ্বারা স্বাধীন ভারতের সরকার গঠন করেন এবং জাপানের সহায়তায় আজাদ হিন্দ্ ফৌজ লইয়া ভারত অভিমুখে অভিযান শুরু করেন এবং ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হন।

এই সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজেভেল্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলকে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার গণতান্ত্রিক সমাধানের জন্য পুনঃ পুনঃ চাপ দিতে থাকেন। তদানীন্তন চীন সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট চিয়াং কাই শেক্ ভারত সফরে আসিয়া ঘোষণা করেন যে সমর-সজ্জায় ভারতের জনগণের সাগ্রহ সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় দাবি স্বীকার করিয়া লওয়া সমীচীন।

(3) ক্রিপস্ মিশন : 1942

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘোর দুর্দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে আশঙ্কা করিয়া ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলও বিচলিত হইয়া পড়েন। রেঙ্গুন পতনের (1942 সালের আটই মার্চ) তিনদিন পর অর্থাৎ এগারই মার্চ চার্চিল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে কমন্স্ সভায় ঘোষণা করেন যে বিলাতের ক্যাবিনেট মন্ত্রী সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কল্পে কয়েকটি প্রস্তাব লইয়া ভারতে যাইতেছেন।

ক্রিপ্স্ প্রস্তাবের মূল কথাগুলি সংক্ষিপ্তাকারে এইরূপ :—

(ক) কংগ্রেসের দাবি মূলতঃ স্বীকার করিয়া ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে যুদ্ধান্তে ভারতীয়গণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ ভারতবর্ষের ভাবী সংবিধান প্রণয়ন করিবে।

(খ) ভারতের সংবিধান ডোমিনিয়ন ধরনের হইবে।

(গ) যুদ্ধশেষে প্রতি প্রদেশের নিম্নতন ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে এবং প্রতি প্রাদেশিক সভার নির্বাচিত সদস্যগণ আনুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে (proportional representation) সংবিধান পরিষদে (constitution-making body) প্রতি প্রদেশের সদস্যসংখ্যার একদশমাংশ সংখ্যক সদস্য নির্বাচন করিবেন। দেশীয় রাজ্যগুলি প্রত্যেকটি নিজ নিজ জনসংখ্যা অনুপাতে সংবিধান পরিষদে সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকারী হইবে। সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের জনসংখ্যার অনুপাতে যে কয়েকটি আসন ভারতীয় প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে, ঠিক সেই অনুপাতেই দেশীয় রাজ্যগুলির জন্য আসনের ব্যবস্থা করা হইবে।

(ঘ) যদি কোন প্রদেশ সর্বভারতীয় ইউনিয়নে যোগ না দিতে চায় তাহা

হইলে তাহার পৃথক থাকিবার অধিকার ও তাহাদের নিজ সংবিধান গঠন করিবার অধিকার থাকিবে। দেশীয় রাজন্যবর্গকেও এই অধিকার দেওয়া হইবে।

(ঙ) সংবিধান পরিষদকে ব্রিটিশ সরকারের সহিত ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে হইবে। এই সন্ধিপত্র দ্বারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতিশ্রুতি অনযায়ী বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত ব্রিটিশ সরকারের বিভিন্ন ধরনের যে সকল সন্ধিপত্র আছে, সেগুলির পরিবর্তন করিতে হইবে।

(চ) মধ্যবর্তীকালে প্রতিরক্ষা ব্যতীত অন্যসকল বিভাগের কর্তৃত্ব বড়লাটের পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণের হস্তে প্রদান করা হইবে।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দুমহাসভা, সর্বদলীয় শিখ সম্মেলন, সর্ব-ভারতীয় মমিন সম্মেলন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ বিভিন্ন কারণ দেখাইয়া ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে। কংগ্রেসের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ে ভাবতীয় ক্ষমতা অপরিহার্য, কারণ ভারতীয়দের স্বদেশ রক্ষা করিবার অধিকার আছে। কংগ্রেস আরও মন্তব্য করে যে যুদ্ধকালে সমস্ত বিভাগই প্রতিরক্ষার আওতায় আসিতে বাধ্য। সুতরাং প্রতিরক্ষা ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত না করিবার অর্থ এই যে যুদ্ধকালে কোন বিভাগেই ভারতীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে না।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল এই যে কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজা ইচ্ছা করিলে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ না দিতেও পারে। এই বিষয়ে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবটি দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিবার প্রস্তাব বই কিছুই নহে।

মুসলিম লীগের আপত্তির কারণ ছিল এই যে ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবে পাকিস্তান গঠনের কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং প্রস্তাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থাও অনুপস্থিত ছিল।

কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক গান্ধীজী ক্রিপ্‌স্ প্রস্তাবকে 'a post dated cheque on a crashing bank' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যে ব্যাঙ্কের পতন অবশ্যম্ভাবী, এমনি ব্যাঙ্কের উপর দূর-ভবিষ্যতের তারিখ দেওয়া চেক্ যেমন মূল্যহীন, ক্রীপস্ প্রস্তাবও তেমনি।

কোন গত্যন্তর না দেখিয়া কংগ্রেস 1942 সালের আগষ্ট মাসের আট তারিখে 'ভারত ছাড়' (Quit India) প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে মিত্র-শক্তিবর্গের আদর্শের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং ঘোষণা করা হয়

যে সেই আদর্শ রূপায়ণের জন্য ও ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে ব্রিটিশ সরকারকে অবিলম্বে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে জাতিকে গণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলনে লিপ্ত হইতে হইবে।

নয়ই আগষ্ট গান্ধীজীসহ কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। কিন্তু আন্দোলন ব্যাপকতালাভ করে; স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন ছড়াইয়া পড়ে। অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অনুপস্থিতিতে জয়প্রকাশ নারায়ণ গুপ্ত-ভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নেতৃত্ব দিতে থাকেন। উত্তর প্রদেশে বালিয়া ও বস্তী, মহারাষ্ট্রের সাঁতারা, পশ্চিম বাংলার মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমায় কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ সরকারের অবসান ঘটে। সরকারী হিসাব অনুযায়ী এই আন্দোলনে ষাট হাজার ব্যক্তি গ্রেপ্তার বরণ করেন, আঠারো হাজার বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। নয় শত চল্লিশ জন জীবন হারান এবং ষোল শত ত্রিশ জন আহত হন।[1]

ভারত সরকার গান্ধীজীকে দোষারোপ করেন যে, তিনি গণ-আন্দোলনের সহিংস প্রকাশের জন্য দায়ী। এই দোষারোপের প্রতিবাদ স্বরূপ গান্ধীজী একুশ দিনের জন্য অনশন শুরু করেন। কিছুদিন পরে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়ে। গান্ধীজীর মুক্তির জন্য দেশব্যাপী বিক্ষোভ আরম্ভ হয়। গভর্ণর জেনারেলের শাসন পরিষদের তিনজন সদস্য এম, এস, এ্যানে, হোমি মোদি এবং নলিনীরঞ্জন সরকার পদত্যাগ করেন। কিন্তু গান্ধীজীকে মুক্ত দেওয়া হইল না। একুশদিন অনশনের পর তিনি ধীরে ধীরে কিছু পরিমাণে সুস্থ হইয়া উঠেন; কিন্তু 1944 সালে গুরুতর অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহার জীবনাশঙ্কা করিয়া তৎকালীন বড়লাট লর্ড ওয়েভেল গান্ধীজীকে মুক্তি দেন। গান্ধীজী মুক্তির পর বড়লাটের সহিত রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পত্রালাপ করেন; কিন্তু তাহাতে ফল হয় না। 1944 সালের সেপ্টেম্বরে গান্ধী-জিন্নাহ আলোচনা হয়। কিন্তু জিন্নাহ্ পাকিস্তানের দাবীতে অটল থাকায় ঐ আলোচনা বিফল হইয়া যায়।

অন্য দিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের I. N. A. বা আজাদ হিন্দ্ ফৌজ 1944 সালের চৌদ্দই এপ্রিল মণিপুর ও নাগাল্যাণ্ড শত্রুমক্ত করিয়া মণিপুরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।[2]

এই সময়ে ইউরোপের রণাঙ্গনে মিত্রশক্তি জয়লাভ করিতে থাকেন। কিন্তু জাপান তখনও পরাজিত হয় নাই। বিলাতে নির্বাচনের তোড়জোড় চলিতেছে। শ্রমিকদল চার্চিলের রক্ষণশীলদলকে ভারতের অমীমাংসিত রাজনৈতিক সমস্যার জন্য তীব্র সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয়। এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল বড়লাট লর্ড ওয়েভেলকে লণ্ডনে আহ্বান করেন এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের নূতন প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব ওয়েভেল প্রস্তাব বলিয়া পরিচিত কারণ ইহা ওয়েভেলের আগ্রহাতিশয্যেই উপস্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রস্তাব অন্তর্বর্তীকালের জন্য। এই অন্তর্বর্তী প্রস্তাবাবলীর মূলকথা নিম্নলিখিত রূপ :

(4) ওয়েভেল প্রস্তাব

(ক) বড়লাটের শাসন পরিষদ বড়লাট ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ব্যতিরেকে কেবলমাত্র ভারতীয় সদস্যগণ কর্তৃক গঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক বিভাগও একজন ভারতীয় সদস্যদ্বারা পরিচালিত হইবে; ভারতীয় সদস্যগণের সংখ্যা হইবে দশ।

(খ) পরিষদে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকিবে।

(গ) দেশীয় রাজ্যগুলি এই প্রস্তাবের আওতায় আসিবে না।

এই প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিবার জন্য বড়লাট দলীয় নেতাগণের একটি সভা আহ্বান করেন। এই সভায় জিন্নাহ্ দাবি করেন যে পরিষদের 5 জন মুসলমান সদস্যগণকেই মুসলীম লীগ মনোনীত করিবে এবং কংগ্রেস কোন মুসলমানকে মনোনয়ন দিতে পারিবে না। কংগ্রেস প্রস্তাব করে যে হিন্দুদের জন্য যে পাঁচটি আসন সংরক্ষিত আছে তাহার একটিতে কংগ্রেস একজন মুসলমানকে মনোনীত করিবে। জিন্নাহ্ ইহাতেও রাজি হন না। তিনি বলেন কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান; কোন মুসলমানকে কংগ্রেস মনোনীত করিলে মুসলীম লীগ ঐ সরকারে যোগ দিবে না। কংগ্রেস এই দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করে। কারণ তখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতা মৌলানা আবুল কলাম আজাদ এবং কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানের সংখ্যাও নগণ্য ছিল না। এই অনৈক্যের সুযোগ লইয়া ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্ভব নহে।

বিলাতে শ্রমিক সরকার

1945 সালের নির্বাচনে চার্চিলের রক্ষণশীল দল পরাজিত হয় এবং শ্রমিক-দল বিলাতে সরকার গঠন করে। নূতন প্রধান মন্ত্রী এ্যাটলী বড়লাট ওয়েভেলকে বিলাতে আহ্বান করেন। প্রধান মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের নির্দেশ-ক্রমে ওয়েভেল 1945 সালের উনিশে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেন : (ক) ভারতে নূতন নির্বাচনের পর একটি সংবিধান পরিষদ গঠন করা হইবে এবং এই সংবিধান পরিষদ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে ; (খ) অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে সাধারণ নির্বাচনের পর বড়লাটের শাসন পরিষদ কেবল মাত্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থন পুষ্ট ব্যক্তিগণ দ্বারা গঠিত হইবে।

কংগ্রেস স্বাধীনতার দাবি পুনরুত্থাপন করে। এই সময়ে ব্রহ্মদেশ ও পূর্ব ভারতের রণাঙ্গনে আজাদ হিন্দ্ সৈন্য বাহিনী আত্মসমর্পণ করে ও ব্রিটিশ সরকারের হস্তে বন্দী হয়। ভারত সরকার আজাদ-হিন্দ্ ফৌজের তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাপটেইন শা নওয়াজ খাঁ, ক্যাপটেইন শেগল ও লেফটেন্যাণ্ট ধীলনকে ব্রিটিশ ভারতীয় বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ্ ফৌজে যোগদানের জন্য এবং রাজদ্রোহিতার অপরাধে বিচার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিচারে তিনজন সৈন্যাধ্যক্ষেরই ফাঁসির হুকুম হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে দেশে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগে উঁহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

1945-এর ডিসেম্বরে বিলাতের পার্লামেণ্টের কয়েকজন সদস্য ভারতে রাজনৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতে আসেন। তাঁহারা সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে ভারতে স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে ঐক্য রহিয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে রাজনৈতিক দিক হইতে ভারতবর্ষ সাবালকত্ব (political manhood) লাভ করিয়াছে।

এই সময়ে 1946-এর জানুয়ারীতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা-সমূহের নির্বাচন সুরু হয়। মুসলমান প্রধান বাংলা, পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে মুসলীম লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে ; কিন্তু মুসলমান প্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মোট একশত দুইটি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ছাপান্নটি এবং মুসলিম লীগ ত্রিশটি আসন পায়। এই নির্বাচন হইতে বুঝা যায় যে নির্বাচকমণ্ডলী কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করে। ইহাও স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, অধিকাংশ মুসলমান লীগের পাকিস্তান দাবির পশ্চাতে রহিয়াছে।

(5) ক্যাবিনেট মিশন

1946 সালের আঠারই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারতের নৌ-বাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করে এবং পুলিশ ও সৈন্যদলে চাঞ্চল্যের সূচনা লক্ষিত হয়। ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিপদ আশঙ্কা করিয়া 1946-সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী বিলাতের প্রধান মন্ত্রী এ্যাট্‌লী ঘোষণা করেন যে পূর্ণ-স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কয়েকজন মন্ত্রী ভারতে আসিবেন। পনেরই মার্চ, 1946 ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিলাতের প্রধান মন্ত্রী আরও বলেন যদি ভারতীয়েরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে স্বাধীনতা দাবি করে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী হইবে এবং তাহারা একটি সংবিধান পরিষদের মাধ্যমে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র গঠন করিবার অধিকারী হইবে। তেইশে মার্চ, 1946 সালে ক্যাবিনেট মিশন দিল্লী উপস্থিত হন। তাঁহারা কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন ; কিন্তু কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য দেখা যায় না। প্রধানতঃ, দেশ বিভাগের প্রশ্নেই সমস্ত আলোচনা ব্যর্থ হইয়া যায়। নিরুপায় হইয়া ক্যাবিনেট মিশন 1946 সালের ষোলই মে তাঁহাদের নূতন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের মূল সূত্র সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাঠামো যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইবে। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও চলাচল ব্যবস্থার উপর যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব থাকিবে। অন্য ক্ষমতাগুলি প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্যের হস্তে ন্যস্ত হইবে।

(খ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সংশ্লিষ্ট অংশগুলি দুইভাগে ভাগ করা হইবে। প্রথম ভাগে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বালুচিস্তান, বাংলা ও আসাম। দ্বিতীয় ভাগে ভারতের অন্যান্য অংশ থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এবং দ্বিতীয়টি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল।

(গ) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যবর্গ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সংবিধান পরিষদে সদস্য নির্বাচন করিবে। যে সকল দেশীয় নৃপতি সর্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে তাহাদের রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিবেন তাহাদের প্রতিনিধি ঐ পরিষদে স্থান পাইবেন। সংবিধান পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা হইবে দুই শত ছিয়ানব্বই।

(ঘ) পূর্বোক্ত দুইটি বিভাগ হইতে নির্বাচিত সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ পৃথকভাবে মিলিত হইয়া নিজ নিজ সংবিধান প্রস্তুত করিবেন।

(ঙ) সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগে প্রথম নির্বাচনের পর, প্রতিটি

বিভাগের ইচ্ছানুযায়ী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ছেদ করিবার অধিকার থাকিবে।

(চ) বিভিন্ন দলের সম্মতির ভিত্তিতে অবিলম্বে দলীয় প্রতিনিধিদের লইয়া কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হইবে।

মুসলীম লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব সহ ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করে। তবে ক্যাবিনেট মিশনের সংবিধান পরিষদ বিষয়ক প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। মুসলিম লীগ বড়লাটের কাছে দাবি করে যে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ না দিলেও ঐরূপ সরকার গঠিত হইবে, এইরূপ ঘোষণা করা হউক। বড়লাট ইহাতে রাজি হন না। ইহাতে লীগ নেতা জিন্নাহ্ রুষ্ট হইয়া ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সরকারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং বড়লাট লীগের প্রতিনিধি ব্যতিরেকেই অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত লন।

লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম

ইহাতে বিরক্ত হইয়া লীগ ষোলই আগষ্ট (1946) প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (Direct Action) দিবসরূপে প্রতিপালন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ দিন কলিকাতায় সাংঘাতিক দাঙ্গা হয় এবং কয়েকদিন অব্যাহতভাবে লুঠ, খুন, রাহাজানি চলিতে থাকে।

সেপ্টেম্বরের দুই তারিখে জওহরলাল নেহেরুকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া একটি কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ইহার পরই নওয়াখালীতে হিন্দু বিধ্বংসী দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং তাহারই বদলা স্বরূপ কিছুদিন পর বিহারে মুসলমানদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলে। গান্ধীজী উভয় স্থানেই পদ পরিক্রমার মাধ্যমে শান্তি ফিরাইয়া আনিবার প্রয়াস পান।

কিছুদিন পর মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকারে প্রবেশ করিতে সম্মত হয় এবং লীগের প্রতিনিধিবর্গকে ক্যাবিনেটে স্থান দেওয়া হয়।

এই সময়ে জওহরলাল নেহেরু বোম্বাইতে প্রদত্ত একটি ভাষণে ঘোষণা করেন যে কংগ্রেস সম্পূর্ণ খোলা মন লইয়া সংবিধান পরিষদে যোগ দিবে। কোন পূর্ব শর্তদ্বারা তাহাদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হইবে না। এই ঘোষণার পর লীগ ঘোষণা করে যে লীগ সংবিধান পরিষদে যোগ দিবে না। লীগের প্রতিনিধি ব্যতীত সংবিধান পরিষদ 1946 সালের নয়ই ডিসেম্বর প্রথম অধিবেশনে মিলিত হয়।

ব্রিটিশ সরকারের বিশে ফেব্রুয়ারী, 1947-এর ঘোষণা

কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। এইরূপ অচলাবস্থায় 1947 সালের বিশে ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে 1948 সালের জুনের মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর ত্বরান্বিত করিবার জন্য লর্ড ওয়েভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন বড়লাট নিযুক্ত হন। মুসলিম লীগ পুনরায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যসূচী গ্রহণ করে এবং সিন্ধু, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভীষণ দাঙ্গা সুরু হয়। ইহার পাল্টা জবাব স্বরূপ উত্তরপ্রদেশ, পূর্ব-পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে দাঙ্গা ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু ও শিখ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে সর্বহারা হইয়া পূর্ব পাঞ্জাবে ও দিল্লী অঞ্চলে আসিয়া উপস্থিত হন। অনুরূপভাবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পূর্ব পাঞ্জাব, দিল্লী অঞ্চল ও উত্তরপ্রদেশ হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে পলায়ন করে। পূর্ব ও পশ্চিমবাংলায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে অনুরূপ ঘটনা ঘটে।

(6) 3রা জুন, 1947 সালের ঘোষণা : মাউণ্টব্যাটেন প্ল্যান্ ও দেশবিভাগ

এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে শঙ্কিত হইয়া জওহরলাল নেহেরু, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দ, যাঁহারা পূর্বে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে দেশবিভাগের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও মত পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন 1947 সালের তেশরা জুন তারিখের ঘোষণায় কিরূপে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হইবে তাহার মূল ধারাগুলি প্রকাশ করেন। এই ধারাগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) বাংলার বিধান সভার মুসলমান গরিষ্ঠ জেলাগুলির সদস্যবৃন্দ (ইউরোপীয় বাদে) বৈঠকে মিলিত হইয়া স্থির করিবেন তাঁহারা বাংলা বিভাগ চান কিনা। তেমনি বাংলার অন্যান্য জেলাগুলির সদস্যগণও (ইউরোপীয় বাদে) ঐ রূপে পৃথক বৈঠকে মিলিত হইয়া একই প্রশ্নের উত্তর দিবেন। যে কোন একটি বৈঠক যদি বাংলা বিভাগ চান, তাহা হইলে ঐ প্রদেশ বিভক্ত হইবে। পাঞ্জাব সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইয়া গেলে দুই প্রদেশের চারিটি পৃথক পৃথক বৈঠকে প্রশ্ন তুলিতে হইবে, তাহাদের অঞ্চল কোন্ সংবিধান

পরিষদে যোগদান করিবে। এইরূপে বিভিন্ন অংশগুলির রাজনৈতিক ভবিষৎ নির্ণীত হইবে।

(খ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইবে কি না স্থির করিবার জন্য সেই প্রদেশে গণভোট গ্রহণ করা হইবে।

(গ) অনুরূপভাবে আসামের শ্রীহট্ট জেলার ভাগ্য নির্ধারিত হইবে।

(ঘ) সিন্ধু প্রদেশ কোন সংবিধান পরিষদে যোগ দিবে, তাহা ঐ প্রদেশের বিধান সভার সদস্যগণ (ইউরোপীয় বাদে) স্থির করিবেন। তেমনি ব্রিটিশ বা বালুচিস্তান ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(ঙ) দুইটি পৃথক সীমানা-কমিশন বাংলা ও পাঞ্জাবের সীমানা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(চ) এই নীতি কার্যকর করিবার জন্য অবিলম্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আইন প্রণীত হইবে। তবে এই আইন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত সংবিধান পরিষদদ্বয়ের পরিপন্থী হইবে না।

নানা দ্বিধা ও মানসিক দ্বন্দ্বের পর কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই শেষ পর্যন্ত এই নীতিসমূহ মানিয়া লয়। এইরূপে ভারত ও পাকিস্তান—এই দুই পৃথক ডোমিনিয়নের গোড়াপত্তন হইল। দুইটি পৃথক সীমানা কমিশনের রোয়েদাদ (Award) অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বাংলা বিভক্ত হইয়া গেল। দুইটি কমিশনেরই সভাপতি ছিলেন স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্। গণভোট অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলার প্রায় সমগ্র অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। সিন্ধু ও ব্রিটিশ বালুচিস্তানও পাকিস্তানের কলেবর বৃদ্ধি করিল।

(7) ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (1947)

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 1947 সালের আঠারই জুলাই তারিখে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশ করে এবং পনেরই আগষ্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়। আগষ্ট মাসের চৌদ্দই-পনেরই তারিখের মধ্যরাত্রে সংবিধান পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে একটি ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় যে ভারত একটি ডোমিনিয়ন হিসাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত হইল। সংবিধান পরিষদ কর্তৃক লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করা হয়।

এইস্থলে দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা বিবেচনা করা আবশ্যক। 1946 ষোলই মে ও বাইশে মে, এই দুইটি তারিখের ঘোষণাদ্বয়ে ক্যাবিনেট মিশন মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতালাভের পর ব্রিটিশ রাজের

(British Crown) দেশীয় রাজ্যের উপর ক্ষমতার (Paramountcy) অবসান হইবে। তখন দেশীয় নৃপতিগণ আপন ইচ্ছানুযায়ী তাহাদের রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করিবার অধিকারী হইবেন। কিন্তু মিশন ষোলই মের ঘোষণায় স্পষ্টভাবে সুপারিশ করে যে দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা বাঞ্ছনীয়। তাহারা যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে তাহা হইলে দেশীয় রাজ্যগুলিকে শাসনতান্ত্রিক দিক হইতে ভারতীয় প্রদেশগুলির সঙ্গে একই পর্যায়ভুক্ত থাকিতে হইবে। এইজন্য প্রতিটি দেশীয় নৃপতির সহিত ভারত সরকারের চুক্তি বাঞ্ছনীয়। কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ—এই দুইটি দেশীয় রাজ্য ব্যতিরেকে প্রায় অন্য সকল দেশীয় রাজ্যই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে। কাশ্মীর 1947 সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সংকটকালে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত ইউনিয়নে যোগদান করিতে সম্মত হন। ভারত পাকিস্তানী সৈন্যগণকে পরাভত করিয়া কাশ্মীরকে রক্ষা করে।

হায়দ্রাবাদ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিতে অস্বীকার করে। এই নীতির প্রতিবাদে হায়দ্রাবাদের জনগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। জনগণের উপর হায়দ্রাবাদ সরকারের নানাভাবে অত্যাচার শুরু হয়। নূতন ভারত সরকার প্রস্তাব করে যে হায়দ্রাবাদের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করা অপরিহার্য। নিজাম সরকার হায়দ্রাবাদের পৃথক সত্তা রক্ষাকল্পে জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে। অন্যদিকে প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচার অব্যাহত থাকে। এই অবস্থায় ভারত সরকার হায়দ্রাবাদে Police action বা পুলিশী ব্যবস্থা লইতে বাধ্য হন এবং এইজন্য একটি সৈন্যদল প্রেরণ করা হয়। নিজামের সৈন্যবাহিনী ভারতীয় সৈন্যাধ্যক্ষের নিকট আত্মসমর্পন করে। নিজাম জাতিসংঘের নিকট তাহার আবেদন প্রত্যাহার করিয়া লন এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করেন। এইরূপে পাকিস্তান ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশীভূত হইয়া যায়।

সংবিধান পরিষদ ও ভারতীয় সংবিধানের উদ্ভব

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী 1946 সালের জুলাই মাসে সংবিধান পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। 210টি সাধারণ (অ-মুসলমান) আসনের মধ্যে কংগ্রেস 199টি আসনে জয়লাভ করে। মুসলীম লীগ 78টি মুসলমান আসনের মধ্যে 73টি দখল করিতে সমর্থ হয়। কংগ্রেস 199 জন সদস্য ব্যতীত আরও কয়েকজন প্রার্থীকে সমর্থন করিয়াছিল; তাহাদের মধ্যে 12 জন

জয়লাভ করে। সুতরাং সংবিধান পরিষদের 296 জন সদস্যের মধ্যে বস্তুতঃ 211 জনই কংগ্রেসপন্থী ছিলেন। কিন্তু তথাপি সংবিধান পরিষদ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় কারণ মুসলীম লীগ পৃথক পরিষদে পাকিস্তানের সংবিধান রচনায় প্রবৃত্ত হয়।

দেশীয় রাজ্যগুলিও তাহাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে সংবিধান পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। বরোদা, বিকানীর, উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, রেওয়া ও পাতিয়ালা 1947 সালের এপ্রিলে, অন্যান্য রাজ্যগুলি 1947-এর জুলাই মাসের চৌদ্দই তারিখের মধ্যে, জম্মু ও কাশ্মীর এবং হায়দ্রাবাদ যথাক্রমে 1947-এর অক্টোবর ও 1948-এর নভেম্বরে সংবিধান পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পাকিস্তান ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল অংশই ভারতীয় সংবিধান পরিষদে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাবানুযায়ী সংবিধান পরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিল না। কিন্তু 1947 সালের 3রা জুন তারিখের মাউণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (1947) পাশ হইবার পর ভারতীয় সংবিধান পরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতালাভ করে।

এই স্থলে পশ্চাতের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবানুযায়ী গঠিত সংবিধান পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় 1946 সালের নয়ই ডিসেম্বর। ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন। তেরই ডিসেম্বর (1946) পরিষদের আর একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিনের সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সংবিধানের মূলসূত্রগুলি, যেগুলি সংবিধানের মুখবন্ধে এবং মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রের নীতি নির্দেশ সম্বন্ধীয় অংশে লিখিত হইয়াছে, সেই সূত্রগুলিরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই প্রস্তাবে পাওয়া যায়।

সংবিধানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য পরিষদ বিভিন্ন কমিটি নিযুক্ত করে। সংবিধান বিস্তারিতভাবে ও আইনের ভাষায় ও ধরনে লিখিয়া সংবিধান পরিষদে পেশ করিবার জন্য 1947 সালের উনিশে আগষ্ট তারিখে একটি মুসাবিদা কমিটি (Drafting Committee) নির্বাচিত হয়। এই কমিটি যোগ্যতার সহিত সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করেন। এই কমিটিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ ছিলেন: ডক্টর আম্বেদকর (সভাপতি), এন্, গোপালস্বামী আইয়েঙ্গার, আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, কে, এম, মুন্সী, সৈয়দ মহম্মদ শাহদুল্লা, এন্, এম, রাউ, ডি, পি, খৈতান ও বি, এল, মিত্র।

অল্পদিন পরেই বি, এল, মিত্রের সংবিধান পরিষদের সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায়।

ঐ কমিটি 1948 সালের একুশে ফেব্রুয়ারী পরিষদে রিপোর্ট পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর 1949 সালের ছাব্বিশে নভেম্বর ঐ সংবিধান নানা সংশোধনের পর গৃহীত হয় এবং পরিষদের সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সংবিধানে স্বাক্ষর করেন। 1950 সালের চব্বিশে জানুয়ারী সংবিধান পরিষদের শেষ অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনেই রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত গণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। সংবিধান পরিষদ আরও ঘোষণা করে যে 1950-এর ছাব্বিশে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হইবে। ছাব্বিশে জানুয়ারী জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্মরণীয় দিবস। 1930 সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা কংগ্রেসের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হয় এবং স্থির হয় যে প্রতি বৎসর 26শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালিত হইবে। তাহার পর হইতে প্রতি বৎসর ঐ দিবস প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিল। 1950 সালে 26শে জানুয়ারী তারিখে স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রবর্তন পূর্ব ইতিহাসেরই স্মারক। তাই এখনও প্রতি বৎসর ছাব্বিশে জানুয়ারী গণতন্ত্র দিবস প্রতিপালিত হইতেছে।

উপসংহার: ইংরেজ আধিপত্যের অবসান ঘটিল। কালস্রোত নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যের 'দেশ-বেড়া জালকে' ভাসাইয়া দিল। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তৃর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিসহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে"।[1] ব্রিটিশ সরকার যে সকল সমস্যা পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছে তাহা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও নৈতিক ক্ষেত্রসমূহে পরিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীন ভারতে ভারত-বাসীকে সেই আবর্জনা দূরীভূত করিতে হইবে এবং আবার ভারতীয় জীবনধারাকে চলমান ও প্রাণদায়িনী করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের শাসনতন্ত্র যদি সেই আদর্শ লাভে নিয়োজিত হয় তাহা হইলেই শাসনব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠিবে।

---

1 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: সভ্যতার সংকট (পয়লা বৈশাখ, 1348)। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (বিশ্বভারতী সংস্করণ) ষড়্‌বিংশ খণ্ড, p 640।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতীয় সংবিধানের উৎস সন্ধানে

সংবিধান জাতির ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করে। ব্রিটেনের শাসন-ব্যবস্থা ঐ দেশের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফল। তেমনি ভারতীয় সংবিধান ইতিহাসেরই দান। 1757 সালে ভারতে ব্রিটেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ব্রিটিশ শাসন দীর্ঘ এক শত নব্বই বৎসর পর্যন্ত চলিয়াছে। এই দীর্ঘ ইতিহাসের নানা ধারা ভারতীয় সংবিধানকে পুষ্ট করিয়াছে। আমাদের সংবিধান প্রধানতঃ পাশ্চাত্ত্য সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শে রচিত। বিলাতে যেমন পার্লামেণ্টের প্রধান্য রহিয়াছে তেমনি আমাদের সংবিধানেও অনেকাংশে কেন্দ্রে ও রাজ্যসমূহে প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রধান্য লক্ষ্য করা যায়। ইহার ক্ষীণতম সূচনা হইয়াছিল 1861 সালে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইনের মধ্য দিয়া। ঐ সময়ে যে ধারাটির সূত্রপাত হয় তাহা অতি ধীরে ধীরে বর্ধিত হইতে থাকে। 1892, 1909, 1919 ও 1935 সালের আইনগুলির ভিতর দিয়া প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা অগ্রসর হইতে লাগিল এবং 1950 সালে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধানে এই ধারার পরিণতি ঘটিল। অধীন ভারত ও স্বাধীন ভারতের আকাশ-পাতাল তফাৎ; কিন্তু দুইএর শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বর্তমান রহিয়াছে অস্বীকার করা যায় না।

যে সকল উৎস হইতে ভারতীয় সংবিধানের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে ব্রিটেন-কৃত 1935 সালের আইন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই আইনটি বর্তমান ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা যে অঙ্গ-রাজ্য শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা অনেকাংশে 1935 সালে ভারতশাসন আইনের পুনরাবৃত্তি। এমনকি 1935-এর আইনের অনেকগুলি ধারা প্রায় অপরিবর্তিতভাবে ভারতীয় সংবিধানে স্থান পাইয়াছে।

যে সকল বিদেশী শাসনব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে ব্রিটেনের কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সার্বভৌমত্ব, প্রতিনিধিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র, দায়িত্বশীল সরকার (responsible government), ব্রিটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের

মূলনীতি, আইনের শাসন ও আইনের চক্ষে সকল মানুষের সাম্য, মৌলিক অধিকার ও তাহা রক্ষা করিবার আইনগত ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা প্রভৃতি নীতি সংবিধান পরিষদকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

সংবিধান পরিষদের নির্দেশক্রমে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুপণ্ডিত বি. এন. রাও পৃথিবীর বিভিন্ন সংবিধানের আইনসভা, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও বিচারবিভাগ সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এইরূপে সংগৃহীত তথ্যের দ্বারা ভারতীয় সংবিধানপ্রণেতৃগণ বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধানে তাহার চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। আমেরিকার সংবিধানের মুখবন্ধ; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার গঠন-প্রণালী; আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টের প্রকৃতি; আমেরিকার দ্বিকক্ষবিশিষ্ট ব্যবস্থা প্রভৃতি বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া ভারতীয় সংবিধান প্রণেতৃগণ দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার কিছুটা বর্জন ও কিছুটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র নহে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও ভারতীয় সংবিধানকে প্রভাবিত করিয়াছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্যানাডার সংবিধানও ভারতীয় সংবিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানের যেসকল বৈশিষ্ট্য বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যবিষয়ক নীতি (Directive Principles of State Policy) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নীতিটি আয়র্ল্যাণ্ডের সংবিধান হইতে গৃহীত হইয়াছে।

যে মৌলিক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধান গঠিত হইয়াছে, তাহা যে প্রধানতঃ ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহের অবকাশ নাই। বেন্থাম, জেম্স্ মিল, জন ষ্টুয়ার্ট মিল ও হারবার্ট স্পেনসারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ; গ্ল্যাড্ষ্টোন ও ব্রাইটের উদারনৈতিক মতবাদ (Liberalism) এবং ব্রিটেনের শ্রমিকদলের গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শ ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত মিশিয়া সংবিধান রচনার পটভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার বিপ্লব (1776), ফরাসীবিপ্লব (1789) ও রুশবিপ্লব (1917) ও এই সকল বিপ্লবের নীতিসমূহ অবিসংবাদীরূপে সংবিধান প্রণেতাগণের মনোভূমি উর্বর করিয়াছিল। জওহরলাল নেহরু যখন 1946 সালের তেরই ডিসেম্বর সংবিধান-পরিষদে উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন তিনি এই তিনটি বিপ্লবের মূল ভাবধারার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন।

আমেরিকার বিপ্লবের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সাম্য ও স্বাধীনতার নীতিসমূহ, ফরাসীবিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর বাণী ও রাশিয়ার বিপ্লবের সমাজবাদের আদর্শ ভারতের বাস্তব অবস্থানুযায়ী পরিবর্তিত আকারে সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। এই বৈপ্লবিক নীতিসমূহের প্রভাবরাশি আমাদের সংবিধানের মুখবন্ধে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

উনিশ শতকের প্রথমভাগেই অর্থাৎ রাজা রামমোহন রায়ের কাল হইতে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। 1851 সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও 1876 সালে ইণ্ডিয়ান এ্যাসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই আন্দোলন কতকটা শক্তিশালী হইয়া উঠে। 1885 সালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন সুসম্বদ্ধভাবে সর্ব-ভারতীয়রূপ ধারণ করিয়া নির্দিষ্টখাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। ভারতে ব্রিটেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির সমপ্রসারণ ও ক্ষমতাবৃদ্ধি, উপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন, উচ্চ-সরকারী পদে ভারতীয় কর্মচারী নিয়োগ এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসার প্রভৃতি লইয়া প্রথমযুগে কংগ্রেস আন্দোলন করিতে থাকে। এই যুগে কংগ্রেস প্রধানতঃ ইংরাজিশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থবাহী প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ কংগ্রেস সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছে বলা যায় না। 1888 সালে লবণ-করের বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং 1894 সালে দেখিতে পাওয়া যায় যে কংগ্রেস বন-বিভাগের প্রশাসন বিষয়ে রায়তের স্বার্থরক্ষা সমর্থন করিতেছে।

1905 সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টাকে নূতন পথে পরিচালিত করে এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পন্থা হিসাবে গৃহীত হয়। এই সময়ে সহিংস বিপ্লবী আন্দোলন বঙ্গদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে। 1906 সালে ব্রিটিশ সরকারের চক্রান্তে ভারতীয়গণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানটি কংগ্রেসকে প্রথম হইতেই বাধা দিতে থাকে। 1917 সালে গান্ধীজী যখন কংগ্রেসের কর্ণধার হইলেন, তখন হইতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত গান্ধীদর্শন ভারতের জনগণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়; কারণ এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি গান্ধীজীর নেতৃত্বে জনগণের প্রতিষ্ঠান-রূপে নূতন ভূমিকায় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থ কংগ্রেসের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় দেড়শত বর্ষব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্নকালে নানা নীতি ভারতীয় রাজনীতি-সচেতন মানুষের মন আন্দোলিত করিয়াছে। নানা খাতে রাজনৈতিক প্রচেষ্টা

প্রবাহিত হইয়াছে। এই বিরাট ঐতিহ্যকে ভারতীয় সংবিধানের পটভূমিকা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ গান্ধীজীর সমাজবাদ, অহিংস রাজনৈতিক আন্দোলনের পন্থা, বিকেন্দ্রীকৃত গণতন্ত্র, কৃষক-মজদুর সংখ্যালঘু, অনুন্নত শ্রেণী, আদিবাসী এবং নারী ও শিশুর কল্যাণ ভাবনা, গ্রামীন উন্নতিসাধন, সর্বোপরি জাতীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি গান্ধী প্রচারিত বাণী প্রত্যক্ষ-ভাবে ভারতীয় সংবিধানের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

মূলতঃ, ভারতীয় সংবিধানের উৎস দুইটি—একটি পাশ্চাত্ত্য, অন্যটি ভারতীয়। আমাদের সংস্কৃতি যেমন ভাবতীয় ও পাশ্চাত্ত্য কৃষ্টির সংমিশ্রণে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছে, অনেকাংশে সেইরূপ আমাদের সংবিধান পাশ্চাত্ত্য ও ভারতীয় ভাবধারায় পুষ্ট হইয়া একটি বিশিষ্ট-জীবন লাভ করিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

সংবিধান লিখিত বা অলিখিত যাহাই হউক না কেন উহা জাতির ইতিহাসের প্রতীক। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি জাতি কখনো বিবর্তনের মসৃণ পথে, কখনও বা বিপ্লবের রক্তাক্ত পথে ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-অবতরণের মধ্য দিয়া জাতি একটি বিশিষ্ট সত্তা লাভ করে। এই সত্তাই রূপ গ্রহণ করে স্বাধীন জাতির সংবিধানের ভিতর। ভারতীয় সংবিধান এই দেশের মানুষের ইতিহাসের পরিচয় বহন করে।

(1) **সংবিধানের জটিলতা:** ভারতীয় সংবিধানের যে বিশেষত্বটি সাধারণ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইটি হইতেছে সংবিধানের জটিলতা ও বিশালতা। 395 টি ধারা, অসংখ্য উপধারা ও নয়টি তপশীল লইয়া যে সংবিধান গঠিত, তাহা পৃথিবীর যে কোন সংবিধান অপেক্ষা বৃহত্তর। যে সকল কারণে ভারতীয় সংবিধান জটিল ও বিশাল তাহার কয়েকটির দিকে দৃষ্টিপাত করা সমীচীন।

(ক) ভারতে নানা জাতি (race), নানা ধর্ম, নানা ভাষাভাষী মানুষের বাস। আদিবাসী ও অনুন্নত তথাকথিত নিম্ন বর্ণের (caste) মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে বসবাস করিতেছে। ইহারা কোন কালেই সমাজে ন্যায় বিচার লাভ করিতে পারে নাই। স্বাধীন ভারতে যখন সংবিধান প্রণয়নের প্রশ্ন উঠিল তখন নানা বিচিত্র ও জটিল সমস্যা দেখা দিল। কিরূপে আদিবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকার রক্ষা করা যায়? ইঙ্গ-ভারতীয়গণ (Anglo-Indian) এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অবশিষ্ট ভারতবাসী হইতে বিভিন্ন। কি উপায়ে তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা যায়? তাই সঙ্গত কারণেই কতকগুলি বিশেষ ব্যবস্থা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই জন্য সংবিধানের জটিলতা ও কলেবর বৃদ্ধি পাইল।

(খ) ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কতকগুলি প্রদেশ উদ্ভূত হইয়াছে। ভাষা, আইন ও সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে মূলগত ভারতীয় একতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিটি প্রদেশের একটি বিশিষ্ট জীবনধারা (culture) রহিয়াছে। এই প্রদেশগুলিই স্বাধীন

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলও যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই কারণে সংবিধানে রাজ্যগুলির সহিত কেন্দ্রের প্রশাসনিক আইনগত ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সম্বন্ধেও ভিন্ন ব্যবস্থাদি করিতে হইয়াছে। ইহারই ফলস্বরূপ সংবিধান জটিল ও বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে।

(গ) **মৌলিক অধিকারের দাবি :** তৃতীয়তঃ, ভারত ইতিহাসের ব্রিটিশ যুগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জনগণ একমাত্র জাতীয় স্বাধীনতা নহে, কতকগুলি মৌলিক অধিকারের জন্যও সংগ্রাম করিয়াছে। সামাজিক ন্যায় বিচার, গ্রামীন উন্নতি, সকল শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষের অধিকার প্রভৃতি বিষয়ের উপরও স্বাধীনতা আন্দোলন কালে গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল। এই সকল বিষয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাদি তাই সংবিধানে স্থান পাইয়াছে। এই কারণেও সংবিধান বর্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে এবং জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে।

(2) **লিখিত-অলিখিত নীতি :** ভারতীয় সংবিধানের দ্বিতীয় বিশেষত্ব এই যে ইহা একটি লিখিত সংবিধান। কিন্তু লিখিত সংবিধান হইলেও আমাদের সংবিধান গত পঁচিশ বৎসরে প্রথাগত ভাবে কিছুটা বর্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। অর্থাৎ কিছু কিছু অলিখিত নীতি সংবিধানের অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি যে নিয়মতান্ত্রিক নৃপতির ন্যায় সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন—এই নিয়মটি আমাদের সংবিধানের অলিখিত অংশরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। তেমনি রাজ্যপালের কার্যাবলীও অলিখিত প্রথার উদ্ভবে প্রায় একই পথে বিবর্তিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণে ও প্রথার মাধ্যমে রাজ্যগুলির উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা সংবিধানে যাহা রহিয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(3) **সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয়তা ও সুপরিবর্তনীয়তা :** ভারতীয় সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় ; কারণ সাধারণ আইন প্রণয়নের যে নিয়ম, সেই নিয়মানুযায়ী সংবিধান সংশোধন করা চলে না। এই জন্য যে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা 368 ধারায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু অন্য দিকে দেখা যায় যে 249, 250 এবং 252 ধারা অনুসারে সংবিধানের বিধি সহজেই পরিবর্তন করা যাইতেছে। ইহার জন্য 368 ধারা অনুযায়ী বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ কতকগুলিক্ষেত্রে সংবিধান সুপরিবর্তনীয়।

(4) **রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশাবলী :** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে আয়ার্ল্যাণ্ডের (EIRE) সংবিধানের ন্যায় একটি অংশ যোজনা করা হইয়াছে, যাহাকে রাষ্ট্রের নির্দেশ বিষয়ক নীতি (Directive Principles of State Policy) বলা হইয়াছে। এই অংশে অনুন্নত সম্প্রদায়, আদিবাসী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, নারী, শিশু প্রভৃতির কল্যাণার্থে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, জীবনধারণোপযোগী মজুরীর অধিকার এবং সর্বাঙ্গীন গ্রামীন উন্নতির ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক (Social Security) সুযোগ সুবিধা দানের আবশ্যকতার কথা এই অংশে লিখিত হইয়াছে। যদিও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিষয়ক নীতি আইনগত ভাবে অবশ্য পালনীয় নহে, তথাপি কার্যক্ষেত্রে এই নীতিগুলি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং অসংখ্য আইন প্রণীত হইয়াছে, যাহার দ্বারা ঐ নীতিগুলি অনেক পরিমাণে কার্যে পরিণত হইয়াছে।

(5) **ব্রিটিশ যুগের শাসনতন্ত্রের প্রভাব :** কোন সংবিধানই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা অস্বীকার করিতে পারে না। ভারতীয় সংবিধানের উপর ব্রিটিশ যুগের শাসনতন্ত্রের প্রভাব সুদূর প্রসারী। ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থাও (Administrative System) ব্রিটেনের ভারতশাসনের ধাঁচে ঢালা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রে ততটা নহে, কিন্তু রাজ্য শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে 1935 সালের ভারত শাসন আইনের (Government of India Act, 1935) প্রভাব সর্বতোভাবে স্বীকার্য। এই বিষয়ে অনেক ক্ষেত্রে 1935 সালের আইনের বিভিন্ন ধারার রচনাপদ্ধতি পর্যন্ত আমাদের সংবিধানে গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে কেন্দ্রমুখীন, তাহাও যে ব্রিটিশ যুগের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত ইহাও স্বীকার না করিয়া উপায় নাই।

(6) **আইনের শাসন (Rule of Law) :** Rule of Law বা আইনের শাসন, অর্থাৎ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত খামখেয়ালী বা এক-নায়কত্ব ভিত্তিক স্বৈরচারী ব্যবস্থা নহে, আইনের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লওয়াই ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের মূলকথা। আইনের ও বিচারের ক্ষেত্রে সকল মানুষের মধ্যে সাম্য রক্ষাই প্রকৃত আইনের শাসন। এই সুষ্ঠু নীতিটি ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতৃগণ বিলাতের সাংবিধানিক ব্যবস্থা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। মৌলিক অধিকার শীর্ষক অংশে এবং অন্যান্য নানা ধারার মাধ্যমে এই নীতিটিকে ভারতীয় সংবিধানে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

(7) **জনগণের সার্বভৌমত্ব :** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে জনগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের নীতি (Political Sovereignty) স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং ভারত রাষ্ট্র একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় জনগণেরই দান। ইহার দ্বারা সংবিধান পরোক্ষভাবে রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রকে অস্বীকার করিয়াছে। এই নীতি ভারতীয় গণতন্ত্রর অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ।

(8) **মৌলিক অধিকার :** আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতীয় সংবিধানেও জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু. লক্ষণীয় যে এই অধিকারসমূহ সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ নহে। শুধু যুদ্ধের ন্যায় জরুরী অবস্থায় নহে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও সমাজ-বিরোধীদের কার্যকলাপ নিবারণকল্পে ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপের প্রাদুর্ভাব দেশে কম নহে। তাই ঐ বিশেষ ক্ষমতা উভয় সরকারকেই মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতে হয়।

(9) **ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা :** ভারতীয় সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষ-তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনকাল হইতে ভারতীয় রাষ্ট্রে সকল ধর্মাবলম্বীর স্ব স্ব ধর্মাচরণের অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্তমান ভারতে কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নাই। সমস্ত ধর্ম সম্বন্ধেই রাষ্ট্র নিরপেক্ষ, তাই ভারত বর্তমান জগতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্ররূপে পরিচয় লাভ করিয়াছে।

(10) **শান্তিবাদ :** শান্তিবাদ ভারতের একটি চিরন্তন আদর্শ। ভারতে উদ্ভূত কয়েকটি প্রাচীন ধর্মে শান্তি, অহিংসা ও বিশ্বমানবতার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন বিশ্বমানবতা ও শান্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। 1917 হইতে 1947 সাল পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে আন্দোলন ভারতবাসীকে প্রভাবিত করিয়াছিল অহিংসা, বিশ্বশান্তি ও সর্বমানবের মৈত্রী ছিল তাহার মূলমন্ত্র। 1945 সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হইল। তাহারও মূল ভিত্তি ছিল বিশ্বশান্তি। শান্তি, আন্তর্জাতিকতা ও আপস-মীমাংসার মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে বিরোধ মীমাংসার নীতি ভারতের সংবিধানের 51 ধারায় সুস্পষ্টভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাও ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(11) **দায়িত্বশীল সরকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র :** ভারতীয় সংবিধানে ইউনিয়নে ও রাজ্যসমূহে দায়িত্বশীল সরকার (responsible government) গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই নীতি অনুযায়ী ইউনিয়ন বা কেন্দ্রে

রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী শাসনকার্য চালাইয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিকভাবে ইউনিয়ন সরকারের শীর্ষস্থানীয়, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বিগত পঁচিশ বৎসরে কেন্দ্রে প্রথাগতভাবে এই নীতি পাকা হইয়া গিয়াছে যে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক (constitutional ruler)।

রাজ্য সরকার সম্বন্ধেও এই নীতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। তবে এই বিষয়ে সামপ্রতিককালে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। অনেকের মতে কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন কয়েকটি ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং এই ক্ষমতা রাজ্যপালগণ দুই একটি ক্ষেত্রে ব্যবহারও করিয়াছেন। বিশেষ অবস্থায় রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান করিবার ব্যাপারে রাজ্যপাল তাঁহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারেন। প্রথমতঃ, যদি রাজ্যপাল বুঝিতে পারেন যে মুখ্যমন্ত্রী ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল বা বিভিন্ন গোষ্ঠী বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং সেইজন্য সভার অধিবেশন আহ্বান করার বিরোধিতা করিতেছেন তখন রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া বিধান সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে (ক) ক্ষমতায় আসীন মুখ্যমন্ত্রী ও তাহার দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন এবং (খ) সভায় দলীয় পরিস্থিতি এমন দাঁড়াইয়াছে যে বিরোধীদল বা দলসমূহ স্থায়ী সরকার গঠনে সক্ষম এবং (গ) ক্ষমতায় আসীন মুখ্যমন্ত্রী যদি বিরোধীদল বা দলসমূহের ক্ষমতালাভের প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পরামর্শ দেন তাহা হইলে রাজ্যপাল উহা করিতে অস্বীকার করিতে পারেন এবং ক্ষমতায় আসীন মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করিবার পর, পুরাতন মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদচ্যুত করিয়া বিরোধীদলের নেতাকে নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিতে আহ্বান জানাইতে পারেন। যেখানে স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠনের সুযোগ আছে সেখানে রাজ্যপালকে তাহারই প্রচেষ্টা চালাইতে হইবে। কারণ সাধারণ নির্বাচন একটি ব্যয়বহুল ব্যবস্থা এবং সাধারণ নির্বাচনের জন্য সরকারের সমস্ত কাজকর্ম একরকম বন্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় রাজ্যের খরচান্ত করিয়া এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া নূতন নির্বাচন করা অসমীচীন, যখন দেখা যায় বিকল্প স্থায়ী সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। সুতরাং রাজ্যপালের এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার সমর্থনে যুক্তি আছে। কিন্তু উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে যে সকল স্বাধীন ক্ষমতা রাজ্যপাল ব্যবহার করিবার অধিকারী সেই বিষয়গুলি অসাধারণ

পরিস্থিতিতেই উদ্ভূত হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রথানুযায়ী রাজ্যপাল রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত কোন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন না।

(12) **নাগরিকত্বের বৈশিষ্ট্য :** ভারতীয় সংবিধানে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dual Government) মানিয়া লওয়া হয় নাই, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যেমন হইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয় সংবিধানে দ্বি-নাগরিকতাও স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক প্রথমতঃ 50টি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের যে কোন একটির নাগরিক এবং রাজ্য নাগরিকতার বলে তিনি যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। ইহাকেই দ্বি-নাগরিকতা বলা হয়। ঐতিহাসিক কারণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকত্বের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বাধীনতা ঘোষণার (1776) পর যে 13টি রাষ্ট্র আমেরিকায় কনফেডারেশন স্থাপন করে তাহার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রেরই স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা ছিল। তাই সেই সকল রাষ্ট্রের পৃথক পৃথক নাগরিকতা আইন ছিল। যখন ঐ সকল রাষ্ট্র ফেডারেশন স্থাপন করিয়া যুক্ত হয় তখন প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকতা স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। ভারতে রাজ্যগুলি ভারত সরকারের অধীন প্রদেশ ছিল মাত্র। তাই ভারতের ক্ষেত্রে দ্বি-নাগরিকতার প্রশ্ন উঠিতেই পারে না।

(13) **আইন প্রণয়নের জরুরী ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে ভারতীয় সংবিধানের যথাক্রমে 123 এবং 213 ধারার বলে জরুরী আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ ক্ষমতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট বা অস্ট্রেলিয়ায় নাই। এমন কি ক্যানাডাতেও এই ক্ষমতা গভর্ণর জেনারেলকে দেওয়া হয় নাই। এইক্ষেত্রেও সংবিধান পরিষদ 1935 সালের ভারতশাসন আইন অনুসরণ করিয়াছে। নূতন রাষ্টের বিশেষ পরিস্থিতির সহিত মোকাবিলা করার জন্যই এই বিশেষ ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে দেওয়া হইয়াছিল।

(14) **ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ : কেন্দ্রমুখীনতা :** ভারতীয় সংবিধানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহার দ্বারা এক অভিনব যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের যে সকল লক্ষণ থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, অঙ্গরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়—এই লক্ষণগুলি মোটামুটিভাবে ভারতে বিদ্যমান। কিন্তু ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা শুধু আপৎকালে (Emergency) নহে, সাধারণ অবস্থাতেও কেন্দ্রের অর্থাৎ ইউনিয়নের প্রাধান্য বজায় থাকে

অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও এককেন্দ্রিক ব্যবস্থার মিলন ঘটিয়াছে। দুই-এর সংমিশ্রণে নূতন ধরনের যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিয়াছে। সমগ্র রাষ্ট্রটি কেন্দ্রমুখীনতা লাভ করিয়াছে বটে কিন্তু এককেন্দ্রিকতা লাভ করে নাই। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে কেতাবী যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষত্বগুলির মত নহে কিন্তু ভারতের বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপযোগী।

লক্ষণীয় যে সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পর্যায়ে যে পরিকল্পনা লইয়া সংবিধান পরিষদ অগ্রসর হইয়াছিল তাহাতে কেন্দ্রপ্রবণতার আভাস ছিল না বরং তাহার বিপরীত পরিকল্পনাই পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছিল। 1946 সালের তেরই ডিসেম্বর জওহরলাল নেহরু যখন ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন তিনি রাজ্যগুলিকে বেশ শক্তিশালী অঙ্গরাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের 3 নং অনুচ্ছেদে অঙ্গরাজ্যসমূহকে যুক্তরাষ্ট্রে যে স্থান দেওয়ার কথা ছিল তাহা এইরূপ: '····the status of autonomns units together with residuary powers, and ······all powers and functions of government and administration save and except such powers and functions as are vested in or assigned to the Union, or as are inherent or implied in the Union resulting therefrom.'[1] অর্থাৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি স্বয়ং শাসিত সংস্থারূপে বিরাজ করিবে এবং কতকগুলি সীমিত অপরিহার্য সর্বভারতীয় বিষয় সমূহ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত ক্ষমতা এবং অবশিষ্ট (residuary) ক্ষমতা থাকিবে অঙ্গরাজ্যেরই হাতে। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রকেই অধিক শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। যুদ্ধপ্রবণ পৃথিবীতে নূতন ভারত-রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় সমস্যার মোকাবিলা, আদিবাসী, অনুন্নত শ্রেণী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সামাজিক কর্তব্য, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে দেশের আর্থিক উন্নতি বিধান, অনগ্রসর রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নতি সাধন, সর্বভারতীয় একতা রক্ষার আবশ্যকতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধানকল্পে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকেই অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিয়া যুক্ত-রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে কেন্দ্রমুখীন করিয়া তোলা হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায় যে আইনপ্রণয়ন, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

1 Constituent Assembly Debates.—Official Report—Friday, 13th December, 1946, Vol. I, P. 57.

কিন্তু এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা-ভিত্তিক সংবিধান প্রণয়ন যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। কারণ ভারতে প্রাচীন কাল হইতে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা যায়। আবার এই বিচ্ছিন্নতার মনোভাবের সঙ্গে মৌলিক একতার শক্তিও বিদ্যমান। বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সমন্বয় বিধান ভারতের চিরন্তন সাধনা। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় এই দুইটি বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকৃত 1833 সালের চার্টার আইনধারা যে কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার অল্পবিস্তর প্রভাব 1935 সালের ভারত শাসন আইনেও লক্ষ্য করা যায়। একশত বৎসরের ঊর্ধকাল যে কেন্দ্র-প্রবণতা শাসনতন্ত্রে কার্যকর ছিল তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা সংবিধান পরিষদের পক্ষে অবাস্তব ছিল; কারণ, কোন জাতির পক্ষেই ইতিহাস ও বাস্তব পরিস্থিতিকে অস্বীকার করা সম্ভব নহে।

অধ্যাপক হুইয়ার ভারতীয় সংবিধানকে "Quasi-federal" অর্থাৎ আধা যুক্তরাষ্ট্ররূপে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি আমাদের যুক্তরাষ্ট্রকে "Unitary State with subsidiary federal features rather than a federal state with subsidiary unitary features."[1] অর্থাৎ তিনি বলিতেছেন যে, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূলতঃ এককেন্দ্রিক, তবে তাহার সহিত কতকগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যুক্ত হইয়াছে। অধ্যাপক হুইয়ার সংবিধানিক ব্যবস্থাকে "devolutionary in character" অর্থাৎ শাসন-ব্যবস্থা কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্যের নিকট হস্তান্তরিত ক্ষমতা-ভিত্তিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অন্যপক্ষে সংবিধান পরিষদের সদস্য কে. শান্তনম্ বলিয়াছেন যে ভারতীয় সংবিধানে এমন ব্যাপক ভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি বিধৃত রহিয়াছে যে ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা সত্যই যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।[2] ডঃ আম্বেদকরও সংবিধান পরিষদে বলেন যে ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি মানিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সংবিধান অনুসারে বিভক্ত হইয়াছে। এই সূত্রে তিনি বলেন; "The States are in no way dependent upon the Centre for their legislative and executive authority. The States and the Centre are co-equal in this matter." অর্থাৎ রাজ্য সমূহ আইন

1 Wheare, N. C.: Federal Government. Third Edition, p. 28.
2 K. Santhanam; Union State Relations in India, p. 8,

প্রণয়ন ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল নহে। দুই-এর মধ্যে উচ্চ ও নীচ বিভেদ নাই।[1]

সংবিধানের মধ্যে যে সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকায় ভারতীয় সংবিধানকে এককেন্দ্রিক বলা হইয়া থাকে, এই স্থলে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

(ক) দেখা যায় যে রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থিত রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এই বিষয়ে ভারত ক্যানাডার সংবিধান অনুসরণ করিয়াছে। অন্য কোন যুক্তরাষ্ট্রে এইরূপ নিয়োগের ব্যবস্থা নাই। বস্তুতঃ রাজ্যপাল কেন্দ্রেরই প্রতিনিধি বা এজেণ্ট। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের পদচ্যুতি ঘটাইতেও পারেন। এইরূপ ব্যবস্থাদ্বারা রাজ্যের উপর ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ হইয়াছে।

(খ) রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পাঠাইতে পারেন। এই স্থলেও ক্যানাডার সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসরণ করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ঐ আইনে সম্মতি না'ও দিতে পারেন। এই ব্যবস্থাদ্বারা কেন্দ্র অঙ্গরাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ পায়।

(গ) রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নিকট এই মর্মে রিপোর্ট পাঠাইতে পারেন যে রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এইরূপ রিপোর্ট পাইলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ এইক্ষেত্রে রাজ্য-মন্ত্রীমণ্ডলী বা রাজ্যবিধানমণ্ডলীর কোন হাত নাই। রাজ্যপাল এই বিষয়ে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া ইচ্ছা করিলে অঙ্গরাজ্যের আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের রিপোর্ট না পাইলেও যদি মনে করেন যে কোন অঙ্গরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে তিনি আপন ক্ষমতা বলেই অঙ্গরাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা 356 ধারা অনুসারে আপন হাতে তুলিয়া লইতে পারেন। এইরূপ হইলে ঐ রাজ্যে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

(ঘ) যুদ্ধ কালে বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইলে বা ঐরূপ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং তাহার প্রতিকারকল্পে রাষ্ট্রপতি 352 ধারা অনুযায়ী ঘোষণা করিলে সমস্ত অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুসারে তাঁহারই হস্তে কেন্দ্রীভূত হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাময়িক অবসান ঘটে।

---

1 **Constituent Assembly Debates ; VII, p. 33.**

(ঙ) ক্ষমতা বণ্টনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে 97টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন্দ্রের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, মাত্র 66টি বিষয় রাজ্যের অধিকারে রাখা হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার বিষয়ের সংখ্যা হইতেছে 47। শাসন-বিষয় সংক্রান্ত তিনটি তালিকা 1935 সালের ভারত শাসন আইনে স্থান পাইয়াছিল। সংবিধান পরিষদ ঐরূপ ত্রিধারায় বিভক্ত ব্যবস্থাই মানিয়া লইয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যুগ্ম তালিকার কোন বিষয়ে যদি কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্য, দুই-ই আইন প্রণয়ন করে এবং ঐ আইন দুটি যদি পরস্পর বিরোধী হয় তাহা হইলে কেন্দ্রীয় আইন-ই বলবৎ হইয়া থাকে। এখানেও কেন্দ্রের প্রাধান্য সুস্পষ্ট।

(চ) যে সকল বিষয়ে একমাত্র রাজ্যের আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা আছে সেই সব বিষয়েও যদি রাজ্যসভার উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত লওয়া হয় যে, কোন রাজ্য বিষয় (State subject) সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টই আইন প্রণয়ন করিবে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টই ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে, রাজ্যসমূহ নহে।

(ছ) এই সূত্রে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অবশিষ্ট ক্ষমতা (residuary powers) ক্যানাডার সংবিধান অনুসরণে ইউনিয়ন সরকারের হস্তেই ন্যস্ত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়ায় এই ক্ষমতাটি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যসমূহকেই দেওয়া হইয়াছে।

(জ) প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সংবিধান অনুসারে রাজ্যসমূহের উপর কেন্দ্রের ক্ষমতা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। প্রথমতঃ রাজ্যসমূহকে কেন্দ্রীয় আইনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে এই বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে। পার্লামেণ্টও আইন করিয়া রাজ্যের উপর কোন বিষয়ের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারে। কোন সরকার কেন্দ্রের নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা আপন হাতে তুলিয়া লইতেও পারেন। এইরূপ ব্যাপক ক্ষমতা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বা অষ্ট্রেলিয়ায় কেন্দ্রকে দেওয়া হয় নাই।

(ঝ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজ্যসমূহ কেন্দ্রের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। বিক্রয়কর ব্যতীত প্রায় সমস্ত সমপ্রসারণশীল আয়ের উৎস কেন্দ্রের আয়ত্তে। আয়করের অংশ অবশ্য রাজ্যগুলি পাইয়া থাকে। কিন্তু কতটা পাইবে তাহা ভারত সরকারের উপর নির্ভর করে। অর্থের উৎসগুলি কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে এমনভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত যাহাতে

কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই আপনাপন ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারে। ভারতে এই নীতি রক্ষিত হয় নাই। তাই রাজ্যসমূহের আর্থিক স্বাতন্ত্র্য নাই। ইহার ফলে কেন্দ্রের অনুদান ও ভারত সরকার কর্তৃক নির্ধারিত করের অংশের জন্য রাজ্যসমূহকে ইউনিয়ন সরকারের দ্বারস্থ হইতে হয়। ভারতীয় সংবিধানের সমালোচকগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে এইরূপ অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিপন্থী।

(ঞ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি বুঝিতে হইলে যোজনা কমিশনের রূপরেখার আলোচনা অপরিহার্য। যোজনা কমিশন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রমুখীনতার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কমিশন সম্পূর্ণভাবে একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ইহার সভাপতি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় যোজনামন্ত্রী ইহার সহ-সভাপতি। যোজনা কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ভারত সরকারেরই কর্মচারী। সুতরাং গঠনের দিক দিয়া রাজ্যগুলির সহিত কমিশনের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। অথচ প্রতিটি রাজ্যের আর্থিক ভবিষ্যৎ অনেকাংশে এই কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটির উপর নির্ভরশীল।

(ট) সমালোচকেরা আরও বলিয়াছেন যে কেন্দ্রের প্রাধান্য এতই প্রকট যে, কেন্দ্র রাজ্যসমূহের মতের বিরুদ্ধেও সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নূতন রাজ্য গঠন এবং যে কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে। তবে সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে ঐ বিষয়ে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়ন করিতে হইবে এবং তাহা করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যসমূহের মত গ্রহণ করিবেন। (কিন্তু যে মত রাজ্য বা রাজ্যসমূহ দিবে তদনুসারে কাজ করিবার বাধ্যবাধকতা কেন্দ্রের নাই।) (অর্থাৎ রাজ্যসমূহের মতের বিরুদ্ধে কেন্দ্র ভারত রাষ্ট্রের কাঠামো ও সীমানা পরিবর্তিত করিতে পারে। এমনকি ভারতরাষ্ট্রের অংগীভূত কোন অঞ্চল বিদেশী সরকারের নিকট হস্তান্তর করিতেও পারে।)

(ঠ) কেন্দ্রমুখীনতার প্রমাণস্বরূপ আরও বলা হইয়াছে যে ভারতে একটিমাত্র নির্বাচন কমিশন আছে। ব্যয়-নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব-পরীক্ষকও কেন্দ্র ও রাজ্যের জন্য একজন মাত্র। নির্বাচন কমিশন এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক রাষ্ট্রপতিই নিযুক্ত করেন। ইহাও ভারত রাষ্ট্রকে কেন্দ্রমুখীন করিয়া তুলিয়াছে।

এই সকল দিক হইতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিচার করিলে মনে হয় যে ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণরূপে যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে। সত্যই যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও অষ্ট্রেলিয়াকে আদর্শ যুক্তরাষ্ট্র মনে করিয়া ঐ দুটি রাষ্ট্রের সহিত ভারত রাষ্ট্রের তুলনা করা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হইতে অনেক বিচ্যুতি রহিয়াছে। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কোন বাঁধা রাস্তা নাই। যুক্তরাষ্ট্র কি রূপ গ্রহণ করিবে তাহা সংশ্লিষ্ট রাজ্যসমূহের ও সমগ্র সম্মিলিত যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতেও একটি ঐতিহাসিক-ধারাবাহিকতা রহিয়াছে। তাহারই তাগিদে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

আরও একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আধুনিক জগতের বাস্তব অবস্থার চাপে অনেক পরিমাণে কেন্দ্রমুখীন হইয়া উঠিয়াছে। পারমাণবিক যুগের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কেন্দ্র কর্তৃক জাতীয় জীবনের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণের আবশ্যকতা ও দুর্যোগপূর্ণ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি কেন্দ্রকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে এবং সেই অনুপাতে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। সামগ্রিক ও সর্বগ্রাসী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলিতে সমাজকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি মিটাইবার তাগিদ প্রভৃতি কারণে অঙ্গ রাজ্যগুলির কেন্দ্রের উপর আর্থিক নির্ভরতা ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গ রাজ্যগুলির পূর্ব স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়ভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রেও একই কারণে এই কেন্দ্রাভিমুখী ক্ষমতা প্রবাহের প্রবণতা দেখা দিয়াছে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে এই কেন্দ্রমুখীনতার স্বপক্ষে ডঃ আম্বেদকর যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ যোগ্য। তিনি বলেন: "However much you may deny powers to the centre, it is difficult to prevent the centre from becoming strong. Conditions in the modern world are such that centralisation of power is inevitable. One has only to consider the growth of the federal government in the U. S. A. which, notwithstanding the very limited powers given to it by the Constitution has outgrown its former self and has overshadowed and eclipsed the State governments. This is due to modern conditions. The same conditions are bound to operate on the Government of India and nothing that one can do will help to prevent it from being strong. On the other hand we must resist the tendency to make it stronger. It cannot chew more than it can digest. Its strength must be commensurate with its weight. It would be a folly

to make it so strong that it may fall by its own weight."[1] অর্থাৎ কেন্দ্রের নিকট ক্ষমতা কেন্দ্রীভত হওয়ার প্রবণতা কিছুতেই নিবারণ করা যাইবে না। কারণ বর্তমান জগতের পরিস্থিতি এই প্রবণতাকে শক্তিশালী করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ঐ দেশের সংবিধান অনুযারী কেন্দ্রের ক্ষমতা খুবই সীমিত ছিল, কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর রাষ্টনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাগিদ ঐ ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া কেন্দ্রের হস্তে প্রভূত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। তাহার ফলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলি চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ভারতেও তাহাই হইবে। তবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে কেন্দ্র অতিমাত্রায় শক্তিশালী না হয়। তাহা হইলে কেন্দ্র আপন ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সংবিধানের অন্যতম প্রধান প্রণেতা আম্বেদকর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে। কেন্দ্রে নানা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তিও উঠিয়াছে। এই সম্বন্ধে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

1 **Constituent Assembly Debates : VII, p. 42.**

অষ্টম অধ্যায়

সংবিধানের মুখবন্ধ

1787 সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান রচিত হয়। এই সংবিধানই পৃথিবীর সর্ব প্রথম লিখিত পূর্ণাঙ্গ সংবিধান। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথমে একটি মুখবন্ধ সংযোজিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে পরবর্তীকালের যে সকল সংবিধান মুখবন্ধ দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে তাহার মধ্যে 1919 সালের জার্মানীর সংবিধান বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মুখবন্ধে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতৃগণ নূতন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং কয়েকটি মূলনীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার, স্বাধীনতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি, দেশরক্ষা ও জনগণের মঙ্গল এই কয়েকটি আদর্শ উহাতে স্থান পাইয়াছিল। প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধে সংবিধানের মূলনীতি ও উদ্দেশ্যগুলি যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। জার্মানীর 1919 সালের সংবিধানেও স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সামাজিক প্রগতির উল্লেখ আছে। রাশিয়ার বর্তমান সংবিধানে মুখবন্ধ নাই কিন্তু সংবিধানের 'সামাজিক কাঠামো' নামক প্রথম অধ্যায়ে রাশিয়ার সংবিধানের মূল ভিত্তি বিধৃত রহিয়াছে।

ভারতের সংবিধানে মুখবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে এবং তাহাতে দেশের শাসন ও সামাজিক ব্যবস্থার মূলনীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এই মুখবন্ধটি আধুনিককালের অন্যান্য সংবিধান সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনাগুলির মধ্যে রচনাশৈলী ও আদর্শবাদিতার দিক হইতে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। এই জন্যই অধ্যাপক আর্নেষ্ট বার্কার ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধটিকে তাহার একখানি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের (Principles of Political and Social Theory) মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

মুখবন্ধটি এইরূপ

"আমরা ভারতীয় জনগণ ভারতে একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন করিবার পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করিয়া ও সকল নাগরিকের জন্য— সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার ; চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা ; সকলের জন্য সামাজিক সাম্য ও সমান সুযোগ ; এবং সমগ্র ভারতীয় জনগণের মধ্যে ব্যক্তি মর্যাদা

ও জাতীয় একতার নিশ্চয়তা সাধন করিয়া ভ্রাতৃত্ববোধের প্রসারকল্পে আজ 1949 সালের ছাব্বিশে নভেম্বর তারিখে সংবিধান পরিষদে এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় জনগণকে তাহা অর্পণ করিতেছি।"

মুখবন্ধের বিশ্লেষণ

(1) ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধটি বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি মূলনীতি আমাদের স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। প্রথম নীতি জনগণের সার্বভৌমত্ব। মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে জনগণই এই সংবিধানের প্রণেতা এবং জনগণই নিজ ইচ্ছানুযায়ী একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়াছে। মুখবন্ধের এই নীতিটির উপর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রভাব লক্ষিত হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে : "We, the people of the United States...do ordain and establish this constitution for the United States of America" অর্থাৎ "আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এই সংবিধান সংগঠন ও স্থাপন করিতেছি। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মার্শাল, ম্যাক্‌কুলক বনাম মেরীল্যাণ্ড (1819) নামক মোকদ্দমায় রায় দেন যে আমেরিকার শাসন-ব্যবস্থা জনগণেরই দান; জনগণই সংবিধানের উৎস। শাসন-ব্যবস্থায় যে সকল ক্ষমতার উল্লেখ আছে তাহা সকলই জনগণ প্রদান করিয়াছে এবং সর্বপ্রকার শাসন ক্ষমতা জনগণের সকলের জন্যই ব্যবহার করিতে হইবে। অনুরূপ ভাবে অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ন্যায় ভারতীয় সংবিধানও জনগণেরই দান।

এই বিষয়ে মতভেদের কারণ রহিয়াছে। আমেরিকার সংবিধান সম্বন্ধে চার্লস বেয়ার্ড তাঁহার 'Economic Interpretation of the Constitution' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে ঐ সংবিধান আমেরিকার প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের ছয় ভাগের এক ভাগের বেশি ব্যক্তি দ্বারা গৃহীত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে, তৎকালে নারীদের ভোটাধিকারও অভাবনীয় ছিল। তাহা ছাড়া সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরাই ভোট দিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সংবিধান জনগণের নিকট গ্রহণ বা বর্জনের জন্য প্রেরণ করাও হয় নাই। এমন অবস্থায় "জনগণই সংবিধান প্রবর্তন ও গ্রহণ করিতেছে" এইরূপ উক্তি যক্তিযুক্ত নহে। ভারতীয় সংবিধান সম্বন্ধেও অনেকটা এই প্রকারের যুক্তি উত্থাপন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ বলা হইয়াছে যে সংবিধান পরিষদ গণভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় নাই। পরিষদের পশ্চাতে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের শতকরা আনুমানিক মাত্র এগার জনের পরোক্ষ সমর্থন ছিল।

ইহাও প্রত্যক্ষ সমর্থন নহে। কারণ শতকরা এগার জন ভোটাধিকারী যে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলি গঠন করিয়াছিলেন সেইগুলিই ভোটদ্বারা সংবিধান পরিষদীয় সদস্যগণকে নির্বাচিত করেন। গণভোটদ্বারা তাঁহারা নির্বাচিত হন নাই। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান প্রস্তুত হইবার পর তাহা গণভোটেও দেওয়া হয় নাই, যেমন আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং জনগণই সংবিধানের উৎস এরূপ মন্তব্য অতিশয়োক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। তৃতীয়তঃ আরও বলা হইয়াছে যে আইনের দিক হইতে সংবিধান পরিষদের ভিত্তি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রণীত ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947)। স্বাধীনতার মূলে যে এই মৌলিক আইনটি রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বাধীন ভারতের সংবিধানের মূলসূত্র অনুসন্ধান করিতে হইলে 1947 সালের স্বাধীনতা আইনেই পেঁছাইতে হয়, জনগণ সম্বন্ধীয় দাবি অবান্তর।

উপরোক্ত যুক্তি সমূহের উত্তরে বলা হয় যে যুদ্ধোত্তর কালের একটি আভ্যন্তরীণ সংঘাতসঙ্কুল রাজনৈতিক পরিবেশে সংবিধান প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। তখন গণভোটদ্বারা সংবিধান পরিষদ গঠন করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাহা করিতে হইলে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইত। দেশের অশান্ত অবস্থার দরুণ তখন কালবিলম্ব করা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর হইত। সুতরাং প্রাদেশিক বিধানসভা দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিবর্গকেই গণপরিষদে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, বলা হইয়া থাকে যে যদি সংবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা হইত তাহা হইলে পরিষদের গঠন খুব যে পরিবর্তন হইত তাহা নহে। কারণ যাঁহারা নির্বাচিত হইয়া তৎকালে গণপরিষদে আসিয়াছিলেন তাহারা প্রায় সকলেই সম্মানিত নেতা এবং তাহাদের পশ্চাতে যে বিপুল জনসমর্থন ছিল না এমন নহে। তৃতীয়তঃ, সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর সার্বজনীন ভোটের মাধ্যমে অনেকবার সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে এবং জনগণ এই সকল নির্বাচনে স্বেচ্ছায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ঐ সকল নির্বাচনে জনগণ সংবিধান পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও তাহাদের দ্বারা সমর্থিত ব্যক্তিবর্গকে জয়ী করিয়াছে; অর্থাৎ জনগণ তাহাদের কার্যের মধ্যদিয়া সংবিধানকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সুতরাং জনগণই যে সংবিধানের উৎস এইরূপ নীতি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

(2) ভারতকে সংবিধানের মুখবন্ধে সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্ররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সার্বভৌমত্বের অর্থ এই যে ভারত একটি পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র; দ্বিতীয়তঃ, এই স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন-

ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক অর্থাৎ ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হইবে। গণতন্ত্র কথাটির ব্যবহার দ্বারা জনগণের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা সূচিত হইয়াছে এবং ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে ভারত সর্বপ্রকার একনায়কত্বকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিতেছে। তৃতীয়তঃ, সাধারণতন্ত্র কথাটি রাজতন্ত্রের বিরোধিতা সূচিত করিতেছে। ব্রিটেনে উত্তরাধিকার মূলক (hereditary) রাজতন্ত্র বিদ্যমান, তবুও ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক। কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হইয়া থাকেন। সেইজন্যই ভারতীয় রাষ্ট্র কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক নহে, পরন্তু সাধারণতান্ত্রিক বা প্রজাতান্ত্রিক। এইস্থলেই গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্রে বা প্রজাতন্ত্রে বিরাট তফাৎ দেখা যাইতেছে।

(3) ভারতীয় সংবিধান রচয়িতাগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে গণতন্ত্র সত্যকার জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হইতে হইলে কতকগুলি অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে হইবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য এবং রাজনৈতিক অধিকারের বৈষম্য বিদ্যমান থাকিলে গণতন্ত্র মিথ্যায় পর্যবসিত হয়। তাই সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারকে সংবিধান-পরিষদ ভারতরাষ্ট্রের ভিত্তিস্বরূপ মনে করিয়া সংবিধানের মুখবন্ধে তাহার উপযুক্ত স্থান রচনা করিয়াছেন। এইস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে সংবিধান পরিষদ ইংল্যাণ্ডের সতেরো শতকের বিপ্লব (1688), আমেরিকার বিপ্লব (1776) ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (1917) প্রগতিশীল নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ জওহরলাল নেহেরু 1946 সালের তেরই ডিসেম্বর যখন সংবিধান-পরিষদে উদ্দেশ্য বিষয়ক প্রস্তাব (Objectives Resolution) উত্থাপন করেন, তখন তিনি ঐ তিনটি বিপ্লবের নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

(4) ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাণী মুখবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বিধৃত হইয়াছে। চিন্তা, মতামত প্রকাশ, বিশ্বাস ও ধর্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ইহাতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এই সকল স্বাধীনতা বর্তমান না থাকিলে গণতন্ত্র বিড়ম্বনায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য যে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গোড়া হইতেই এই সকল স্বাধীনতা দাবি করা হইয়াছে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন।

(5) সামাজিক সাম্য এবং সুযোগের ক্ষেত্রে সাম্য প্রকৃত গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য অংশ। চতুর্থ অনুচ্ছেদে এই দুইটি নীতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই দুইটি নীতিও গণতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গণতন্ত্রে সকলেই সমান ও আপন অন্তর্নিহিত শক্তিকে পূর্ণভাবে বিকশিত

করার সুযোগ পাইবার অধিকারী ; তাহা ব্যতীত গণতন্ত্র অভিজাততন্ত্রে (Oligarchy) পরিণত হয়। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতে জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নানা কু-প্রথা জাতির জীবনকে কণ্টকিত করিয়াছে। নূতন সংবিধানে ইহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়াছে এবং এমন আদর্শ জনগণের সম্মুখে রাখা হইয়াছে, যাহা দ্বারা দেশে ভবিষ্যতে প্রকৃত সাম্য গড়িয়া উঠে।

(6) সর্বশেষে যে আদর্শটির উল্লেখ আছে তাহা ফরাসী বিপ্লবের (1789) সময়ে গণসভা কর্তৃক গৃহীত ঘোষণাপত্রের অন্যতম নীতি। সাম্য (Equality), স্বাধীনতা (Liberty) ও মৈত্রী (Fraternity) দেশে দেশে মুক্তিকামী জনগণকে যুগের পর যুগ প্রেরণা দান করিয়াছে। ভারতে ভ্রাতৃত্বের প্রয়োজন অত্যধিক। এখানে নানা বিভেদপন্থী শক্তি সক্রিয়। সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, গোষ্ঠী এবং উপাসনা-পদ্ধতিমূলক বিভেদ, স্থানীয় ও আঞ্চলিক সংকীর্ণ স্বার্থ, ভাষা ও সংস্কৃতির অন্ধ অহঙ্কার জাতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সংবিধান রচয়িতাগণ জাতীয় একতা-স্থাপন মানসে ভ্রাতৃত্বকে একটি প্রধান স্থান দিয়াছেন।

মুখবন্ধের মূল্য

যে সকল আদর্শ মুখবন্ধে বিধৃত হইয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রূপায়িত করা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ভারতের জনগণ যদি একজাতি একপ্রাণ, একতার আদর্শ লইয়া প্রকৃত সাম্যের সন্ধান করে তাহা হইলে এই আদর্শগুলি বহুল পরিমাণে লাভ করিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায়। পণ্ডিত ঠাকুর দাস ভার্গব ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যই স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, 'The Preamble is the most precious part of the constitution. It is the soul of the constitution. It is a key to the constitution.....It is a jewel set in the constitution. It is a superb prose poem, nay, it is perfection itself.'[1] অর্থাৎ মুখবন্ধ সংবিধানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ। ইহা সংবিধানের প্রাণস্বরূপ এবং ইহাই সংবিধানের মর্ম উপলব্ধি করিবার চাবি-কাঠি। মুখবন্ধটি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট একটি মহামূল্য রত্নের ন্যায়। ইহার রচনাভঙ্গি একটি অনবদ্য গদ্যকবিতার ন্যায় সর্বাঙ্গ-সুন্দর। একদিক হইতে বিবেচনা করিলে সমগ্র সংবিধানটিকে মুখবন্ধের

1 **Pandit Thakurdas Bhargava : Constituent Assembly Debates, Vol. X, p. 682.**

বিশদ ও বিস্তৃত টীকা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। সাম্য স্বাধীনতার বাণী মৌলিক অধিকারের ধারাগুলিতে বিধৃত করা হইয়াছে। সামাজিক ও আর্থিক ন্যায়বিচারের বাণী এবং ভ্রাতৃত্বের আদর্শ রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে এবং সমগ্র সংবিধানে গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতির কাঠামো সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সর্বোপরি জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে।

মুখবন্ধের আইনগত মূল্য

যদিও ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধ দেশে ও বিদেশে প্রশংসিত হইয়াছে, যদিও এই মুখবন্ধটি সমগ্র সংবিধানের চরিত্রের দ্যোতক, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে মুখবন্ধের আইনগত মূল্য খুব বেশী নহে। সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত কোন আইনের ধারা যদি স্পষ্টভাবে লিখিত থাকে তাহা হইলে মুখবন্ধের কোন আদর্শের কথা উত্থাপন করিয়া ঐ ধারার অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা চলে না। অর্থাৎ বিধানমণ্ডলী বা সংসদ কর্তৃক পাশ করা আইনই বলবৎ হয়। তবে যেখানে আইনের কোন ধারা স্পষ্ট নহে সেখানে ঐ ধারাটির মর্ম বুঝিবার জন্য অবস্থা অনুযায়ী মুখবন্ধের নীতি উত্থাপন করা চলে। এই বিষয়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের মতই রায় দিয়াছেন। দ্বিতীয়োক্ত আদালত জেফার্‌সন বনাম ম্যাসাচুসেট্‌স্ নামক প্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছিলেন—"Although the Preamble indicates the general purposes for which the people ordained and established the constitution, it has never been regarded as the source of any substantive power conferred on the Government of the United States or any of its Departments. Such powers embrace only those expressly granted in the body of the constitution, and as such as may be implied from those powers." অর্থাৎ যদিও মুখবন্ধে সাধারণভাবে সংবিধানের মূলসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তথাপি শাসনবিভাগকে মুখবন্ধদ্বারা কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয় নাই। মুখবন্ধ ব্যতিরেকে, সংবিধানের অভ্যন্তরে স্পষ্টভাবে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে বা সূচিত হইয়াছে তাহাই প্রশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মোকদ্দমায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছে যে কোন আইনের অর্থ বুঝিতে হইলে ঐ আইনটির ধারাই বিবেচনা করিতে হইবে, মুখবন্ধটি টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না। বলা বাহুল্য, যদি কোন আইনের ধারার অর্থ

স্পষ্টভাবে বোঝা না যায়, তাহা হইলে স্থলবিশেষে আইনের অর্থ স্পষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে মুখবন্ধের নীতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বেরুবাড়ী ইউনিয়নের মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করেন যে মুখবন্ধ সংবিধানের অংশ নহে। আইনের অর্থনির্ণয় সম্বন্ধে সর্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ ম্যাকস্‌ওয়েল (Maxwell : 'Interpretation of Statutes) বলিতেছেন যে কোন আইনে অর্থ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে মুখবন্ধটি কাজে লাগানো যাইতে পারে; নতুবা নহে। যদিও আইনগতভাবে মুখবন্ধের ততটা গুরুত্ব নাই, তথাপি আদর্শের দিক হইতে মুখবন্ধের মূল্য অপরিসীম। কারণ মুখবন্ধ জাতির সম্মুখে কয়েকটি আদর্শ তুলিয়া ধরে যাহা হইতে জাতি চিরকাল প্রেরণালাভ করিতে পারে।

নবম অধ্যায়

ভারতীয় ইউনিয়ন ও তাহার ভূ-খণ্ড

সংবিধানের সর্বপ্রথম ধারাটি এইরূপ "India, that is Bharat, shall be a Union of States". ইণ্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত, কতকগুলি রাজ্যের সমষ্টি হইবে। এই সংজ্ঞার মধ্যে তিনটি শব্দ লক্ষণীয়—ইণ্ডিয়া, ভারত ও ইউনিয়ন অব ষ্টেটস্ (সম্মিলিত রাজ্য সমষ্টি)।[1]

সংবিধান পরিষদে আমাদের রাষ্ট্রের নাম ইণ্ডিয়া হইবে না ভারত হইবে, এই বিষয় লইয়া মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন যে ভারতবর্ষ বাহিরের জগতে ইণ্ডিয়া নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া। সেইজন্য আমাদের রাষ্ট্রকে ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করা উচিত। অন্যপক্ষে, অনেকে বলেন যে প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশের নাম ভারত ; সুতরাং ভারত নামটি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। শেষ পর্যন্ত দুইটি নামই গ্রহণ করা স্থির হয়।

ইউনিয়ন অব ষ্টেটস্ কথাটি অর্থপূর্ণ। ইহার মর্ম সম্বন্ধে সংবিধানের Drafting Committee বা খসড়া সংবিধান প্রণয়নকারী কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর বলিয়াছেন যে ইউনিয়ন অব ষ্টেটস্ কথাটির মধ্যে দুইটি নীতি বিধৃত রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ভারত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির পূর্ব সম্মতির ফলশ্রুতি নহে। অর্থাৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আগে রাজ্যগুলি সম্মত হইয়াছে এবং সেই সম্মতির ফলেই ইউনিয়ন গঠিত হইয়াছে এমন নহে। ভারতে রাজ্যগুলিকে তাহাদের পূর্ব সম্মতি ব্যতীত ইউনিয়ন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির ইউনিয়ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার অধিকার নাই। ইহা ব্যতীত ইউনিয়ন অব ষ্টেটস্ বাক্যটির আরও একটি অর্থ রহিয়াছে। ভারতের প্রতিটি নাগরিক কেবলমাত্র ভারতেরই নাগরিক, রাজ্য-নাগরিকতা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ক্যানাডার সংবিধান অনুযায়ী ইউনিয়ন কথাটি গৃহীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ধারা ও তৃতীয় ধারা অনুযায়ী ভারতীয় সংসদকে রাজ্যগুলি পুনর্গঠন করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধারা দুইটি অনুসারে ভারতীয় সংসদ :

(ক) এক বা একাধিক রাজ্য হইতে ভূ-খণ্ড লইয়া অথবা দুই বা ততোধিক রাজ্য বা রাজ্যাংশ যুক্ত করিয়া নূতন রাজ্য সৃষ্টি করিতে পারে।

(খ) রাজ্যের আয়তন বাড়াইতে বা কমাইতে পারে।

(গ) রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন করিতে পারে।

(ঘ) যে কোন রাজ্যের নামও পরিবর্তন করিতে পারে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে ভারতের কোন ভূ-খণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রকেও হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা সংসদের রহিয়াছে। যে কোন রূপে রাজ্য পুনর্গঠন বা বিদেশী রাষ্ট্রকে ভারতীয় ভূ-খণ্ড হস্তান্তর করিতে হইলে পার্লামেণ্টে ঐ বিষয়ে বিল পাশ করিতে হয়। কিন্তু বিলটি পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক মত প্রকাশের জন্য রাজ্যের নিকট বিলটি পাঠাইতে হয়। কিন্তু সংসদ বা পার্লামেণ্ট ঐ মত অগ্রাহ্যও করিতে পারে। আরও লক্ষণীয় যে, এইরূপ পরিবর্তন বা হস্তান্তর সংবিধান সংশোধনের পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণ আইন পাশের যে রীতি বিধিবদ্ধ আছে তাহাই এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে, 1958 সালে পশ্চিমবাংলার বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পাকিস্তানের কিছু ভূ-খণ্ডের বিনিময়ে পাকিস্তানকে দেওয়া চলে কি না, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ও পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান্ নুনের মধ্যে আপস আলোচনায় উপরোক্ত বিনিময় স্থিরীকৃত হয়। সংবিধানের 3 ধারা অনুসারে কোন ভারতীয় ভূ-খণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রকে হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের আছে কিনা—এই সমস্যা তখন দেখা দেয়। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পরামর্শ জানিবার জন্য বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরণ করেন। সুপ্রীম কোর্ট মন্তব্য করে যে সংবিধানের ঐ ধারা অনুসারে কোন ভারতীয় ভূ-খণ্ড বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। তাহার পর 1960 সালে 368 ধারা অনুসারে সংবিধানেয় নবম সংশোধন দ্বারা এই ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হয়। বর্তমানে নিম্নলিখিত রাজ্য-সমূহ ও ইউনিয়ন এলাকা লইয়া ভারত ইউনিয়ন গঠিত।

রাজ্যসমুহ : যথা,

(1) অন্ধ্রপ্রদেশ, (2) আসাম, (3) বিহার, (4) গুজরাট, (5)

হরিয়ানা, (6) হিমাচল প্রদেশ, (7) জম্মু ও কাশ্মীর, (8) কেরল, (9) মধ্যপ্রদেশ, (10) মণিপুর, (11) তামিলনাডু (মাদ্রাজ), (12) মহারাষ্ট্র, (13) কর্ণাটক (মহীশুর), (14) মেঘালয়, (15) নাগাল্যাণ্ড, (16) ওড়িশ্যা, (17) পাঞ্জাব, (18) রাজস্থান, (19) ত্রিপুরা, (20) উত্তরপ্রদেশ এবং (21) পশ্চিমবঙ্গ।

ইউনিয়ন এলাকা : যথা,

(1) দিল্লী, (2) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (3) লাক্ষাদ্বীপ (লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ), (4) দাদরা ও নগর হাভেলী, (5) গোয়া-দমন ও দিউ, (6) পণ্ডিচেরী, (7) চণ্ডীগড়, (8) মিজোরাম, (9) অরুণাচল।

এই সূত্রে পূর্ব ইতিহাস উল্লেখ করা প্রয়োজন। 1950 সালে 26শে জানুয়ারীতে যখন সংবিধান প্রবর্তিত হইল, তখন ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ভূ-খণ্ডগুলিকে ক, খ, গ, ঘ এই চারিটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল। প্রথম ভাগে অর্থাৎ ক শ্রেণীতে পূর্বতন ব্রিটিশ শাসনাধীন গভর্ণর শাসিত প্রদেশ যথা, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, যুক্ত-প্রদেশ (পরে নাম দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশ) এবং পশ্চিমবঙ্গ—এই নয়টি রাজ্য। দ্বিতীয় অর্থাৎ খ ভাগেও ছিল নয়টি রাজ্য যথা, হায়দ্রাবাদ, জম্মু ও কাশ্মীর, মহীশুর, পাতিয়ালা ও পূর্বপাঞ্জাব দেশীয় রাজ্য সমষ্টি, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র এবং ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন। তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ গ ভাগে দশটি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত হয়, যথা, আজমীর, ভূপাল, বিলাসপুর, কুচবিহার, কুর্গ, দিল্লী, হিমাচল-প্রদেশ, কচ্ছ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা। শেষোক্ত ঘ ভাগে ছিল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ।

ক, খ ও গ শ্রেণীর ভূখণ্ডগুলিকে অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। ঘ শ্রেণীর ভূখণ্ড এবং যে সকল অঞ্চল ভবিষ্যতে ভারতের অধীনে আসিবে, তাহা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শাসিত হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। এই স্থলে লক্ষণীয় যে বিভিন্ন শ্রেণীর এলাকার সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধ বিভিন্ন প্রকারের ছিল। অর্থাৎ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ক, খ, গ ও ঘ শ্রেণীর রাজ্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

বস্তুতঃ ভারতীয় ভূখণ্ড চারভাগে বিভক্ত হইবার দরুণ নানা প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতার উদ্ভব হয়। ইতিমধ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি সোচ্চার হইয়া উঠে। 1953 সালে অন্ধ্রদেশে দারুণ বিক্ষোভের ফলে, অন্ধ্র ভারতের একটি ক শ্রেণীর রাজ্য

হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। অন্ধ্রের দাবি স্বীকৃত হইবার পর ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের দাবি ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ভারত সরকার 1953 সালের ডিসেম্বর মাসে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করে। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ফজল্ আলী। 1955 সালের অক্টোবর মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

কমিশনের মূল সুপারিশগুলি এইরূপ : (1) ভারতে নিম্নলিখিত ষোলটি রাজ্য থাকিবে, যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, মহীশুর, বিদর্ভ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পশ্চিমবঙ্গ। (2) খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হইবে। (3) মণিপুর, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিবে।

1956 সালের জানুয়ারীতে ইউনিয়ন সরকার ঘোষণা করে যে কমিশনের মূল সুপারিশের সঙ্গে তাহারা একমত। তাহার পর পার্লামেণ্ট ঐ বৎসরই তিনটি আইন পাশ করে। তাহার ফলে (1) নিম্নলিখিত চৌদ্দটি রাজ্য গঠিত হয়, যথা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, বিহার, বোম্বাই, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, মহীশুর, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ এবং জম্মু ও কাশ্মীর। ইহা ব্যতীত (2) নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল (Union Territories) বলিয়া গণ্য হইল, যথা, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ। অর্থাৎ ভারতীয় ভূ-খণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল। একভাগে রহিল রাজ্যসমূহ, অন্যভাগে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি। (3) ভাষার ভিত্তিতে বিহার রাজ্য হইতে পুরুলিয়া জেলার অধিকাংশ এবং পুর্ণিয়া জেলার কয়েকটি থানার অন্তর্গত অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরবর্তীকালে কয়েকটি পুরাতন রাজ্য বিভক্ত হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন রাজ্যেরও সৃষ্টি হইয়াছে। 1960 সালের পূর্বে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট একই রাজ্যের (বোম্বাই-এর) অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ভাষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর হইতে মহারাষ্ট্রের জনগণ গুজরাট রাজ্যকে পৃথক করিয়া ভাষা-ভিত্তিক মহারাষ্ট্র রাজ্য গঠনের দাবি উত্থাপন করে। গুজরাটের জনতাও গুজরাটকে পৃথক রাজ্য হিসাবে স্বীকৃতিদানের দাবি জানায়। ইহার ফলে বোম্বাই রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া 1960 সালে ভাষাভিত্তিক মহারাষ্ট্র ও গুজরাট, এই দুইটি রাজ্য গঠিত হয়।

1953 সালে নাগাল্যাণ্ড পূর্ণ অঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায়। ভারতের

স্বাধীনতালাভের পর হইতেই ধীরে ধীরে নাগাভূমিতে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দানা বাঁধিতে থাকে। নাগা নেতা ফিজোর নেতৃত্বে এই দাবি সোচ্চার হইয়া উঠে। ইউনিয়ন সরকার সঙ্গত কারণেই এই দাবি মানিয়া লইতে পারে নাই। রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিকভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগা জনগণের মতানুসারে নাগাভূমিকে একটি অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা দান করা হয়।

1953 সালে পাঞ্জাব রাজ্য বিভক্ত হইয়া দুইটি রাজ্যে পরিণত হয়। এই দুইটি হইতেছে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা। পুরাতন পাঞ্জাব রাজ্যে প্রধানতঃ গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষাভাষী শিখ এবং হিন্দী ভাষাভাষী নাগরিকগণের বাস ছিল। শিখেরা ধর্মের দিক দিয়াই নিজেদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলিয়া মনে করিত। ভাষা ও ধর্মের পার্থক্য হেতু মাঝে মাঝে শিক্ষা, চাকুরি, মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিরোধ উপস্থিত হইত। শিখগণ এই অবস্থায় পৃথক রাজ্য দাবি করিতে থাকে। সমস্যার নিরসনকল্পে ভারত সরকার পাঞ্জাবকে বিভক্ত করিয়া দুইটি রাজ্যে পরিণত করে।

খাসি পাহাড়, গারো পাহাড় ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ের অধিবাসীগণ মনে করিতে আরম্ভ করে যে আসামের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া তাহারা আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিতেছে না। তাই তাহারা তাহাদের প্রতিনিধি স্থানীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান অল্ পার্টিস হিল্ লীডার্স কন্‌ফারেন্সের নেতৃত্বে উপরে লিখিত অঞ্চলগুলিকে আসাম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি নূতন রাজ্য গঠনের দাবি তোলেন। পার্লামেণ্ট এই দাবি মানিয়া লয় এবং উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ একত্রীভূত করিয়া মেঘালয় রাজ্য গঠন করে। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি ত্রিপুরা, মণিপুর এবং হিমাচল প্রদেশেও শক্তিশালী হইয়া উঠে। সেইজন্য ঐ তিনটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকেও রাজ্যের মর্যাদা দান করা হয়।

দেখা যাইতেছে যে ভাষা স্বাধীনতার পরবর্তী কালে রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। আবার ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত রহিয়াছে জাতি (race) বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ এবং জীবনধারা। এই সূত্রে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ভাষার ভূমিকা কি ছিল আলোচনা করা সমীচীন। কারণ এই বিষয়ে একটি ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘকাল পূর্বেই সাংগঠনিক ক্ষেত্রে প্রথাগতভাবে ভাষার ভিত্তিতে কংগ্রেস-প্রদেশ গঠনের নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। বস্তুতঃ অনেকগুলি কংগ্রেস প্রদেশই ভাষার ভিত্তিতে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু কিছু পরিমাণ ব্যতিক্রমও যে ছিল না, তাহা নহে।

এইজন্য দাবিও উত্থাপিত হইয়াছিল। ভাষাভিত্তিক কংগ্রেস-প্রদেশের গঠনের দাবি এইরূপে অন্ধ্র, সিন্ধুদেশ, কর্ণাটক ও কেরলের কংগ্রেসীগণ উত্থাপন করে। 1917 সালে অন্ধ্রের ও 1918 সালে সিন্ধুর এই দাবি মানিয়া লওয়া হয়। 1923 সালে নাগপুর কংগ্রেসে ভাষাভিত্তিক কংগ্রেস গঠনের দাবি নীতিগতভাবে স্বীকৃত হয়। যাহা প্রথা ছিল, তাহা নীতিরূপে গৃহীত হইল। ঐ বৎসরেই এই নীতি অনুযায়ী কর্ণাটক ও কেরল কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রদেশ বলিয়া গণ্য হয়। স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের তথা ভারত সরকারের ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যগঠনের নীতি না মানিয়া উপায় ছিল না। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা লক্ষণীয়।

অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Council)

ভারতীয় ভূ-খণ্ড কয়েকটি অঙ্গরাজ্য ও কতকগুলি ইউনিয়ন এলাকা লইয়া গঠিত। রাজনৈতিক ইতিহাস ও জীবনধারার বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করিয়া অঙ্গ রাজ্য প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। প্রতি রাজ্য ও ইউনিয়ন এলাকায় এক একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বর্তমান। এই সকল পার্থক্য অতিক্রম করিয়া ভারতে একটি মূলগত ঐক্য বিদ্যমান। স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষতঃ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অনুসন্ধানের সময় দেখা গেল যে দেশে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ভারতীয় ঐক্যবোধকে ব্যাহত করিতেছে। ভারতীয় ঐক্যের প্রতি দেশবাসীর আনুগত্য বৃদ্ধি করিবার জন্য একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হইল, অন্যদিকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের একাধিক রাজ্য সমূহকে লইয়া কয়েকটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করিবার নীতি ঘোষিত হইল। এই নীতিটি 1956 সালের ষোলই জানুয়ারী প্রকাশিত হয়।

অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক বিশেষত্বের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে এক একটি অঞ্চল মোটামুটিভাবে সমস্বার্থ দ্বারা এক সূত্রে গ্রথিত। এই ভিত্তির উপরই অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্বোক্ত যে নীতিটি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা ও কার্যকরী করিয়া ছিলেন, কালক্রমে তাহা বিবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের মূল ভূ-খণ্ডের রাজ্য ও এলাকাগুলি (Union territories) ছয়টি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রতি অঞ্চলে একটি করিয়া আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও এলাকাসমূহের সমস্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিবার জন্য এই আঞ্চলিক পরিষদগুলি গঠিত হইয়াছে। পরিষদগুলি পরামর্শদাতা কমিটির ন্যায় কাজ করে এবং অঞ্চলস্থ বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সহযোগিতা

ও সহমর্মিতা গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। এই উদ্দেশ্যে ছয়টি প্রধান আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

(1) হরিয়ানা, হিমালয় প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, পাঞ্জাব এবং দুইটি ইউনিয়ন এলাকা চণ্ডীগড় ও দিল্লী লইয়া উত্তর অঞ্চল গঠিত।

(2) মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশ লইয়া মধ্য অঞ্চল।

(3) পূর্ব অঞ্চলে রহিয়াছে বিহার, ওড়িশ্যা ও পশ্চিমবঙ্গ।

(4) গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং ইউনিয়ন এলাকা গোয়া-দমন-দিউ ও নগর হাভেলী পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত।

(5) দক্ষিণ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ভূ-খণ্ডগুলি হইতেছে অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল, মহীশুর, তামিলনাড়ু ও পণ্ডিচেরী নামক ইউনিয়ন এলাকা।

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদের নিম্নলিখিত মূল উদ্দেশ্যগুলি লক্ষণীয়।

(ক) জাতির ভাবগত ঐক্য বিধান।

(খ) উগ্র-প্রাদেশিকতা, ভাষান্ধতা, সংকীর্ণ আঞ্চলিকতা, একতাবিরোধী সর্বপ্রকারের ক্ষুদ্রতার বিনাশ।

(গ) সমগ্র অঞ্চলের ও সর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য যুক্ত প্রয়াস ও সমাজতান্ত্রিক পন্থার অনুসরণ।

(ঘ) উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনার দ্রুত রূপায়ণের জন্য পরস্পরের সহিত গঠনমূলক সহযোগিতা এবং

(ঙ) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার প্রয়াস।

এই সকল প্রধান উদ্দেশ্য ব্যতীত কতকগুলি বিশেষ বিষয় আঞ্চলিক পরিষদ আলোচনা ও সুপারিশ করিতে পারে, যথা—

(ক) সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের বিষয়।

(খ) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সমূহের মধ্যে কোন সীমান্ত বিরোধ।

(গ) দুই বা ততোধিক রাজ্য বা ইউনিয়ন এলাকার যানবাহন চলাচল সম্পর্কিত প্রশ্ন।

(খ) অঞ্চল ও ইউনিয়নের মধ্যে কোন বিষয়ে বিরোধ অথবা একই অঞ্চলের রাজ্যে রাজ্যে বিরোধ প্রভৃতি।

আঞ্চলিক পরিষদের গঠনপ্রণালী এইরূপ:

(ক) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-সভাপতি।

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

(গ) মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত প্রতি সংশ্লিষ্ট রাজ্য হইতে রাজ্যপাল কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মন্ত্রী।

(6) উপরোক্ত পাঁচটি অঞ্চল ব্যতীত ভারতের উত্তর-পূর্ব এলাকায় কিছুটা অন্য আদর্শ লইয়া আরও একটি অঞ্চল গঠিত হইয়াছে। ইহা উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নামে পরিচিত। এই অঞ্চলে রহিয়াছে আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা এবং ইউনিয়ন এলাকাদ্বয় মিজোরাম ও অরুণাচল। এই অঞ্চলটি 1953 সালের আগষ্ট মাসে গঠিত হয়। উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও আঞ্চলিক পরিষদ অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় নিজেদের সমস্বার্থসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করে। কিন্তু ইহা ব্যতীত এই আঞ্চলিক পরিষদকে কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের স্বার্থের অভিন্নতা মনে রাখিয়া সমগ্র অঞ্চলের জন্য অথবা দুই বা ততোধিক এলাকা বা রাজ্যের জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা উদ্ভাবনের ভার দেওয়া হইয়াছে।

পরিষদের প্রশাসনিক নিয়ম : প্রতি পরিষদের একটি করিয়া দপ্তর থাকিতে পারে এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যসচিবগণ পালাক্রমে ঐ দপ্তরের সচিবের কাজ সম্পাদন করেন। প্রতি সদস্যরাজ্যের মুখ্য সচিব ব্যতীত রাজ্যের উন্নয়ন কমিশনের ও যোজনা কমিশনের প্রতিনিধি, আঞ্চলিক পরিষদের সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের অধিবেশন সভাপতির নির্দেশ ও রাজ্য সদস্যগণের সম্মতিক্রমে, পরিষদের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন রাজ্যে পালা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি মোটামুটিভাবে বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সম্মতি অনুযায়ী লইতে হইবে। প্রতি অধিবেশনের বিবরণ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহকে প্রেরণ করিবার নিয়ম আছে। একাধিক আঞ্চলিক পরিষদ সমস্বার্থ-বিষয়ক প্রশ্ন আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে এক সভায় মিলিত হইতে পারে। প্রয়োজন হইলে পরিষদ কোন বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করিতেও পারে।

আঞ্চলিক পরিষদের সাংবিধানিক স্থান : আঞ্চলিক পরিষদগুলি পরামর্শদাতা কমিটির ন্যায় কাজ করে। সুতরাং ইহার দ্বারা রাজ্যের বা কেন্দ্রের ক্ষমতার কোন হ্রাস-বৃদ্ধির হইবার সম্ভাবনা নাই। পরিষদগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিত কোন মধ্যবর্তী অঙ্গরাজ্য বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও (Sub-Federal Union) নহে। পরিষদ স্থাপন দ্বারা অঞ্চলস্থ বিভিন্ন রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত বিষয়গুলি এবং একই সমস্যাক্লিষ্ট একাধিক রাজ্যের স্বার্থ-আলোচনা ও সমাধানের একটি উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আলোচনা ও শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে মতান্তর ও মনোমালিন্য বিদূরিত হইবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়। যে সকল

সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, তাহা কার্যে পরিণত হইলে অঞ্চলস্থ রাজ্যগুলির উন্নয়নের পথ সুগম হইয়া ওঠে। প্রাদেশিকতা এবং সকল প্রকার সংকীর্ণতা দূর করিয়া আঞ্চলিক পরিষদগুলি জাতিকে একতার ও দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর করিয়া দিতে সাহায্য করিতে পারে।

পরিষদের উপকারিতা : স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী 1955 সালে লোকসভায় আঞ্চলিক পরিষদের পরিকল্পনা আলোচনা করেন। 1957 সালে পাঁচটি পরিষদ গঠিত হয় এবং কাজ আরম্ভ হয়। পরিষদের অভিজ্ঞতা দীর্ঘ নহে। তথাপি পরিষদ সমূহ যে কাজ দেখাইতে পারিয়াছে, তাহা অবহেলা করিবার বস্তু নহে। এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে প্রয়োজন মত প্রযুক্তিবিদ্যাকুশলী প্রেরণ, অঞ্চলে শিল্প, প্রযুক্তি ও শিল্প শিক্ষার প্রসারসাধন, যৌথ প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আভ্যন্তরীণ চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি, এক রাজ্য হইতে অন্য রাজ্যে যাতায়াতের জন্য পুল এবং সড়ক নির্মাণ, কৃষি উৎপাদনের উন্নতিসাধন, উন্নয়ন মূলক যৌথ প্রচেষ্টা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পরিষদগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়াছে। ইহা দ্বারা অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির যে উপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। ছয়টি পরিষদে যদি বিচক্ষণতা ও সহযোগিতার মনোভাব লইয়া সতর্কতার সহিত কার্যে অগ্রসর হওয়া যায় তাহা হইলে দেশের সামগ্রিক মঙ্গল সুনিশ্চিত। দুঃখের বিষয় সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, অগণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি, সুবিধাবাদ প্রভৃতি আঞ্চলিক পরিষদের আদর্শকে মাঝে মাঝে খণ্ডিত করিয়াছে। ইহার ফলে জওহরলাল নেহরু যে উদ্দেশ্যে এই পরিষদগুলি গঠন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে বলা চলে না।

দশম অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

গণতন্ত্রে নাগরিকের স্থান সর্বোচ্চ। নাগরিকের রাজনৈতিক চরিত্রের উপর গণতন্ত্রের চরিত্র নির্ভর করে। এইজন্য গণপরিষদে নাগরিকতা লইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া নানাদিক হইতে বিচার বিবেচনা চলে এবং প্রায় দুই বৎসর পর সংবিধান পরিষদ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। দেশ বিভাগ ও বিপুল সংখ্যক নরনারীর এক রাষ্ট্র হইতে অন্য রাষ্ট্রে গমনাগমন, বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় সন্তানদের ভারতে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিবার সম্ভাবনা প্রভৃতি নানা প্রশ্ন নাগরিকতার সমস্যাটিকে জটিল করিয়া তোলে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ নাগরিকতা আইন প্রণয়নের দায়িত্ব স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়। (এই বিধান অনুযায়ী 1955 সালে পার্লামেণ্ট নাগরিকতা আইন পাশ করে।) সংবিধান প্রবর্তিত হইবার সূচনায় কাহারা নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন কেবল সেই প্রশ্নটিরই পরিষদে মীমাংসা হয় এবং তাহা সংবিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হয়।

ভারতীয় নাগরিকত্বের দুইটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সাধারণতঃ দ্বি-নাগরিকতা (Dual citizenship) স্বীকৃত হইয়া থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডে দ্বি-নাগরিকতা বিদ্যমান। এই দুইটি দেশের প্রতি নাগরিকের অঙ্গ রাজ্যের এবং সমগ্র যক্তরাষ্ট্রের, দুই প্রকারের নাগরিকত্ব রহিয়াছে। যাহারা অঙ্গরাজ্যের নাগরিক তাহারা সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। প্রতি নাগরিক দুই প্রকার নাগরিকত্বের অধিকারী। ইহাই দ্বি-নাগরিকতা (Dual citizenship) নামে অভিহিত। অঙ্গরাজ্যের নাগরিকতার বলেই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ হইতে পারে, অন্যভাবে নহে। (কিন্তু ভারতে রাজ্য নাগরিকতা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ভারতীয় নাগরিকগণ কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিক।) আমেরিকায় ও সুইট্জারল্যাণ্ডে কতকগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রতি রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন। যখন যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইল, তখন ঐ সকল সার্বভৌম রাষ্ট্র তাহাদের নাগরিকতার ব্যবস্থা লইয়াই যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিল।

আবার যখন যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করিল, তখন ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকতার প্রশ্ন উঠিল এবং যথাবিধি যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতার সৃষ্টি হইল। এইরূপে দ্বি-নাগরিকতার উদ্ভব হইল। ঐতিহাসিক কারণেই দ্বি-নাগরিকত্ব ভারত সংবিধানে স্থান পায় নাই। তাহার কারণ এই যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্বে স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না; তাই রাজ্যনাগরিকতা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। সংবিধান পরিষদ এই অনস্বীকার্য সত্যটি স্বাভাবিক ভাবেই মানিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত, সংবিধান পরিষদ একটি কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এইরূপ রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় নাগরিকতারই স্থান হইতে পারে, রাজ্য নাগরিকতার নহে।

ভারতীয় নাগরিক : 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী অর্থাৎ সংবিধান চালু হইবার দিনে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ নাগরিক হিসাবে গণ্য হইলেন। (ক) যিনি ভারতীয় ভূ-খণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। (খ) যাহার পিতা বা মাতা ভারতীয় ভূ-খণ্ডে জন্মলাভ করিয়াছেন। (গ) যাহারা সংবিধান চালু হইবার পূর্বে পাঁচ বৎসর কাল সাধারণতঃ ভারতীয় ভূ-খণ্ডে বসবাস করিয়াছেন।

পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিবর্গের নাগরিকতা : পূর্বোক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত যাহারা পাকিস্তান হইতে ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও কয়েকশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গকে 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতেই নাগরিকত্ব দেওয়া হইয়াছিল। (ক) যিনি 1948 সালের উনিশে জুলাই-এর পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছিল যে তিনি নিজে বা তাহার পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে যে কেহ যদি অবিভক্ত ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিবার পর যদি তিনি সাধারণতঃ ভারতেই বসবাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যক্তি 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতেই ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন। (খ) যিনি 1948 সালের উনিশে জুলাই তারিখে বা তাহার পর পাকিস্তান হইতে ভারতে আসিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছিল যে তাহার পিতা বা মাতা অথবা পিতামহ, পিতামহী বা মাতামহ ও মাতামহীর মধ্যে যে কোন একজন যদি অবিভক্ত ভারতে জন্মিয়া থাকেন এবং তিনি যদি বিধিমত ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবার জন্য ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মচারীর নিকট দরখাস্ত করিয়া রেজেষ্ট্রীভুক্ত হইয়া থাকেন এবং দরখাস্ত করিবার তারিখের পূর্বে ছয়মাস কাল ভারতে বসবাস

করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী হইতে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন। পাকিস্তান হইতে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে যাহাদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত শর্তগুলি পূরণ হয় নাই তাহাদেরও পরবর্তীকালে ভারতীয় নাগরিক হইবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছে, 1955 সালে প্রণীত নাগরিক আইন দ্বারা।

সংবিধানের পাঁচ ও ছয় ধারায় যাহা সন্নিবিষ্ট আছে তাহা সত্ত্বেও সাত ধারায় বলা হইয়াছে, যে সকল ব্যক্তি 1947 সালের পয়লা মার্চের পর ভারতীয় ভূ-খণ্ড পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানে চলিয়া গিয়াছেন, তাহারা ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তি যদি ভারতে পুনর্বাসের অথবা স্থায়ীভাবে বাসের অনুমতি পত্র লইয়া ভারতে চলিয়া আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আইনের চক্ষে ধরিয়া লইতে হইবে যে তিনি 1948 সালের উনিশে জুলাই-এর পর ভারতে আসিয়াছেন। তাহাদের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত (খ) চিহ্নিত অনুচ্ছেদের শর্তাবলী প্রযুক্ত হইবে।

বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়দের সম্বন্ধে ব্যবস্থা

সংবিধানের আট ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে বিদেশী রাষ্ট্রে বসবাসকারী ভারতীয়, যিনি নিজে অথবা যাহার পিতা বা মাতা, পিতামহ বা পিতামহী অথবা মাতামহ বা মাতামহীর মধ্যে যে কোন একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি যদি ঐ বিদেশী রাষ্ট্রে প্রেরিত ভারতীয় দূতাবাস বা ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধির কাছে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করেন এবং উহা যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন। 9 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে যদি কেহ নিজের ইচ্ছায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তি উপরে লিখিত কোন নিয়মেরই সুযোগ লইয়া ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে না।

1955 সালের নাগরিকতা আইন

সংবিধানের নাগরিকতা শীর্ষক অধ্যায়ের 11 ধারা দ্বারা পার্লামেণ্টকে নাগরিকতা অর্জন ও নাগরিকতা অবসান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আইন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী 1955 সালে পার্লামেণ্ট নাগরিকতা সম্বন্ধে বিস্তারিত আইন প্রণয়ন করিয়াছে।

নাগরিকত্ব অর্জন

(1) এই আইন অনুসারে পাঁচটি উপায়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করা যায়ঃ

(ক) জন্মগত অধিকার (Birth)।

(খ) বংশগত অধিকার (Descent)।

(গ) বিধিমত তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ অধিকার।

(ঘ) বিদেশীয় লোককে দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী (Naturalisation) লব্ধ অধিকার।

(ঙ) কোন অ-ভারতীয় ভূ-খণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইবার ফল-স্বরূপ।

জন্মগত অধিকার অনুযায়ী নাগরিকতা সম্বন্ধে 1955 সালের আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে 1950 সালের ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে অথবা তাহার পর যাহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারা ভারতীয় নাগরিকত্ব পাইবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিধান রহিয়াছে যে নাগরিকতা প্রার্থীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, (ক) যখন তাহার জন্ম হইয়াছিল তখন তাহার পিতা ভারতীয় নাগরিক ছিলেন এবং (খ) ঐ সময় তাহার পিতা সম্পর্ণভাবে ভারতীয় সার্বভৌমত্বের অধীন ছিলেন অর্থাৎ পর রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি কোন বিশেষ অধিকারভোগী ছিলেন না, যাহার দ্বারা তাহার উপর ভারতীয় সার্বভৌমত্বের হ্রাস ঘটিতে পারে। এই নিয়ম অনুসারে বিদেশী দূতগণের পুত্র-কন্যা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেও ভারতীয় নাগরিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, যাহাদেব পিতা ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং যাহারা শত্রু অধিকৃত কোন এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে তাহারাও নাগরিক হইতে পারে না।

(2) বংশগত অধিকারে (Descent) নাগরিকতা ঃ

ছাব্বিশে জানুয়ারীর পর ভারতের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এমন ব্যক্তির পিতা যদি ভারতীয় নাগরিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকরূপে গণ্য হইবেন।

ইহা ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণও নাগরিক হইবার অধিকারী যদি তাহারা দরখাস্ত করিয়া তালিকাভুক্ত হন :—

(ক) বংশগত অধিকারে যাহারা নাগরিক তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ।

(খ) যাহারা নাগরিক নহেন কিন্তু ভারতের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত তাহাদের পুত্র-কন্যাগণ।

(3) বিধিমত তালিকাভুক্তির দরুন নাগরিকতা লাভ (Registration) :

নিম্নলিখিত পর্যায়ের ব্যক্তিগণ দরখাস্ত করিয়া ভারতীয় নাগরিক শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে।

(ক) কমনওয়েলথ দেশসমূহের ও আয়ারল্যাণ্ড গণতন্ত্রের পূর্ণবয়স্ক ও স্বাভাবিক মস্তিষ্কের নাগরিক ;

(খ) অবিভক্ত ভারতের বাহিরে বসবাসকারী যে কোন ভারতীয় ;

(গ) যে ব্যক্তি ভারতে সাধারণতঃ বসবাস করে এবং দরখাস্ত করিবার তারিখের পূর্বে ছয়মাস ভারতে বাস করিয়াছে ;

(ঘ) যে নারী ভারতীয় নাগরিককে বিবাহ করিয়াছে ;

(ঙ) ভারতীয় নাগরিকগণের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যাগণ। 'রেজিষ্ট্রীকরণ' সম্বন্ধে ভারত সরকার অন্যান্য নিয়মাবলী প্রস্তুত ও চালু করিবার অধিকারী।

(4) দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ (Naturalisation) :

যে ব্যক্তির পূর্বোক্ত নিয়মাবলীর কোনটিতে নাগরিক হইবার সুযোগ নাই তিনি দেশীয়করণ নীতি অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব লাভ করিতে পারেন, যদি তিনি কতকগুলি শর্ত পূরণ করিতে সমর্থ হন এবং তদানীন্তন ভারত সরকারের নিকট হইতে নাগরিকতা সার্টিফিকেট পাইয়া থাকেন। উল্লিখিত শর্তগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান শর্তগুলি নিম্নলিখিত রূপ :

(ক) দরখাস্তকারী যে রাষ্ট্রের নাগরিক তাহাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(খ) যে রাষ্ট্রের তিনি নাগরিক সেই রাষ্ট্র যদি ভারতীয়দের দেশীয়করণ নীতি গ্রহণ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তাহার দরখাস্ত করিবার অধিকার নাই। ইহা ব্যতীত দরখাস্তকারীর ভারতে বসবাসের কাল সম্বন্ধেও নিয়ম রহিয়াছে।

(গ) দরখাস্ত করিবার পূর্বে এক বৎসর কাল দরখাস্তকারীকে ভারতে বাস করিতে হইবে অথবা ভারতীয় বা কোন রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করিতে হইবে। ঐ এক বৎসরের পূর্বে সাত বৎসর তাহাকে ভারতে বসবাস করিতে হইবে। কিম্বা কোন ভারতীয় সরকারের অধীনে চাকুরী করিতে হইবে। আরও দুই একটি নিয়ম আছে, যথা, ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিলে উল্লিখিত ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে অন্ততঃ একটি ভাষা দরখাস্তকারীকে জানিতে হইবে।

সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য যে উপরোক্ত কতকগুলি শর্ত পূরণ না হইলেও ভারত সরকার এক শ্রেণীর দরখাস্তকারীদের, দেশীয়করণ নীতি বলে নাগরিক অধিকার প্রদান করিতে পারে। তাঁহারা হইলেন এমন সকল ব্যক্তি যাহারা বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি বা মানব প্রগতি বিষয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছেন।

অভারতীয় ভূ-খণ্ড ভারতীয় সার্বভৌমত্বে আসিবার জন্য নাগরিকতার প্রসার হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় ভারত সরকার ঘোষণা পত্র দ্বারা নূতন ভূ-খণ্ডের অধিবাসীবর্গকে নাগরিক অধিকার দিতে পারে।

নাগরিকতার অবসান

(1) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক ঘটনাচক্রে অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিক হইয়া পড়ে তাহা হইলে ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তুত নিয়মাবলী অনুসারে তাহাকে স্বাক্ষর করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হইবার ইচ্ছা ঘোষণা করিতে হইবে। তাহার পর সেই ঘোষণা ভারত সরকার কর্তৃক রেজিষ্ট্রি করা হইলে ঐ ব্যক্তির ভারতীয় নাগরিকত্বের অবসান হইবে।

(2) যদি কোন ভারতীয় নাগরিক অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিকতা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া থাকে তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিকতা হারাইবে।

(3) কতকগুলি কারণে নাগরিকতার অধিকার হইতে চ্যুত করিবার ক্ষমতা ভারত সরকারকে দেওয়া হইয়াছে।

(ক) মিথ্যাচরণ ও অসাধু উপায়ে নাগরিকতা লাভ;

(খ) ভারত রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অভাব;

(গ) ভারত রাষ্ট্রের প্রতি বৈরীভাব;

(ঘ) যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের নাগরিক বা রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন;

(ঙ) নাগরিক রূপে দেশীয়করণ বা তালিকা ভুক্তির পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে দুই বৎসরের বা তাহার বেশী মেয়াদে কারাদণ্ড ভোগ।

কমনওয়েলথ্ নাগরিকতা

ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় নাগরিকতা আইন (1955) দ্বারা নূতন এক ধরনের নাগরিকতা উদ্ভূত হইয়াছে, তাহাকে কমনওয়েলথ্ নাগরিকতা বলে। যাহারা কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিক তাহারাই ভারতের সংবিধান ও নাগরিক আইন অনুযায়ী

(1955) কমনওয়েলথ্ নাগরিক। তাহাদের রাষ্ট্র বিদেশী রাষ্ট্র নহে এবং তাহারা আইনের চক্ষে বিদেশী বলিয়া পরিচিত হইবে না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে কমনওয়েলথ্ নাগরিক ও ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে অনেক তফাৎ রহিয়াছে। (কোন কমনওয়েলথ্ দেশে ভারতীয় নাগরিক যেরূপ সুযোগ সুবিধার অধিকারী তাহা বিবেচনা করিয়া সেই কমনওয়েলথ্ দেশের নাগরিককে ভারতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে।)

এই বিষয়ে সংবিধানের 367(3) ধারাটি প্রাসঙ্গিক। ওই ধারায় বলা হইয়াছে যে ভারত ব্যতীত সকল রাষ্ট্রই বিদেশী রাষ্ট্র এবং ঐ সব বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিক ভারতে বিদেশী বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু ইহার একটি ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। সংবিধানের ব্যবস্থা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে যাহার দ্বারা রাষ্ট্রপতি কোন দেশকে বিদেশী রাষ্ট্র নহে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারেন। এই ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 1950 সালের ঘোষণার বলে কমনওয়েলথ্ দেশসমূহকে আইনের চক্ষে বিদেশী রাষ্ট্র নয়, এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহারই সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া পরবর্তীকালে 1955 সালের নাগরিকতা আইনের এগার ধারায় বলা হইয়াছে "Every person who is a citizen of a Commonwealth country specified in the first schedule shall by virtue of that citizenship, have the status of a Commonwealth citizen of India". অর্থাৎ প্রথম তপশীলভুক্ত কমনওয়েলথ্ দেশগুলির নাগরিকেরা নিজ নিজ দেশের নাগরিকতার বলে ভারতে কমনওয়েলথ্ নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবেন। অর্থাৎ তাহারা বিদেশী নহেন কারণ তাহাদের রাষ্ট্র আইনের চক্ষে বিদেশী রাষ্ট্র নহে।

একাদশ অধ্যায়

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

বিদেশী গণতন্ত্রে মৌলিক অধিকার

ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে যে সকল নীতির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে সাম্য ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকারগুলি বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সূত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে আধুনিক যুগে প্রস্তুত প্রায় সমস্ত লিখিত সংবিধানেই মৌলিক অধিকারের অধ্যায় রহিয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক। যে সকল লিখিত গণতান্ত্রিক সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিস্তারিত উল্লেখ আছে, তাহাদের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই সংবিধানটি ভারতের সংবিধানকে কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে।

ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। তাই বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে যে ঐ দেশে মৌলিক অধিকার বলিয়া কোন বস্তু নাই। বলা বাহুল্য, ব্রিটেনে নাগরিকগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ প্রথাগতভাবে আবহমানকাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এই বিষয়ে ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত কিছু কিছু আইনও আছে, যথা, হ্যাবিয়াস কর্পাস এ্যাক্ট (Habeas Corpus Act, 1669)। ব্রিটেনের আদর্শানুযায়ী কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ডোমিনিয়নে মৌলিক অধিকারের কোন বিশেষ উল্লেখ নাই। কারণ, ব্রিটেনের নাগরিকগণের অধিকারসমূহ ডোমিনিয়নের নাগরিকগণও প্রথানুযায়ী পাইয়া আসিতেছেন।

নাগরিকগণের জীবন পূর্ণভাবে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা, সমানাধিকার প্রভৃতি অধিকার আবশ্যক। এই কারণেই ঐ সকল অধিকারগুলিকে মৌলিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং মৌলিক অধিকার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে সংবিধান পরিষদ প্রধানতঃ ব্রিটেন ও আমেরিকার আদর্শ অনুসরণ করিয়াছে। অধিকার-গুলির সংজ্ঞা নির্দেশ ও তাহা রক্ষা করিবার পদ্ধতি—এই দুইদিক হইতেই ঐ দুটি রাষ্ট্রের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। ইহা ব্যতীত 1935 সালের

আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধান ও 1948 সালে জাতিপুঞ্জ কর্তৃক গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র (Universal Declaration of Human Rights, 1948) এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ব্রিটিশ ভারতে মৌলিক অধিকারের অবস্থা

1858 সালের ইংল্যাণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা-পত্রে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল যে, মহারাণীর ভারতীয় প্রজাবর্গ ও শ্বেতকায় ব্রিটিশ নাগরিকগণ একই অধিকার ভোগ করিবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটেনের ভারতস্থ শাসকবর্গ ও রাজপুরুষগণ এই ঘোষণার মর্যাদা দেন নাই। ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্রিটিশ নাগরিক ও ভারতীয় নাগরিকগণের মধ্যে সাম্য, ভারতীয়দের ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে এবং শ্বেতকায় নাগরিকগণের সুবিধার্থে কার্যক্ষেত্রে প্রায়শঃ বিপন্ন হইত। Rule of Law বা আইনের নিরপেক্ষ শাসন অনেক সময় বিঘ্নিত হইত। বিশেষতঃ রাজনৈতিক আন্দোলন যখন উগ্রপন্থী হইয়া উঠিল, তখন ঐ আন্দোলনকে পর্যুদস্ত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়গণের মৌলিক অধিকারগুলি প্রায়শঃ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। এই তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুন সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

সংবিধান পরিষদে মৌলিক অধিকার

মৌলিক অধিকারসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে রচনা করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য সংবিধান পরিষদ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এই কমিটিতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃবর্গকে স্থান দেওয়া হয়। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়টি ড্রাফটিং কমিটি কর্তৃক রচিত হয় এবং বিধিমত সংবিধান পরিষদে গৃহীত হয়।

ভারতে মৌলিক অধিকারের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য

তুলনামূলক ভাবে বলা চলে যে ভারতীয় মৌলিক অধিকারগুলি সর্বাপেক্ষা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। জরুরী অবস্থায় বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কি ভাবে অধিকারগুলি কথঞ্চিৎ পরিমাণে সীমিত করা যাইতে পারে তাহারও নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ কতকগুলি মৌলিক অধিকার নিরঙ্কুশ নহে। এই সূত্রে 15, 16 এবং 19 ধারা সমূহের ব্যতিক্রমমূলক

ব্যবস্থাগুলি লক্ষণীয়। এই কারণে ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায়টি বেশ জটিল। সর্বসমেত 24টি ধারায় অধিকারগুলির সংজ্ঞা, ক্ষেত্র বিশেষে উহার ব্যতিক্রম এবং অধিকারগুলি আদায় করিয়া লইবার আইনতঃ পন্থা চিহ্নিত করা হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদটি যত্ন সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় সংবিধানে পাঁচটি উপায়ে নাগরিকগণের অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, মৌলিক অধিকারগুলির সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দান (14 থেকে 31 ধারা)। দ্বিতীয়তঃ, আইনের শাসন (Rule of Law) বা সর্বক্ষেত্রে আইনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। তৃতীয়তঃ, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা। চতুর্থতঃ, অধিকার রক্ষাকল্পে নাগরিকগণকে আইনানুগ পন্থা নির্দেশ (32 ধারা)। পঞ্চমতঃ, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক শাখা দুইটি কর্তৃক বিচার বিভাগীয় রায়-এর মর্যাদা রক্ষা ও প্রশাসনকে তদনুযায়ী কার্যনির্বাহ করিবার দায়িত্ব অর্পণ (144 ধারা)।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে কতকগুলি মৌলিক অধিকার নাগরিক ও অনাগরিক যে কোন ব্যক্তি দাবী করিতে পারেন—যথা আইনের চক্ষে সাম্য (14 ধারা); ধর্মীয় অধিকার (25 ধারা); সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার (31 ধারা)। কিন্তু মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার প্রভৃতি, যাহা 19 ধারায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কেবল নাগরিকগণ সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার যাহা 29 ধারার বিষয়বস্তু তাহাও কেবল নাগরিকগণ দাবি করিতে পারে। সংবিধানে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে person বা ব্যক্তি কথাটি প্রয়োগ করা হইয়াছে; দ্বিতীয়োক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হইয়াছে citizen বা নাগরিক শব্দটি। এই ভাবে সর্বসাধারণের অধিকার ও কেবলমাত্র নাগরিকগণের অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমেরিকাতে যে সকল মৌলিক অধিকার সংবিধানে উল্লিখিত, তাহা ব্যতীত আমেরিকার সুপ্রীমকোর্ট বিচার দ্বারা প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) সম্মত নূতন অধিকার সৃষ্টি করিতে পারে। ভারতীয় সুপ্রীমকোর্টকে সেরূপ ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ ভারতের সংবিধানে যে অধিকারগুলি বিবৃত করা হইয়াছে তাহা ব্যতীত ভারতীয় নাগরিকগণের অন্য কোন অধিকার নাই।

মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সাংবিধানিক একটি বিশেষ বিধি উল্লেখ করা আবশ্যক। সংবিধান প্রণেতৃগণ বুঝিয়াছিলেন এমন জরুরী অবস্থা আসিতে পারে, যাহার মোকাবিলা করিবার জন্য মৌলিক অধিকারগুলি সাময়িক

ভাবে স্থগিত রাখা প্রয়োজন হইতে পারে। এই জন্য 358 ও 359 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে 19 ধারাতে যে সকল অধিকার বর্ণিত হইয়াছে তাহা জরুরীকাল থাকা অবস্থায় স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

মৌলিক অধিকারের সংশোধন

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 368 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়টি বা তাহার যে কোন অংশ সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এ বিষয়ে দারুণ মতভেদ দেখা দিয়াছে। যাহারা বিশ্বাস করেন যে পার্লামেণ্টের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়টি সংশোধন করিবার ক্ষমতা সংবিধানে দেওয়া হয় নাই, তাহারা বলেন যে এই বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ অতি স্পষ্ট। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের অন্তর্গত সংবিধানের 13 (2) ধারাতেই এই কথা লিখিত হইয়াছে। ধারাটি এইরূপ "The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of its contravention, be void". ইহার সার সংক্ষেপ এইরূপ: যদি কোন আইন দ্বারা মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয়, তাহা হইলে সেই আইন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। 1953 সালে সুপ্রসিদ্ধ গোলকনাথ মোকদ্দমায় এই রায় দেওয়া হয়। সুতরাং সংসদের মৌলিক অধিকার বিষয়ক সংবিধানের অনুশাসন পরিবর্তন করার কোন অধিকার নাই। সুপ্রীমকোর্ট গোলকনাথ মোকদ্দমায়, এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। অন্য পক্ষে যাহারা মনে করেন যে সংবিধানে পার্লামেণ্টকে মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার সংশোধন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহারা বলেন যে 368 ধারায় মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে কোন বাধা-নিষেধ উল্লেখ করা হয় নাই। ঐ ধারায় বলা হইয়াছে যে, লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রতিকক্ষে যত সদস্য তাহার প্রত্যেকটির অর্ধেকের বেশী সদস্য যদি সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন, এবং প্রতিকক্ষে যাহারা ভোট দিবেন তাহাদের দুই-তৃতীয়াংশ যদি সংশোধন সমর্থন করেন তাহা হইলেই সংবিধান সংশোধিত হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এই শর্ত পূরণ ব্যতীত কতকগুলি ক্ষেত্রে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অর্ধেকের বেশী ভাগের সমর্থনও প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহার ভিতর মৌলিক অধিকারের কথা নাই। সুতরাং সংসদ কর্তৃক প্রথমোক্ত নিয়ম পালিত হইলেই মৌলিক অধিকারও সংশোধিত হইতে পারে।

যাহারা বলেন যে সংবিধানের 13 (2) ধারা মৌলিক অধিকার

সংশোধনের বিরুদ্ধে যায়, তাহাদের যুক্তির উত্তরে বলা হইয়াছে যে 13 (2) ধারায় যে Law বা আইনের উল্লেখ আছে, তাহা কেবলমাত্র সাধারণ আইন (ordinary legislation) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সাংবিধানিক আইন বা constitutional law সম্বন্ধে বলা হয় নাই।. সুতরাং 368 ধারার বিধান যদি মানিয়া লইয়া পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার সংশোধন করে তাহা হইলে ঐ সংশোধন সাংবিধানিক আইন হিসাবেই গণ্য হইবে এবং 13 (2) ধারার বাধা-নিষেধের গণ্ডিতে পড়িবে না। 1952 সালে শঙ্করীপ্রসাদ মোকদ্দমায়[1] ও সজ্জন সিং-এর মামলায় (1955)[2] সুপ্রীমকোর্ট তাই রায় দান করিয়াছিলেন যে, পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয় সংসদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় অধ্যায়টি সংশোধন করিবার ক্ষমতা সংবিধানসম্মত। কিন্তু গোলকনাথ মোকদ্দমার 1967[3] সালে প্রদত্ত রায়ে সুপ্রীমকোর্ট বিপরীত কথা বলিলেন। তাহারা বলিলেন যে কেন্দ্রীয় সংসদের মৌলিক অধিকার সম্বন্ধীয় কোন পরিবর্তন করিবার অধিকার নাই। মৌলিক অধিকার অক্ষয় ও অব্যয়।

1971 সালের চতুর্বিংশতিতম সংবিধান সংশোধন বিল দ্বারা সংবিধানের 13 (2) ও 368 ধারাদ্বয় পরিবর্তিত হয়। এই দুইটি পরিবর্তনের দ্বারা পার্লামেণ্ট সংবিধানের মৌলিক অধিকার শীর্ষক তৃতীয় ভাগের অন্তর্গত যে কোন অধিকার সংশোধন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। চতুর্বিংশতিতম সংবিধান সংশোধন দ্বারা আরও বিধান করা হয় যে 368 ধারা অনুযায়ী সংবিধান সংশোধিত হইলে রাষ্ট্রপতি সেই সংশোধক বিলে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন। এই বিষয়ে তাঁহার নিজস্ব মতামতের কোন স্থান থাকিবে না। তদনুযায়ী 1953 সালে কেন্দ্রীয় সংসদ 368 ধারা অনুযায়ী মৌলিক অধিকার শীর্ষক অধ্যায়ের 31 ধারাটি সংশোধন করে। এই সংশোধিত আইন সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করিবার দাবিতে সুপ্রীমকোর্টে পুনরায় মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছিল। সুপ্রীমকোর্ট এই মোকদ্দমার দীর্ঘ শুনানীর পর রায় দিয়াছেন যে 368 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত যে কোন ধারা সংশোধন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এই মোকদ্দমা His Holiness Keshabananda Bharati vs the State of Kerala and Another, (1953) বলিয়া পরিচিত।

মৌলিক অধিকার সমূহ

ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীবিভাগটি খুবই যুক্তি সঙ্গত। (1) সাম্যের অধিকার ; (2) স্বাধীনতার অধিকার ; (3) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ; (4) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ; (4) সংস্কৃতি ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় অধিকার ; (6) সম্পত্তির অধিকার ; (7) অধিকার রক্ষণোপযোগী ন্যায়ানুগ পন্থা বিষয়ক অধিকার।

স্বাধীনতা ও সাম্যের যে বাণী সংবিধানের মুখবন্ধে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, মৌলিক অধিকার সমূহ তাহারই বিস্তারিত প্রকাশ। যে সকল অধিকার স্বীকৃত হইলে জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সাম্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে তাহাই বিবৃত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, কেবল মাত্র অধিকারগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ দ্বারা অধিকার নাগরিকগণের করায়ত্ত হয় না ; এই জন্য রাষ্ট্রের সকল বিভাগের সমবেত সতর্কতা ও কর্তব্য সাধন প্রয়োজন। প্রশাসনিক বিভাগ ও আইন বিভাগকে জনগণের অধিকারের সতর্ক প্রহরী হিসাবে কাজ করিতে হইবে। এইরূপ না হইলে মৌলিক অধিকার কোনক্রমেই রক্ষিত হইতে পারে না। এমন অনেক দেশ আছে যেখানে অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু দলীয় একনায়কত্ব থাকিবার দরুন সেই অধিকারগুলি কার্যকর হইয়া নাগরিকগণের জীবনে, কতকগুলি ক্ষেত্রে, স্বাধীনতা ও সাম্য আনিয়া দেয় নাই।

সাম্যের অধিকার

সাম্যের অধিকার (Rights to Equality) সংবিধানের—14, 15, 16, 17, 18 ধারা।

সংবিধানের 14 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র ভারতীয় এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে আইনের ক্ষেত্রে সাম্য ও সমান ভাবে আইন কর্তৃক সংরক্ষিত হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে এই ধারার মধ্যে আইনের ক্ষেত্রে সাম্য (equality before law) এবং সমান ভাবে আইন কর্তৃক রক্ষা (equal protection of the law) দুইটি কথাই পৃথক ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথমটি ইংল্যাণ্ডের কমন্ ল' (Common Law) হইতে গৃহীত ; দ্বিতীয় কথাটি আমেরিকার সংবিধান হইতে আনীত। দুইটির লক্ষ্য একই ; দুইটির উদ্দেশ্য মুখবন্ধের 'equality of status and opportunity' বা রাষ্ট্রে সকল নাগরিকের

সমমর্যাদার অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার সাম্য প্রতিষ্ঠা। কূটতার্কিকেরা বলিয়াছেন যে প্রথমটি নেতিবাচক; দ্বিতীয়টি তাহা নহে। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করা কঠিন; কারণ ঠিক বিপরীত ব্যাখ্যা করাও অসমীচীন হইবে না।

সুপ্রীমকোর্ট 1950 সালে চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন মোকদ্দমায় সংবিধানের সাম্য সংক্রান্ত চৌদ্দ ধারায় নিহিত অর্থ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া চারটি নীতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (1) সমতার অর্থ হইতেছে সমাবস্থায় অবস্থিত সকল ব্যক্তিগণের উপর একই প্রকার আইনানুগ ব্যবহার; (2) রাষ্ট্রের যুক্তিযুক্তভাবে ব্যক্তিবর্গের শ্রেণীবিভাগ করিবার অধিকার; (3) যদি আইন প্রণীত হয় তাহা হইলে ঐ আইন যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রথমতঃ ধরিয়া লইতে হইবে; (4) যাহারা উহার বিরোধিতা করিবে তাহাদেরই বিচারালয়ে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ঐ আইন চৌদ্দ ধারায় উল্লিখিত সাম্যনীতির পরিপন্থী। সাম্য নীতি ভঙ্গ করিয়া সমাবস্থায় অবস্থিত একজনের প্রতি একপ্রকার ব্যবহার, অন্যের প্রতি অন্যরূপ ব্যবহার সংবিধান বিরোধী। এই নীতিই চৌদ্দ ধারার মূল বক্তব্য। সংবিধানের পনের, ষোল, সতের বা আঠারো ধারা দ্বারা সমানাধিকার নীতি বিস্তারিত করা হইয়াছে এবং কতকগুলি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে। পনের ধারায় বলা হইয়াছে যে ধর্ম, জাতি (race), বর্ণ (caste), স্ত্রী পুরুষভেদ বা জন্মস্থান, এই কয়টির বিভেদ দরুন, কাহারও প্রতি সমাচরণের নীতি ভঙ্গ করা চলিবে না। ইহা ব্যতীত উপরোক্ত যে কোন কারণে কোন নাগরিককে দোকান, হোটেল, কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা বা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন স্থানে (যাহাতে রাষ্ট্রের অর্থ কিছুটা ব্যয়িত হইয়াছে) প্রবেশাধিকার বা ব্যবহার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। কিন্তু পনের ধারায় ইহাও বলা হইয়াছে নারী বা শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলে তাহা বে-আইনী হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক বা শিক্ষাগত ভাবে অনুন্নত ও তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসীদের উন্নতিমূলক বিশেষ ব্যবস্থাও সংবিধান বহির্ভূত বলিয়া গণ্য হইবে না।

ষোল নং ধারায় রাষ্ট্রের অধীনস্থ নিয়োগাদির ক্ষেত্রে আইনের সমক্ষে সাম্য নীতি কিভাবে প্রযুক্ত হইবে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে নাগরিকে নাগরিকে পার্থক্য করা যাইবে না। ধর্ম, জাতি (race), স্ত্রীপুরুষভেদ, বংশধারা (descent), বর্ণ (caste) জন্মস্থান বা বাসস্থানের ভিত্তিতে পার্থক্যমূলক ব্যবহার সংবিধান বহির্ভূত। ইহার ব্যতিক্রম আছে। যদি দেখা যায় যে রাষ্ট্রের কোন বিশেষ অনুন্নত শ্রেণী

রাষ্ট্রীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে সংখ্যার অনুপাতে পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তাহাদের জন্য চাকুরী সংরক্ষিত করা সংবিধানসম্মত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সংবিধানের সতের ধারায় অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। এই ধারাটির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে একটি অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয় নাই সত্য। কারণ ধারাটি নেতিবাচক। অস্পৃশ্যতা ভারতে আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে এবং সেইজন্য তাহাদিগকে সর্বক্ষেত্রে সাম্যের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইতেছে। অস্পৃশ্যতা নিষিদ্ধকরণের দ্বারা যাহারা পূর্বে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইতেন তাহারা আইনের সমক্ষে সাম্যের অধিকারী হইলেন। সুতরাং এই ধারাটির দ্বারা পরোক্ষভাবে একটি অধিকার সৃষ্টি হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সংসদে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন (Untouchability Offences Act, 1955) 1955 সালে পাশ করা হয়। এই আইনদ্বারা অস্পৃশ্যতাভিত্তিক সর্বপ্রকার কার্যাবলীর জন্য অস্পৃশ্যতা আচরণকারীগণের শাস্তির বিধান লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সংবিধানের আঠারো ধারায় নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রসুলভ সাম্য প্রতিষ্ঠাকল্পে বলা হইয়াছে যে, কোন ভারতীয় নাগরিক দেশীয় বা বিদেশীয় পদবী বা উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু সামরিক বা শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক উপাধির ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না। এখানে স্মরণ করা প্রয়োজন যে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা সত্বেও ভারতের রাষ্ট্রপতি, ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী এই চারটি উপাধি বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বলা হয় যে এই সকল সম্মান উপাধি নহে, কেবল গুণপণার স্বীকৃতি। কিন্তু এই মত অনেকে গ্রহণ করেন নাই। তাহারা বলিয়াছেন যে এই সকল সম্মান দান দ্বারা নাগরিকদের মধ্যে সাংবিধানিক সাম্যনীতি আইনগতভাবে বিঘ্নিত না হইলেও নীতিগতভাবে লঙ্ঘিত হইয়াছে।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বস্তু। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্স-এ এই স্বাধীনতার অধিকার লইয়াই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং সংগ্রামের ভিতর দিয়া ঐ সকল দেশের জনগণ এই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ যুগে এই অমূল্য অধিকারটি বারবার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। স্বাধীনতার যুদ্ধে যাহারা নিজেদের উৎসর্গ করিয়াছিলেন শুধু তাহাদের ক্ষেত্রে নহে, সকল নাগরিকের পক্ষেই

স্বাধীনতার অধিকার প্রায়শঃ দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছিল। সংবিধান পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে নিজ নিজ জীবনে স্বাধীনতার অধিকার হইতে অল্পবিস্তর বঞ্চিত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে, প্রেস আইন, ফৌজদারী বিধি সংশোধক আইন, ভারতরক্ষা আইন, রাজদ্রোহ দমনাত্মক আইন প্রভৃতি আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাই যখন মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে সংবিধান পরিষদে আলোচনা সুরু হইল, তখন স্বাধীনতার অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার সমূহ সংরক্ষণের জন্য সকলেই সোচ্চার হইয়া উঠিলেন। এই জন্যই সংবিধানের ভূমিকায় (Preamble) স্বাধীনতার অধিকারকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং লিখিত হইয়াছে যে অন্যান্য অধিকার সমেত চিন্তা প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনা পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। স্বাধীনতার অধিকারটিকে সংবিধানের উনিশ ধারা হইতে বাইশ ধারা পর্যন্ত বিস্তারিত করা হইয়াছে। এই অধিকারগুলিকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, সাধারণ স্বাধীনতার অধিকার সমূহ। ইহা উনিশ ধারায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যেমন, মত প্রকাশের অধিকার, নিরস্ত্রভাবে সভায় মিলিত হইবার অধিকার প্রভৃতি। দ্বিতীয়তঃ, জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত অধিকার, যাহা কুড়ি ধারা হইতে বাইশ ধারা পর্যন্ত বিবৃত করা হইয়াছে।

সাধারণ স্বাধীনতার অধিকারগুলি সাতটি বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে।

(ক) বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার (Freedom of speech and expression);

(খ) শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার (To assemble peaceably and without arms);

(গ) সমিতি বা ইউনিয়ন সংগঠনের অধিকার (To form associations and unions);

(ঘ) ভারতীয় ভূ-খণ্ডে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবার অধিকার (To move freely throughout the territory of India);

(ঙ) ভারতের যে কোন স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাস করিবার অধিকার (To reside and settle in any part of the territory of India);

(চ) সম্পত্তি অর্জন, তাহার উপর অধিকার- স্থাপন ও তাহা হস্তান্তর করিবার অধিকার (To acquire, hold and dispose of property);

(ছ) আপন ইচ্ছানুযায়ী বৃত্তি ও উপজীবিকা গ্রহণ এবং যে কোন

ব্যবসা-বাণিজ্য চালাইবার অধিকার (To practise any profession or to carry on any occupation, or trade or business)।

যে সকল অধিকার উনিশ ধারা অনুযায়ী স্বীকৃত হইয়াছে তাহা ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ। এই সকল অধিকারগুলি যাহাতে সর্বাংশে রক্ষিত হয় সেইজন্য বিচারালয়কে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। বিচারালয় নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া সংবিধান স্বীকৃত অধিকারগুলির মর্যাদা রক্ষার জন্য তৎপর হয়। সুপ্রীমকোর্টের বিভিন্ন রায়ের মাধ্যমে এই অধিকারগুলির অর্থ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টিকে বিশদ করা যাইতে পারে। 1950 সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য নামক মোকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রায়ে সংবিধান দ্বারা ভারতের নাগরিকগণকে সর্বত্র অবাধভাবে চলাফেরা, বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্য করার যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মন্তব্য করেন, "What the constitution emphasises upon by guaranteeing these rights is that the whole of India inspite of its being divided into a number of states is really one unit, so far as the citizens of the union are concerned." অর্থাৎ যদিও ভারতরাষ্ট্র নানা রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে, তথাপি ভারত অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ একটি মাত্র রাজনৈতিক সত্তা।

স্বাধীনতার অধিকারগুলির সীমাবদ্ধতা

সংবিধানে সযত্নে স্বাধীনতার অধিকারগুলি বিবৃত হইয়াছে এবং কিরূপে ঐ স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে তাহার আইনগত ব্যবস্থাও সংবিধানেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নকারীগণ বুঝিয়াছিলেন যে কোন স্বাধীনতাই সম্পূর্ণ অবাধ এবং নিরঙ্কুশ হইতে পারে না, কারণ অবাধ স্বাধীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করিতে পারে। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ বিষয়টি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন: There cannot be any such thing as absolute or uncontrolled liberty wholly freed from restraint, for that would lead to anarchy and disorder." (A. K. Gopalan. vs. State of Madras, 1950)[1]

---

1 A. K. Gopalan vs the State of Madras: S. C. R., 1950, Vol. I, Parts II and III—April aud May, 1950

অর্থাৎ অব্যয় ও অবাধ স্বাধীনতা বলিয়া কিছু থাকিতে পারেনা, কারণ, *অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এই মন্তব্যের মধ্যে সত্য নিহিত আছে- সন্দেহ নাই, কিন্তু ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে প্রশাসনযন্ত্রের হস্তে অধিকারগুলি সঙ্কুচিত করিবার অত্যধিক ক্ষমতা প্রদান* করিলে অধিকারসমূহ কিছু পরিমাণ নিরর্থক হইয়া যাইতে পারে। তাহা হইলে সংবিধানের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এইস্থানে এই সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থার সহিত ভারতীয় ব্যবস্থার তুলনা করা যাইতে পারে। মার্কিণ মুলুকে অধিকারসমূহ সংবিধানে লিখিত হইয়াছে কিন্তু তাহা কোনভাবে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, যেমন ভারতীয় সংবিধানে করা হইয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে বাধানিষেধগুলি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। সুপ্রীমকোর্ট বাধা-নিষেধগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকেন। মার্কিণ সুপ্রীমকোর্ট এই সূত্রে বলিয়াছে যে, রাষ্ট্র ও সমাজের কল্যাণে সরকার প্রশাসন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারে এবং এইজন্য সরকার কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধ সঙ্গত হইতেও পারে, কিন্তু এই উদ্দেশ্যে সরকারের ব্যবহার ও কৃতকর্ম সংবিধান সম্মত হইয়াছে কিনা, তাহা একমাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই বিচার করিবার অধিকার আছে। Due process of Law বা আইনানুযায়ী ন্যায়প্রথা নামক সুপ্রসিদ্ধ নীতির প্রয়োগে আমেরিকার সুপ্রীমকোর্টই তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অধিকারী।

(সংবিধানের উনিশের এক ধারায় অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ এবং উনিশের দুই ধারাতে বাধানিষেধগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে।)

বাক্-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা (Freedom of Speech and Expression)

19 (1) ক

সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতি পতঞ্জলি শাস্ত্রী মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (1950) মোকদ্দমায় রায় দান কালে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহাতে গণতন্ত্রের পক্ষে বাক্-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার অপরিহার্যতা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন :

"·····freedom of speech and of the press lay at the foundation of all democratic organisations, for without free political discussion no public education, so essential for the proper functioning of the processes of popular Government, is possible." *অর্থাৎ, বাক্‌-স্বাধীনতা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা গণতন্ত্রের গোড়ার* কথা ; কারণ গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আলোচনা তাহা ব্যতীত সম্ভব হয় না।

অন্য পক্ষে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাক্‌-স্বাধীনতা তথা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে নিরঙ্কুশ হইতে পারে না। এইজন্য ভারতীয় সংবিধানে বাক্‌-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে কিয়ৎ-পরিমাণে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে।

বাক্‌-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা

বাক্‌-স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ে বর্তমান সংবিধানে আটটি বাধানিষেধ আরোপিত হইয়াছে। অর্থাৎ যে সকল উদ্দেশ্যে এই স্বাধীনতাটি আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত তাহা নিম্নলিখিত রূপ :

(1) ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা ;
(2) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা ;
(3) বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা ;
(4) জনশৃঙ্খলা রক্ষা ;
(5) শ্লীলতা বা নীতি-ধর্ম রক্ষা ;
(6) বিচারালয়ের অবমাননা নিবারণ ;
(7) মানহানি নিবারণ এবং
(8) অপরাধে প্ররোচনা দান নিবারণ।

এই স্থলে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে মূল সংবিধানে কুৎসা (libel) মিথ্যা নিন্দা (slander), মানহানি, বিচারালয়ের অবমাননা, অশ্লীলতা, নৈতিক ধর্ম বিরোধী কার্যাবলী এবং যে সকল কাজ দ্বারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইতে পারে বা রাষ্ট্র ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে— এই কয়টি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার উপর যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া বাধানিষেধ আরোপ করার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু যখন সংবিধান প্রচলিত হইতে থাকিল তখন দেখা গেল যে বিধিনিষেধের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ফাঁক রহিয়া গিয়াছে।

ইহার সুযোগ লইয়া কেহ কেহ এমন সকল কার্যে লিপ্ত হইতেছেন যাহা রাষ্ট্র ও জনসাধারণের পক্ষে হানিজনক। এই কারণে 1951 সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধক আইন বা (Constitution : First Amendment Act, 1951) এবং সংবিধানের ষোড়শ সংশোধক আইন বা (Constitution : Sixteenth Amendment Act, 1963) দ্বারা 19(2) ধারাকে পরিবর্তিত আকার দেওয়া হইয়াছে।

উপরোক্ত দুইটি সংশোধনের দ্বারা রাষ্ট্রকে বাক্‌স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়নের বর্ধিত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা 19 ধারার বাক্‌ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে রাষ্ট্র বিধিনিষেধ মূলক যুক্তিযুক্ত আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী। এই ক্ষমতানুযায়ী প্রণীত কোন আইন সংবিধান সম্মত কিনা তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারালয়কেই দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, প্রণীত আইন বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ন্যায্যভাবে প্রযুক্ত হইতেছে কিনা, তাহাও বিচার করিবার অধিকার বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত আছে। সুতরাং এই আইনের দ্বারা অন্যায় ভাবে বাক্‌-স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হইবার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে।

মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মৌলিক অধিকার সমূহের মধ্যে যেরূপ স্পষ্টভাবে ও পৃথকভাবে মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা উল্লিখিত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধানে তাহা নাই। পরোক্ষ-ভাবে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার অন্তর্গত করা হইয়াছে। এই বিষয়ে সংবিধান পরিষদে মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর এই বিষয়টি বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : "the Press has no special rights which are not to be given or which are not to be excercised by the citizens in his individual capacity. The editor of a Press or the manager of the Press are all citizens and, therefore, when they choose to write in newspaper, they are merely excercising their rights of expression and in my judgment, therefore, no special mention

is necessary for the freedom of the Press at all."[1] অর্থাৎ কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক বা মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ সাধারণ নাগরিক-মাত্র। সেই হিসাবে তাহারা সাধারণ নাগরিকের অধিকার লাভ করিবার অধিকারী। এই কারণে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্র তাহারা স্বাধীন নাগরিক হিসাবে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারেন। সুতরাং সংবিধানে পৃথকভাবে সংবাদপত্র বা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংবিধান পরিষদে ডঃ আম্বেদকরের এই যুক্তি গৃহীত হইয়াছিল। সত্যই এই যুক্তির মধ্যে সারবত্তা আছে। রমেশ থাপার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মোকদ্দমাটিতে (1950) সুপ্রীম কোর্টের নিকট সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধিকার রক্ষারই আবেদন করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট যে রায় দান করিয়াছিলেন তাহা হইতে বোঝা যায় যে সুপ্রীম কোর্ট মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে মত প্রকাশের অধিকারের অংশীভূত বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। সুতরাং মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিষয়ক অধিকারটি 19(1)(ক) ধারা অনুযায়ী সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত আছে এবং ইহার বাধানিষেধ 19(2) ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাই মন্তব্য করা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে সংবিধান প্রণেতৃগণ সুষ্ঠু সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন।

শান্তিপূর্ণভাবে এবং নিরস্ত্র হইয়া সমবেত হইবার অধিকার
(To assemble peaceably and without arms)
19 (1) (খ) ও 19 (3) ধারা

বাক্ স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সহিত শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র হইয়া সভায় মিলিত হওয়া এবং মিছিল, সমাবেশ প্রভৃতিতে যোগদান করিবার অধিকার অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য বা অন্য যে কোন সদুদ্দেশ্যে নিরস্ত্র ভাবে সমবেত হইয়া মত প্রকাশ করিতে না পারিলে গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়া পড়ে। যে সকল দেশে একনায়কত্ব প্রচলিত, সে সমস্ত দেশে সরকার বিরোধী সমাবেশ শক্তি প্রয়োগে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়। স্বাধীনতার অধিকারকে সত্যে পরিণত করিতে হইলে নাগরিকগণের এই অধিকারটিকে সযত্নে রক্ষা করা আবশ্যক। কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই অধিকারটির বিষয়ে তিনটি শর্ত আরোপ করা হইয়াছে। ইহার প্রথম দুইটি শর্ত 19 (1) (খ) ধারায় উল্লিখিত আছে। প্রথমতঃ, সভাসমিতিতে সমবেত হইতে হইলে বা শোভাযাত্রা বাহির করিতে

1 Constituent Assembly Debates: VII, p. 79-80.

হইলে শান্তিপূর্ণ ভাবে তাহা করা প্রয়োজন ; দ্বিতীয়তঃ, নিরস্ত্র হইয়াই সভায় বা মিছিলে যোগদান করিতে হইবে। অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সভা বা মিছিল করিলে বা শান্তিপূর্ণ ভাবে সমবেত না হইলে জনশৃঙ্খলা বিপন্ন হইতে পারে। এই কারণেই এই দুইটি শর্ত আরোপিত হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, সংবিধানের 19 (3) ধারা অনুযায়ী জনশৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য, রাষ্ট্র এই বিষয়ে আইন দ্বারা যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধা নিষেধ সংবিধান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত কিনা বিচার করিবার ক্ষমতা বিচারালয়কে দেওয়া হইয়াছে।

সমিতি বা ইউনিয়ন গঠনের অধিকার
(To form Associations or Unions)
19 (1) (গ) এবং 19 (4)

এই অধিকার অনুসারে নাগরিকগণের যে কোন আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে সমিতি গঠন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই অধিকার বলে নানা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই ধারায় সর্বাপেক্ষা মূল্যবান যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহা হইল, শ্রমিকগণের ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংঘ গঠন করিবার অধিকার। বলা বাহুল্য যে শ্রমিক সমাজের কল্যাণের জন্য এই অধিকারটি মৌলিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। লক্ষণীয় যে পাশ্চাত্য জগতে এই অধিকারটি আধুনিক কালেই স্বীকৃত হইয়াছে। উনিশ শতকেও এই অধিকারটি নানা বাধা-নিষেধ দ্বারা খণ্ডিত ছিল। বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধের পর পাশ্চাত্য জগতে এই অধিকারটি নিরঙ্কুশভাবে বিধি-বদ্ধ হইয়াছে। ভারতের জাতীয় সংবিধানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকারটিকে মৌলিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করিবার অধিকারের অপব্যবহারও হইতে পারে এবং সমিতি বা ট্রেড ইউনিয়ন এমন সমস্ত কার্যাবলীর সহিত জড়িত হইতে পারে, যাহার দ্বারা জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ব্যাহত হয়। এই কারণেই সংবিধানের 19 (4) ধারায় রাষ্ট্রকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কিম্বা জনশৃঙ্খলা ও সদাচার রক্ষা কল্পে রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারে। বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্রকৃত বিধিনিষেধ সংবিধান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত কি না, তাহা স্থির করিবার ভার বিচারালয়ের হস্তে ন্যস্ত করা

হইয়াছে। যদি আরোপিত বিধিনিষেধ সংবিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূণ না হয় তাহা হইলে বিচারালয় সেই সকল বিধিনিষেধ সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।)

ভারতীয় ভূখণ্ডের যে কোন স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস এবং সম্পত্তি অর্জন, দখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার

✓ 19 (1) (ঘ) (ঙ) (চ) ও 19 (5) ধারা

(এই সকল অধিকারের স্বীকৃতি যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অপরিহার্য লক্ষণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যদি এই সমস্ত অধিকার না থাকে তাহা হইলে গণতন্ত্র মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু 19 (5) ধারা অনুযায়ী এই অধিকারটিও কথঞ্চিৎ পরিমাণে সীমিত হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থে বা তপশীলী আদিবাসীগণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র যে কোন যুক্তিসঙ্গত আইন করিয়া এই অধিকারগুলি সীমাবদ্ধ করিতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বিধি-নিষেধগুলি সংবিধান অনুসারে যুক্তিযুক্ত কি না তাহা বিচার করিবার ভার বিচারালয়কে দেওয়া হইয়াছে।) 1950 সালে খারে বনাম দিল্লীরাজ্য[1] মোকদ্দমায় হিন্দুমহাসভার সভাপতি খারেকে দিল্লীরাজ্য হইতে বহিষ্কারের হুকুম দেওয়া হইয়াছিল। তৎকালে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতেছিল এবং ঠিক সেই সময় হিন্দুমহাসভার সভাপতি এন. বি. খারে দিল্লীতে এমন আচরণ করিতেছিলেন যাহাতে দিল্লীর হিন্দু-মুসলমানগণের মধ্যে সংঘর্ষের সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। এই অবস্থায় উপরোক্ত হুকুমনামা জারি হয়। সুপ্রীমকোর্ট রায় দেন যে ঐরূপ অবস্থায় জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সরকার যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা সংবিধান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত।

সম্পত্তি অর্জন ও ভোগদখল ও ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত যে অধিকার 19 (চ) ধারাতে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারও ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে যদি রাষ্ট্র জনস্বার্থে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করে। 1951 সালে চিরঞ্জীলাল চৌধুরী বনাম ভারত ইউনিয়ন[2] মোকদ্দমায় সুপ্রীম-কোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। শোলাপুর স্পিনিং এ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানী (এমারজেন্সি প্রভিশনস্) এ্যাক্ট নামক 1950 সালের একটি আইনের বলে ঐ কোম্পানীটি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। চিরঞ্জীলাল এই আইনটিকে এবং এই আইন অনুসারে সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রায়ত্তকরণ সংবিধান বিরোধী

1 1930. S. C. R. 579
2 1950. S. C. R 869

বলিয়া দাবি করে। সুপ্রীমকোর্ট রায় দেয় যে রাষ্ট্র ঐ মিল মালিকদের মিল সম্বন্ধে অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য, শ্রমিকগণের স্বার্থ রক্ষা কল্পে এবং ঐ কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয়ের সুবিধার্থে যে আইন করিয়াছে এবং তদনুযায়ী যে কারখানাটি হুকুম দখল করিয়াছে তাহা সংবিধান অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত।

বৃত্তি, উপজীবিকা ও ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা—19 (1) (ছ) ও 19 (6)

বৃত্তি, উপজীবিকা ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বাধীনতা 19 (1) (ছ) ধারাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু 19 (6) ধারায় লিখিত হইয়াছে যে বৃত্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বৃত্তি উপযোগী যোগ্যতা ও গুণাবলী নির্ধারণ করিবার অধিকারী থাকিবে। ইহা ব্যতীত নাগরিক বা অনাগরিকের পরিবর্তে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে বা রাষ্ট্রকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে পরোক্ষ ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিবে। এইরূপ রাষ্ট্রায়ত্ত বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া বা আধা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করিতেও পারিবে। এতদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের উপযুক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও থাকিবে।

বলা বাহুল্য যে জনকল্যাণের জন্য ও দেশের অর্থনীতির সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রকে প্রদত্ত এই অধিকার সর্ব বিষয়ে যুক্তিযুক্ত। তেমনি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক বৃত্তি উপযোগী গুণাবলী অর্জনও অপরিহার্য। চিকিৎসা, স্থাপত্য, শিক্ষকতা প্রভৃতি বৃত্তিতে সেইজন্য গুণাবলী বা যোগ্যতা যদি অবান্তর বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সমূহ অকল্যাণের উদ্ভব হইবে সন্দেহ নাই। এই কারণে রাষ্ট্র কর্তৃক এই ক্ষমতা ব্যবহার অপরিহার্য।

আইনগত বিচার ও শাস্তিবিষয়ক অধিকার (20 ধারা)

20 ধারায়, অপরাধীকে খামখেয়ালী, অন্যায় বা অতিরিক্ত শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীর শাস্তি হইবে; তাহাতে কোন ন্যায্য আপত্তি উঠিতে পারে না। অগণতান্ত্রিক দেশে একনায়কত্বের পরিবেশে অপরাধীর প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয় এবং তাহাকে অতিরিক্ত শাস্তি পাইতে হয়। ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানে চার প্রকারে অপরাধীকে এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (1) যখন কোন ব্যক্তি

অপরাধ করে তৎকালে প্রচলিত আইন বলেই তাহার বিচার হইতে পারে; অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পরবর্তী কালের প্রণীত আইন সেই অপরাধ বিচারে প্রযুক্ত হইতে পারে না। (2) অপরাধ যখন অনুষ্ঠিত হয় সেই সময়ে বলবৎ আইনে যে শাস্তির বিধান আছে তাহা হইতে অধিক শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া নিষিদ্ধ; (3) একই অপরাধের জন্য অপরাধীকে একাধিকবার শাস্তি দেওয়া সংবিধান বিরোধী। (4) অপরাধীকে নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য বাধ্য করাও সংবিধান বহির্ভূত। যদি কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী বিচারালয়ে শাস্তি পায়, তথাপি সেই ব্যক্তি একই অপরাধের জন্য তার অফিসে শাস্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাতে সংবিধান ভঙ্গ হয় না। (কারণ অফিসের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আদালতের বিচারের ফল নহে।)

জীবনের নিরাপত্তা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (21 ধারা)

(সংবিধানের 21 ধারাটি মাত্র আঠেরটি শব্দ সম্বলিত। অথচ এই ক্ষুদ্র ধারাটি অবলম্বন করিয়া সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটিতে এবং সংবিধান পরিষদে দারুণ মতভেদ উপস্থিত হয়। সংবিধান পরিষদে দীর্ঘতম আলোচনা হয় এই ধারাটি অবলম্বন করিয়া। ধারাটি এইরূপ: "No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law." অর্থাৎ কোন ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার হইতে কেবলমাত্র আইনগত প্রণালী অনুযায়ী বঞ্চিত হইতে পারে, অন্য কোন রূপে নহে। এই অধিকারটি গণতন্ত্রের একটি মূলীভূত বিষয়। সংবিধান পরিষদে পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব[1] ও শ্রী কে. এম. মুন্সী[2] প্রস্তাব করেন যে "procedure established by law" বাক্যাংশটির পরিবর্তে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে উল্লিখিত "due process of law" বাক্যাংশ ব্যবহার করা উচিত। 'procedure established by law' বলিলে আইন সভা বা সংসদের উপরই নিষেধ বিধি গঠন করিবার ভার থাকে। তাহা হইলে এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটি সংসদের বা আইন সভার সংখ্যা গরিষ্ঠের মর্জির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে ইহার ফলে দলীয় রাজনীতি এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারটিকে নিষেধ বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং ইহার দরুন জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। সেই জন্য বিচারালয়ের উপর ভার অর্পণ করাই উচিত। আবেদনকারীর জীবনের নিরাপত্তা এবং

1 Constitutional Assembly Debates : VII, p. 848
2 Constitutional Assembly Debates : VII, p. 851-53

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বে-আইনীভাবে ভঙ্গ করা হইয়াছে কি না, তাহা বিচারপতিগণই তাঁহাদের রায় মারফত বিচার করিবেন। অর্থাৎ বিচারপতিগণ আমেরিকার সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় সার্বজনীন প্রকৃতিদত্ত আইন বা Natural Justice-এর নীতি অনুযায়ী বিচার করিবেন। এই জন্য ভার্গব ও মুন্সী 'procedure established by law' এর পরিবর্তে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত 'due process of law সূত্রটি 21 ধারায় সংযোজন করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। শ্রীআল্লাদি কৃষ্ণ স্বামী আইয়ার[1] ও আরও অনেকে এই মতের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, মুষ্টিমেয় বিচারকদের উপর নির্ভর করার অর্থ তাঁহাদের সাময়িক খেয়াল খুসির উপর নির্ভর করা। Due process of Law বিভিন্ন বিচারকগোষ্ঠী বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং সংসদের ন্যায় প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের উপরই নিষেধ-বিধি গঠন করিবার ভার থাকা উচিত। সংবিধান পরিষদ শেষ পর্যন্ত procedure established by law সূত্রটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সূত্রটি 1946 সালের জাপানের সংবিধানের 31 ধারা হইতে ভারতীয় সংবিধান পরিষদ গ্রহণ করে।

সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি কানিয়া গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (1950)[2] মোকদ্দমায় procedure established by law সূত্রটির প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "Normally read, and without thinking of other constitutions, the expression 'procedure establlshed by the law must mean procedure prescribed by the law of the State. ...To read the word 'law' as meaning rules of natural justice will lead one to infinite difficulties because the rules of natural justice as regards procedure, are nowhere defined and in my opinion, the constitution cannot be read as laying down a vague standard." অর্থাৎ সাধারণভাবে বুঝিতে গেলে "আইনগত প্রণালীর" অর্থ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনই বুঝায়। এখানে 'আইনকে' "প্রকৃতি দত্ত আইন" বলিয়া ধরিয়া লইলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, কারণ সংবিধানের কোথাও "প্রকৃতিদত্ত আইনের" সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয় নাই। ঐ মোকদ্দমার রায়ে বিচারক পতঞ্জলি শাস্ত্রীও বলিয়াছেন, "I am unable to agree that the term law in Article 21 means the immutable and universal principles of natural justice." " 'Procedure established by law' must be taken to refer to procedure which has a statutory origin,

1 Constitutional Assembly Debates : VII, p. 853-54

2 1950. S. C. R. 88

for no procedure is known or can be said to have been established by such vague and uncertain concepts as the immutable and universal principles of natural justice. In my opinion law in Article 21, means 'positive or state-made-law'." অর্থাৎ, "21 ধারায় যে 'আইন' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ অপরিবর্তনীয়, সার্বজনীন, প্রকৃতিদত্ত আইন নহে। আইনগত প্রণালীর অর্থ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইনের প্রণালীই বুঝায়। কারণ প্রকৃতিদত্ত আইন বা natural law এর অর্থ অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট। সেই জন্য 21 ধারায় যে আইনের কথা বলা হইয়াছে তাহা রাষ্ট্র কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন ছাড়া কিছুই নহে।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে রাষ্ট্র যুক্তিযুক্ত আইন করিয়া ঐ অধিকারটি সীমাবদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রকৃত আইন সংবিধানসম্মত কি না, বিচার করিবার ভার বিচারালয়ের উপর ন্যস্ত আছে।

গ্রেপ্তার ও আটক সংক্রান্ত অধিকার (22 ধারা)

এই অধিকারটি ব্যক্তি-স্বাধীনতার অঙ্গীভূত। গণতন্ত্রে ইহার মূল্য অপরিসীম। স্বীকার করা যাইতে পারে যে শান্তি ও জনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা কল্পে সময়ে সময়ে শান্তিভঙ্গকারীকে বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীকে গ্রেপ্তার করা ও আটক করা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রেপ্তার ও আটক অসঙ্গতও হইতে পারে, মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা হইতে পারে। এইজন্য অন্যায় ও অসঙ্গত গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, যাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহাকে জানাইতে হইবে কি কারণে সে গ্রেপ্তার হইয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ, গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিকে আইনজীবির সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার দিতে হইবে এবং আইন জীবির দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকারও তাহার প্রাপ্য ; তৃতীয়তঃ, গ্রেপ্তারীকৃত ব্যক্তিকে 24 ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে এবং তাঁহার অনুমতি ব্যতীত ঐ ব্যক্তিকে আটক রাখা চলিবে না [22 (1) এবং (2) ধারা]। গ্রেপ্তার ও আটক সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি absolute বা নির্ব্যূঢ় নহে। দুইটি ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে। প্রথমতঃ, শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী এই আইনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে ; দ্বিতীয়তঃ, নিবর্তনমূলক আইনে যাহাকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হইয়াছে তাহার ক্ষেত্রেও এই আইন প্রযুক্ত হইবে

না। সংবিধান পরিষদে প্রথম ব্যতিক্রমটি সহজেই গৃহীত হয়। কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে চিন্তনীয়, এজন্য যদি ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেরূপ না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু নিবর্তনমূলক আইন সম্বন্ধে সংবিধান পরিষদের তীব্র বিতর্ক প্রচণ্ড উত্তাপের সৃষ্টি করে। কিন্তু বিতর্কের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে উহা পাশ হইয়া যায়।)

নিবর্তনমূলক আটক আইন

কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যে আইনের দ্বারা বিনা বিচারে কেবল মাত্র সন্দেহের বশে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করিতে পারে তাহাকে নিবর্তনমূলক আটক আইন বলে। অপরাধ হইতে নিবর্তিত করিবার জন্যই এই আইন প্রণীত হয়। কোন ব্যক্তিকে আটক করিবার জন্য সাধারণতঃ বিচারালয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতে হয় এবং বিচারকের মতে অপরাধ প্রমাণিত হইলে অপরাধীকে আটক করা হয়। কিন্তু নিবর্তনমূলক আটক আইনের বলে সরকার সরাসরি গ্রেপ্তার ও আটক করিলে ইহার কিছুই প্রয়োজন হয় না। নিম্নলিখিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কারণে কেন্দ্রীয় সংসদ নিবর্তন আটক আইন করিবার অধিকারী:— (ইউনিয়ন তালিকা, দফা 9)

(1) প্রতিরক্ষা; (2) বৈদেশিক সম্পর্ক; (3) ভারতের নিরাপত্তা। এই বিষয়গুলি সংবিধানের সপ্তম তপশীলভুক্ত ইউনিয়ন তালিকার নবম দফায় লিখিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট কারণে কেন্দ্রীয় সংসদ এবং রাজ্য বিধান মণ্ডলী উভয়েই নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন করিতে পারে:

(1) অঙ্গ রাজ্যের নিরাপত্তা; (2) জনশৃঙ্খলা রক্ষা; (3) সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ রক্ষা; (4) সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কাজকর্ম অব্যাহত রাখা। এই বিষয়গুলি সংবিধানের সপ্তম তপশীলে যুগ্ম তালিকার তৃতীয় দফায় বিবৃত হইয়াছে।

নিবর্তনমূলক আটক আইন সম্বন্ধে সংবিধান কতকগুলি শর্ত আরোপ করিয়াছে। সেই সকল শর্তগুলি কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলিকে মানিয়া চলিতে হয়। (1) নিবর্তনমূলক আইনের বলে কোন ব্যক্তিকে তিন মাসের অধিক কাল আটক রাখা চলে না। (2) ঐ সময়ের অধিককাল কাহাকেও আটক রাখিতে হইলে ঐ তিন মাসের মধ্যে বিষয়টি হাইকোর্টের বিচারপতি হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তি দ্বারা গঠিত একটি

উপদেষ্টা বোর্ড-এর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। এই বোর্ড যদি মত দেন যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে তিন মাসের অধিককাল আটক রাখা যাইতে পারে, তাহা হইলেই আটক-কাল তিন মাসের বেশী হইতে পারে। (3) কিন্তু নিবর্তনমূলক আটক আইনে যদি আটক রাখিবার কালের উর্ধ্বসীমা উল্লিখিত থাকে, তাহা হইলে কোন ক্রমেই সেই উর্ধ্বসীমার বেশী কাহাকেও আটক রাখা চলে না। কিন্তু পার্লামেণ্টে আইন করিয়া কোন কোন শ্রেণীর আটক বন্দীদের তিন মাসের বেশী আটক রাখিতে পারে ; এই জন্য উপদেষ্টা বোর্ড-এর অনুকুল মত আবশ্যক হইবে না। (4) কোন ব্যক্তিকে আটক রাখিবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ তাহাকে জানাইতে হইবে এবং তাহাকে আটক হুকুমের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিবার সুযোগ দিতে হইবে। কিন্তু গ্রেপ্তারকারী কর্তৃপক্ষ (কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার) যদি মনে করে যে জনস্বার্থের জন্য কারণগুলি প্রকাশ করা অনুচিত তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কারণগুলি আটক ব্যক্তিকে না জানাইতেও পারেন।

নিবর্তনমূলক আটক আইন নীতিগতভাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিধ্বংসী। ব্রিটেনে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় এইরূপ আইন প্রবর্তিত হইয়া থাকে। 1914-18 সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Defence of the Realm Act, 1914, অনুযায়ী রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা কল্পে স্বরাষ্ট্র সচিবকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটকের ক্ষমতা দেওয়া হয়। 1939 সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও ব্রিটেনে Emergency Provisions Act, 1939 অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র সচিবকে অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় Internal Security Act নামক আইনটি পাশ হয়। এই আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতিকে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ ঘোষণা করিলে রাষ্ট্রের বিপদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি-বর্গকে বিনা বিচারে আটক করিবার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছিল। যুদ্ধকালে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেইরূপ অবস্থায় যে আইন সত্যই প্রয়োজন, শান্তির সময়ে সেইরূপ আইনের আবশ্যকতা নাই। এই কারণেই সংবিধান পরিষদের অধিবেশনে ও কেন্দ্রীয় সংসদে ও রাজ্য বিধানসভায় নিবর্তনমূলক আটক আইনের বিরোধিতা ঘটিয়াছে। 1950 সালে গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য[1] মোকদ্দমায় বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ মোকদ্দমার রায়দান কালে বলেন, ..."No country of the world that I am aware of has made this (preventive detention) an integral

1 1950. S. C. R. 88

part of their constitution as has been done in India. This is undoubtedly unfortunate...which cannot but be regarded as a most unwholesome encroachment upon the liberties of the people" অর্থাৎ কোন দেশে নিবর্তনমূলক আইন সংবিধানের অংশীভূত করা হয় নাই, ভারতে যেমন করা হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক; এই ব্যবস্থা জনগণের স্বাধীনতার উপর একটি অত্যন্ত অহিতকর আক্রমণ। কিন্তু 1950 সালের কেন্দ্রীয় নিবর্তনমূলক আইন সংবিধান অনুযায়ী প্রণীত হইয়াছিল। সুতরাং সুপ্রীমকোর্টকে ঐ আইনটি স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছিল। কারণ সংবিধানসম্মত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা সুপ্রীম-কোর্টকে দেওয়া হয় নাই।

অন্যপক্ষে সংবিধান পরিষদে ডঃ আম্বেদকর নিবর্তনমূলক আইনের সমর্থনে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে জনশৃঙ্খলা রক্ষা কল্পে এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য লইয়া নাশকতামূলক কার্যাবলীর মোকাবিলা করিবার জন্য প্রশাসন যন্ত্রকে শক্তিশালী করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ইঙ্গিত করেন যে দেশে অনেক দল ও ব্যক্তি আছে যাঁহারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রগতিতে বিশ্বাসী নহেন। এই অবস্থায় সরকারকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত স্থিরভাবে বিচার করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হইবে যে দেশে এখনও কয়েকটি দল আছে, যাঁহাদের আনুগত্য ততটা ভারতের প্রতি নহে, যতটা বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি। তাহারা একনায়কত্বে বিশ্বাসী, গণতন্ত্রে নহে। তাহারা রক্তক্ষয়ী বিপ্লব চায়, বিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রগতিতে তাহাদের আস্থা নাই। এই পরিস্থিতিও রাষ্ট্রের পক্ষে সঙ্কটজনক। এই পরিবেশে সরকারকে বিশেষ ক্ষমতা না দিলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা বিপন্ন হইতে পারে।

এ্যালান গ্লেডহিল নিবর্তনমূলক আটক অবস্থাবিশেষে সমর্থনযোগ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তিনি বলেন, "Preventive detention is an administrative necessity and is likely to cause less human suffering than might result from likely alternative measures to deal with persons who cannot be successfully prosecuted for their activities though they are a menace to public security and order."[1] "অর্থাৎ এমন সব মানুষ আছে যাহারা জন নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলার শত্রু কিন্তু প্রচলিত বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়া তাহাদের

1 Gledhill, Allan : Fundamental Rights in India p. 126.

ধরা সম্ভব নয় ; এমন সব মানুষকে নিবর্তনমূলক আটক আইন দ্বারা আটক করা যাইতে পারে। তাহা করিলে সর্বসাধারণ বড় ক্ষতি হইতে বাঁচিতে পারিবে।"

শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (23 ও 24 ধারা)

ভারতীয় সংবিধানের 23 ও 24 ধারায় শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 23 (1) ধারার দ্বারা মানুষ লইয়া ব্যবসা, বেগার ও অন্যভাবে জোর করিয়া মানুষকে খাটাইয়া লওয়া নিষিদ্ধ। আমেরিকার সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধন দ্বারা দাসত্ব প্রথা ও বলপূর্বক শ্রম আদায় নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভারতের সংবিধানভুক্ত 23 ধারাটিকে উহার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যাহারা 23 ধারার লিখিত বিধি লঙ্ঘন করিবে তাহাদিগকে আইনমত শাস্তি পাইতে হইবে। ফৌজদারী আইন (Criminal Procedure Code), ভারতীয় দণ্ডবিধি (Indian Penal Code) এবং আরও আইন আছে যাহার দ্বারা এই সকল অপরাধের জন্য শাস্তি বিধান করা যাইতে পারে। 23 ধারায় যে নীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহারই অনুসরণে বিভিন্ন রাজ্যে বেশ্যাবৃত্তির জন্য নারীসংগ্রহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে এবং মাদ্রাজে দেবদাসী প্রথার বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। 23 ধারাটির একটি ব্যতিক্রম আছে। 23 (2) ধারায় বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে, রাষ্ট্র ধর্ম, জাতি (race) ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রয়োজন হইলে বাধ্যতামূলকভাবে নাগরিক-গণকে জনসেবায় নিয়োজিত করিতে পারে। ইহাতে কোন বাধা নাই। এই নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার অধিকারী। যদি রাষ্ট্র আইন দ্বারা ব্যবস্থা করে যে বাধ্যতামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের ছয়মাস গ্রামসেবায় নিয়োজিত থাকিতে হইবে, তাহা হইলে সেই আইন 23 (2) ধারায় লিখিত নীতির বলে সংবিধানসম্মত বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

24 ধারায় চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন বালক বা বালিকাকে কোন কারখানা, খনি, অথবা বিপদের সম্ভাবনাময় কোন কাজে নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই সূত্রে রাষ্ট্রের নির্দেশমূলক নীতি অধ্যায়ের 45 ধারাটি স্মরণীয়। ঐ ধারাতে লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র ভারতীয় সংবিধান প্রথম প্রচলিত হইবার তারিখ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসরের নিম্নবয়স্ক সকল বালক-বালিকার জন্য বিনা বেতনে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করিবে। লক্ষণীয় যে 24 ধারাটি 45 ধারাটির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ। ইহা ব্যতীত এই সূত্রে ঐ অধ্যায়ের অন্তর্গত 39 (ঙ) ও 39 (ছ) ধারাও

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। ঐ দুইটি ধারায় সুকুমার বয়স্ক বালক-বালিকাদের অর্থনৈতিক শোষণ হইতে রক্ষা করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (25, 26, 27, 28 ধারা)

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নানা ধর্মসম্প্রদায় বসবাস করিয়াছে। সেই কালে ভারতবর্ষে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মচর্চার পূ´ স্বাধীনতা ছিল। এই ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য দেখা দেয় নাই। এইরূপ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের দেশে যে ধর্মীয় ও বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত হইবে তাহা খুবই স্বাভাবিক। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে সংবিধানের মুখবন্ধে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকগণের ধর্ম, বিশ্বাস ও উপাসনা পদ্ধতি বিষয়ে স্বাধীনতা সংরক্ষণ ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ("to secure to all its citizens ....liberty of faith, belief, and worship")। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা মুখবন্ধে লিখিত আদর্শেরই অনুপন্থী।

25 হইতে 28 ধারায় যে সকল নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হইয়া উঠে। (1) ভারতে সকল নাগরিক সমভাবে বিবেকের স্বাধীনতার অধিকারী ; (2) বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস পাশাপাশি থাকিবে এবং নাগরিকেরা সমভাবে নিজ নিজ ধর্মমত পোষণ করিবার স্বাধীনতা ভোগ করিবে ; (3) রাষ্ট্র ধর্মবিরোধী নহে, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষ ; অর্থাৎ রাষ্ট্র সমভাবে সকল ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করিবে কিন্তু রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকিবে না।

সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনতার অধিকার বলিতে তিনটি অধিকার বুঝায় : (1) যে কোন ধর্মমত অবলম্বন করিবার অধিকার ; (2) ধর্মমত অনুযায়ী আচার অনুষ্ঠান পালন করিবার অধিকার ; (3) ধর্ম মতানুযায়ী ধর্মপ্রচার করিবার অধিকার। সংবিধানে এই অধিকারগুলির কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে। জনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে, নীতিধর্ম বজায় রাখিবার জন্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষা কল্পে রাষ্ট্র যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে তাহা হইলে সেই ব্যবস্থা সংবিধান বিরোধী বলিয়া গণ্য হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় আচারের সহিত সংশ্লিষ্ট (ক) অর্থনীতি (খ) আয়-ব্যয় (finance) (গ) রাজনীতি এবং (ঘ) অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা বিষয়ে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করিতে পারে। বলাবাহুল্য, ঐ সম্বন্ধে যে সকল আইন পূর্বেই প্রচলিত আছে তাহাও প্রযুক্ত হইতে থাকিবে। তৃতীয়তঃ, হিন্দু, শিখ, জৈন ও বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সমাজকল্যাণ ও সংস্কার সাধনকল্পে রাষ্ট্র

আইন প্রণয়নের অধিকারী থাকিবে। ইহা ব্যতীত ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান সমূহের দ্বার শ্রেণী নির্বিশেষে উপরে উল্লিখিত সকল ধর্মাবলম্বীগণের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। কৃপাণ ব্যবহার করিবার অধিকারটি শিখদের ধর্মাচরণের অঙ্গ বলিয়া তাহাদিগকে কৃপাণ বহন (carry) করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 26 ধারা অনুযায়ী প্রতি ধর্মসম্প্রদায়ের নাগরিকগণকে ধর্মীয় ও দাতব্য সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা, পোষণ ও পরিচালনা করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি আইনানুসারে অর্জন, দখল ও পরিচালনের অধিকার সকল সম্প্রদায়ের জন্যই সংবিধান কর্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু নিয়ম করা হইয়াছে যে, জনশৃঙ্খলা, নীতিধর্ম ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন তাহারা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে। আরও বিধান করা হইয়াছে যে ধর্মাচরণ ও ধর্ম পরিচালনের জন্য কোন ধর্ম সম্প্রদায়কে কোন প্রকার কর দিতে হইবে না।

ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধেও সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, এই প্রতিষ্ঠানগুলি যদি জনশৃঙ্খলা, সুনীতি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নিয়মাদি মানিয়া চলে, তবে ধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু যে সকল প্রতিষ্ঠান আংশিকভাবে রাষ্ট্রের নিকট হইতে সাহায্য পায় সেই সকল প্রতিষ্ঠান-সমূহে ধর্ম শিক্ষা দিতে হইলে যে সকল ছাত্রকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইবে তাহাদের অভিভাবকগণের পূর্ব অনুমতি প্রয়োজন হয়। যদি কোন ছাত্রের অভিভাবক অনুমতি না দেন তাহা হইলে ঐ ছাত্রকে ধর্মশিক্ষা লইতে বাধ্য করা নিষিদ্ধ। আরও ব্যবস্থা হইয়াছে যে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে না। কারণ রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। কিন্তু যদি রাষ্ট্র পরিচালিত এমন কোন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকে, যাহা ধর্মীয় স্থায়ীবৃত্তি (endowment) বা ধর্মীয় গচ্ছিত সম্পত্তি (trust) ভিত্তিক, তাহা হইলে সেই প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে বাধা নাই।

সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (29 ও 30 ধারা)

ভারতীয় ভূখণ্ডে বা তাহার যে কোন অংশে বসবাসকারী নাগরিকগণকে তাহাদিগের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করিবার অধিকার সংবিধানে দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম, জাতি (race), বর্ণ, ভাষা প্রভৃতির যে কোন একটির অজুহাতে কোন নাগরিককে রাষ্ট্র পোষিত বা রাষ্ট্র হইতে

সাহায্য প্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সংবিধান বিরুদ্ধ। ভাষা বা ধর্মভিত্তিক সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনের অধিকারও সংবিধান কর্তৃক দেওয়া হইয়াছে। সর্বশেষে লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে আর্থিক সাহায্য দানের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান ভাষা বা ধর্মভিত্তিক সংখ্যালঘুগণ দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, এই কারণ দেখাইয়া অর্থসাহায্য দিতে প্রভেদমূলক ব্যবহার করিতে পারিবে না।

ভারতীয় সংবিধানে যেমন স্পষ্টতঃ সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংরক্ষিত হইয়াছে, তেমন আমেরিকার সংবিধানে নাই। ভারতীয় সংবিধানের 29 ও 30 ধারার সহিত ব্রহ্মদেশের, পশ্চিম জার্মাণীর ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানে। অনুরূপ ধারাগুলির তুলনা করা চলে। ব্রহ্মের সংবিধানের 22 ধারা, আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের 42 ধারা এবং পশ্চিম জার্মানীর সংবিধানস্থ 111 ধারা সংখ্যালঘুদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত রক্ষাকবচ। কিন্তু উপরোক্ত তিনটি সংবিধানে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা অনেকটা সংকীর্ণ, ভারতে তাহা ব্যাপক। ভারতে সংখ্যালঘুগণের শুধু ধর্ম নহে, ভাষা, বর্ণমালা এবং সংস্কৃতির ভিত্তিতেও অধিকারগুলি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সূত্রে সংবিধানের 347, 350, 350 A ও 350 B ধারা কয়টি উল্লেখযোগ্য।

সম্পত্তি বিষয়ক অধিকার (31, 31 (ক) 31 (খ) ও 31 (গ) ধারা)

সংবিধান পরিষদে সম্পত্তির অধিকার সম্বলিত 31 ধারাটিকে নানা মতানৈক্য, বিরুদ্ধতা ও তর্ক-বিতর্কের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। আলোচনার পর শেষপর্যায়ে যেরূপে ধারাটি গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও সংবিধান প্রচলিত হইবার এক বৎসরের মধ্যে 1951 সালে সংশোধিত হয়। তাহার পর 1955, 1964, 1971 এবং 1972 সালেও 31 ধারাটি সংশোধিত হইয়াছে। এই পাঁচটি সংশোধনের ফলে মূল 31 ধারাটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।

মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়ের 19 (1) (চ) ধারায় সম্পত্তির মালিককে সম্পত্তি অর্জন, ভোগদখল ও ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। 31 ধারায় এই অধিকারটির ব্যতিক্রম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র পুলিশ-রাষ্ট্র (Police State) নহে; ইহা কল্যাণ-রাষ্ট্র (Welfare State)। অর্থাৎ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য

নয়, সর্বপ্রকারে জন-কল্যাণ সাধনই আধুনিক রাষ্ট্রের নীতি। রাষ্ট্রের ও সমাজের প্রয়োজনে, জন-কল্যাণ সাধনের জন্য অনেক সময় ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ব্রিটেন, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে এইরূপ ক্ষমতা রাষ্ট্র হামেশাই ব্যবহার করিয়া থাকে। ভারতীয় সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রকে অনেকটা অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

31 ধারাকে কেন্দ্র করিয়া সংবিধান পরিষদে যেমন তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছিল তেমনি ঐ ধারায় প্রতিটি সংশোধন লইয়া আইন ও রাজনীতির বিতর্ক উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ কি? একদিকে দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মমত্ব ও অধিকারবোধ অত্যন্ত সুগভীর; অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুযায়ী সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার মানসিকতা সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের সংঘাত আজ দেশে দেখা দিয়াছে। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। 1936 সালে ফৈজপুর কংগ্রেস একটি প্রস্তাব মারফৎ পুরাতন শোষণ-ভিত্তিক ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার ("Antiqated and repressive land tenue and revenue system") আমূল পরিবর্তন করিয়া কৃষকদের প্রতি ন্যায় বিচার দাবি করিয়াছিল। জওহরলাল নেহেরু 31 ধারাটি সংবিধান পরিষদে উত্থাপন করিবার সময় এই কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস জমিদারী প্রথা রদ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি কংগ্রেসকে মানিয়া চলিতে হইবে।

31 ধারাটি সংবিধানে যে ভাবে প্রথমতঃ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল তাহা পাঁচটি সংশোধনের মধ্য দিয়া গুরুতররূপে পরিবর্তিত হইয়াছে। সম্পত্তি সম্বন্ধীয় অধিকার এই সকল সংশোধনের ফলে যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে তাহা এইরূপ :—

(1) কেবলমাত্র আইনগত ক্ষমতার ব্যবহার ব্যতীত কেহ সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে না।

(2) কেবলমাত্র জনসাধারণের প্রয়োজনের জন্যই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাইবে।

(3) সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইলে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

(4) এই ধারা অনুযায়ী যে আইন প্রণীত হইবে তাহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে: নিয়ম করিতে হইবে যে কোন সম্পত্তি অধিগ্রহণ করিতে হইলে, যে হুকুমনামা সম্পত্তির মালিককে দেওয়া হয় তাহাতে সম্পত্তির জন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় মোট টাকা, অথবা যে নীতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেয়, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(5) যে আইন প্রণীত হয়, তাহাতে ক্ষতিপূরণের যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পর্যাপ্ত নহে, এই যুক্তিতে ঐরূপ আইন আদালতের বিচারের বিষয়বস্তু হইবে না।

(6) সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণ সম্বন্ধীয় আইনে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আবশ্যক।

(7) 1951, 1953 এবং 1955 সালের সংশোধক আইন দ্বারা বিধান করা হয় যে, (ক) সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করিয়াছে বলিয়া বাতিল হইয়া যাইবে না। (খ) কোন ব্যক্তির জমির পরিমাণ যদি আইনদ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার নীচে থাকে তাহা হইলে ঐ জমি অধিগ্রহণের জন্য বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, তাহা অপেক্ষা কম হারে নহে।

(8) 1953 সালের সংশোধন দ্বারা স্থির হয় যে (ক) সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা অধিগ্রহণের জন্য যে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা যথোচিত নহে—এই যুক্তি গ্রাহ্য হইবে না। পূর্বে compensation বা ক্ষতিপূরণ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা তুলিয়া দিয়া, "an amount which may be fixed by such law" অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ যাহা আইনের দ্বারা ধার্য হইবে তাহাই যথোচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই বিষয়ে আদালতের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। (খ) কোন রাজ্যের যদি ভূমি-সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা কোন আইন দ্বারা ভবিষ্যতে কমাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে নূতন সীমার উর্ধে যে সব জমি থাকিবে তাহা রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণ করিতে হইলে বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। অর্থাৎ উপরোক্ত 7নং অনুচ্ছেদে যে নীতি লিখিত হইয়াছে, ইহার দ্বারা তাহার কিছুটা পরিবর্তিত করা হইল।

দেখা যাইতেছে পর পর পাঁচটি সংশোধনের মধ্য দিয়া সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধীয় 31 ধারাটি মূলগত ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। এখন সরকারকে সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণের জন্য সম্পত্তির বাজার দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। বস্তুতঃ ক্ষতিপূরণ কথাটি ঐ ধারা হইতে তুলিয়াই দেওয়া হইয়াছে। তাহার বদলে রাষ্ট্রকে আইনের দ্বারা দেয় অর্থের পরিমাণ স্থির করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এই নীতি সম্বন্ধে সংবিধান বিশেষজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ আইন-বিশারদ শ্রীএন্. এ. পাল্কিভালা প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারটিকে প্রায় বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ এখন নামমাত্র মূল্য দিয়া সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত বা অধিগ্রহণ আইনসঙ্গত করা হইয়াছে। অন্যপক্ষে বলা হইয়াছে যে

আধুনিক ভারতীয় কল্যাণ-রাষ্ট্রকে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া অত্যাবশ্যক। নতুবা সমাজের মঙ্গলসাধন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পরবর্তী-কালে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য ভারতরাষ্ট্রকে সমাজ-কল্যাণ কল্পে প্রথমতঃ বাধ্য হইয়া তাহার কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে হইয়াছে। পরে সমাজতন্ত্রের আদর্শ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়। 31 ধারাটির যে সকল সংশোধন হইয়াছে তাহাতে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয়যাত্রাই সূচিত হইতেছে।

মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার
(Right to Constitutional Remedies)—32 ধারা :

মৌলিক অধিকারসমূহ অর্থহীন হইয়া যায়, যদি সেই অধিকারগুলি রক্ষার্থে কোন ব্যবস্থা না থাকে। সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকর সংবিধান পরিষদে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে যদি কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করে সংবিধানের কোন্ ধারাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইলে তিনি উত্তর দিবেন যে, 32 ধারাটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপর্ণ। তিনি এই ধারাটিকে, "the very soul of the constitution and the very heart of it." অর্থাৎ "অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার ব্যবস্থা সম্বলিত 32 ধারাটিই সংবিধানের সারাংশ ও প্রাণ"। কারণ অধিকার ব্যাহত হইলে তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকিলে অধিকার একেবারেই মূল্যহীন ফাঁকা কথায় পরিণত হয়। তাই 32 ধারায় বিধান করা হইয়াছে যে যদি মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোন অধিকারের উপর আক্রমণ আসে এবং অধিকার ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে যাহার অধিকার ভঙ্গ হইয়াছে তাহার সুপ্রীমকোর্টের নিকট অধিকারগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দরখাস্ত করিবার অধিকার আছে। সুপ্রীমকোর্ট (সর্বোচ্চ আদালত) হাজিরকরণ (Habeas Corpus), প্রত্যক্ষ আজ্ঞা (Mandamus), নিষেধাজ্ঞা (Prohibition), অধিকার জিজ্ঞাসা (Quo Warranto), বিচার দলিল তলব (Certiorari) প্রভৃতির যে কোন একটি হুকুমনামা ক্ষেত্রবিশেষ বিবেচনা করিয়া উপযোগিতা অনুযায়ী জারি করিতে পারেন। এই হুকুমনামাগুলির পরিচয় "ভারতীয় বিচার ব্যবস্থা" শীর্ষক অধ্যায়ে সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা শীর্ষক আলোচনায় দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেণ্ট বা সংসদ এই ক্ষমতা আইন দ্বারা অন্য আদালতকেও দিতে পারেন। 32 ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টের উপরোক্ত ক্ষমতাগুলি রহিয়াছে। অধিকার ভঙ্গের

বিরুদ্ধে হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্ট, এই দুইটির যে কোন একটিতে আবেদন করা যাইতে পারে।

মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে সাংবিধানিক প্রতিকার সম্বন্ধে কয়েকটি ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে:

(1) প্রতিরক্ষা বাহিনী ও জনশৃঙ্খলা রক্ষী কর্মীদের ক্ষেত্রে কি পরিমাণে এই বিধি প্রযুক্ত হইবে তাহা পার্লামেণ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

(2) যদি কোথাও সামরিক আইন ঘোষিত হয় তাহা হইলে পার্লামেণ্ট বা সংসদ আইন করিয়া সামরিক কর্মীগণকে 32 ধারায় উল্লিখিত প্রতিকারাদির আওতা হইতে মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। ইন্‌ডেম্‌নিটি আইন-দ্বারা এইরূপ করা হইয়া থাকে।

(3) 359 ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা থাকা সময়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ-ঘোষণা করিয়া 32 ধারার প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর করিবার জন্য আবেদনের অধিকারটিকে স্থগিত করিয়া রাখিতে পারেন।

(4) 358 ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থা থাকাকালে 19 ধারায় বিধিবদ্ধ স্বাধীনতার অধিকার সমূহকে সীমিত বা লংঘন করিয়া সংসদ আইন প্রণয়ন করিতে পারে।

এই চারটি ব্যতিক্রমই সমর্থনযোগ্য। কারণ সাধারণ অবস্থায় যে সকল অধিকার মানিয়া লওয়া যায়, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্র ও জনসমাজের কল্যাণ ও নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে সেই অধিকার কিছুটা খর্ব করা প্রয়োজন হইতে পারে। জরুরী অবস্থার সুযোগ লইয়া আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয় শত্রুগণ অন্ধকার গোপন সুড়ঙ্গপথে দেশের সর্বনাশ সাধন করিতে নানা পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। অধিকার সংক্রান্ত সাধারণ আইন জরুরী অবস্থায় প্রচলিত থাকিলে এই সকল অনিষ্টকারীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাদের ষড়যন্ত্র নিষ্ফল করিয়া দিতে হইলে জরুরী ক্ষমতা আবশ্যক। তজ্জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজে আপৎকালীন অবস্থায় শাসন-যন্ত্রকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়া থাকে এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সীমিত করা হয়। ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশেও অনেকটা অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তাই 32 ধারায় যে সকল ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা শুধু আবশ্যক নহে, অপরিহার্যও বটে।

দ্বাদশ অধ্যায়
রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশ

ভারতের সংবিধানের মুখবন্ধে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়াচরণ, সুযোগের সমব্যবস্থা, মানবিক মর্যাদার সাম্যসাধন গণতান্ত্রিক ভারত রাষ্ট্রের আদর্শ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল আদর্শ সংবিধান প্রণয়নকালে সম্পূর্ণভাবে বিধিবদ্ধ ও রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনগ্রসরতা তাহার কারণ। সংবিধান পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে একই কারণে সরকারের পক্ষে মুখবন্ধে উল্লিখিত আদর্শগুলি অদূর ভবিষ্যতেও রূপায়িত করা সহজসাধ্য হইবে না। তথাপি তাঁহারা অনুভব করেন যে ঐ সকল আদর্শ অনুযায়ী সীমিতভাবে নূতন সমাজের একটি পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী কর্মপদ্ধতি দেশবাসী ও শাসনযন্ত্রের সম্মুখে উপস্থাপিত করার আবশ্যকতা আছে। দেশবাসী ঐ পরিকল্পনা হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করিবে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে তাহাদের প্রতিনিধিবর্গকে আদর্শ অনুযায়ী কার্যে প্রণোদিত করিবে। উপরন্তু ঐ পরিকল্পনা শাসনব্যবস্থার দিগদর্শকরূপে কাজ করিবে। এই উদ্দেশ্য লইয়াই রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশক চতুর্থ অংশটি সংবিধানে সংযোজিত হইয়াছে। রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ 37 হইতে 51 ধারায় বিবৃত করা হইয়াছে। এই অংশে যাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা কোন আদালত কার্যে পরিণত করিতে পারে না ; কিন্তু এই সকল নীতি দেশ শাসনের মূল নীতিরূপে গণ্য হইবে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে এই নীতিগুলি যথাসম্ভব আইনে পরিণত করা (37 ধারা)।

সংবিধান বর্ণিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশ

সংবিধানে লিখিত এই নীতিগুলি রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে, যথা, আর্থিক ও সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক নীতিসমূহ। এই জন্য 38 ধারায় সংক্ষেপে বলা হইয়াছে ; **"রাষ্ট্র চেষ্টিত থাকিবে জনগণের কল্যাণের জন্য এমন একটি সমাজ গঠন এবং সংরক্ষণ করিতে, যাহার দ্বারা সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়াচরণ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।"**

(I) **আর্থিক ও সামাজিকক্ষেত্রের নীতি নির্দেশ :** এই বিষয়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, নিম্নলিখিত আদর্শ লাভের উপযোগী কার্যকর নীতি অবলম্বন রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে :

(ক) দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ যেন এমনভাবে বণ্টিত হয় যাহাতে সর্বসাধারণের হিত সাধন হয়।

(খ) দেশের অর্থ ব্যবস্থা এমনভাবে না চলে, যাহার দ্বারা সর্বসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে, উৎপাদনের উপায় (Means of Production) এবং উৎপন্ন ধন মুষ্টিমেয় কয়েক জনের কুক্ষিগত হয়।

(গ) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের যেন পর্যাপ্ত জীবিকা উপার্জন করার অধিকার বজায় থাকে।

(ঘ) স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সকল কর্মী যেন সমান বেতন পায়।

(ঙ) স্ত্রী ও পুরুষ শ্রমিকদের স্বাস্থ্যও শক্তি এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের শৈশব ও কৈশোর যেন শোষণ ও অপব্যবহারের কবলে না পড়ে ; এবং আর্থিক দৈন্যের চাপে কাহাকেও যেন বয়স ও সামর্থ্যের অনুপযুক্ত কাজ করিতে বাধ্য হইতে না হয়।

(চ) রাষ্ট্রের আথিক সামর্থ্য অনুযায়ী যতটা সম্ভব যেন চেষ্টা করা হয়, যাহাতে নাগরিকদের কর্ম ও শিক্ষার অধিকার এবং বেকার অথবা বৃদ্ধ বা পীড়িত বা কর্মে অক্ষমতার দরুণ অভাবগ্রস্তদের সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকার বজায় থাকে।

(ছ) রাষ্ট্র যেন শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত এবং মানবোচিত ব্যবহার করে এবং প্রসূতি-কল্যাণের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।

(জ) আইন দ্বারা অথবা আর্থিক গঠনের পরিবর্তন দ্বারা রাষ্ট্র যেন চেষ্টা করে যাহাতে চাষী, মজুর ও অন্যান্য শ্রমিকেরা জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরী, সন্তোষজনক জীবন যাত্রার মান, এবং পূর্ণমাত্রায় অবসর ও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন উপভোগ করার সুযোগ পাইতে পারে।

(ঝ) ব্যক্তিগত মালিকানায় অথবা সমবায়িক ভিত্তিতে কুটির শিল্প গ্রাম অঞ্চলে বাড়ানো রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(ঞ) সংবিধান প্রবর্তনের দশ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র যেন চেষ্টা করে যাহাতে 14 বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক-বালিকাদের অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

(ট) যাহারা অনুন্নত শ্রেণীর মানুষ, বিশেষতঃ, যে সব জাতি এবং উপজাতি সংবিধানের তপশীলে (Schedule) উল্লিখিত, তাহাদের শিক্ষা ও

আর্থিক উন্নতির ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের সামাজিক অন্যায় ও শোষণ হইতে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(ঠ) সর্বসাধারণের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জীবনধারণের মান উন্নত করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য ; এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে নেশার জন্য মাদক দ্রব্য ও মাদক পানীয়ের ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে ; কিন্তু তাহা ঔষধ প্রস্তুতকার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

(ড) বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও পশুপালন প্রচলন করার নির্দেশের সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, দুগ্ধবতী গাভী অথবা লাঙল টানা গবাদি পশু হত্যা করা বন্ধ করিতে হইবে।

(2) **রাজনৈতিক বিষয়ঃ** সংবিধানের নীতি নির্দেশ এইরূপ :

(ক) স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তনের উদ্দেশে গ্রাম পঞ্চায়েৎ গঠন ও পঞ্চায়েৎগুলিকে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর পন্থা অবলম্বন করিবে।

(খ) শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক্ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(গ) পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে রাষ্ট্রের কর্তব্য হইবে—শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ন্যায়সম্মত ও সম্মানজনক সম্পর্ক বজায় রাখা, আন্তর্জাতিক আইন যাহাতে অনুসৃত হয় সেই চেষ্টা, এবং মধ্যস্থতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদ সমাধানের প্রথার প্রসার।

(ঘ) দেশের সর্বত্র একই দেওয়ানী আইন প্রবর্তন রাষ্ট্রের কর্তব্য।

(3) **সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রঃ** রাষ্ট্রনীতি নির্দেশ সংক্রান্ত সংবিধানের চতুর্থ অংশে আরও একটি নির্দেশ দেওয়া আছে। এই অংশের মধ্যে একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে চারুকলা বা ঐতিহাসিক নিদর্শনরূপে গুরুত্বপূর্ণ স্থান বা বস্তুসমূহের সর্বাঙ্গীন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পার্লামেণ্ট আইন বিধিবদ্ধ করিবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশাবলীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন

সংবিধানের এই নির্দেশাবলী কল্যাণব্রতী ভারত রাষ্ট্রের (Welfare State) কার্যক্রমের অন্তর্গত। যাহারা মনে করেন যে ভারতে কেবল রাজনৈতিক সাম্য স্থাপন যথেষ্ট নয়, আর্থিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারও প্রয়োজন, তাহারা সংবিধানের এই অংশে বিধৃত আদর্শগুলিকে মূল্যবান বলিয়া গণ্য করেন। অপর পক্ষে অনেকে মনে করেন যে রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত অন্তঃসারশূন্য আদর্শের ফাঁকা বুলি মাত্র। আমরা প্রথমতঃ আইনের চোখে নির্দেশাবলীর প্রকৃতি কি তাহা

বুঝিবার চেষ্টা করি, তাহার পর এগুলির মূল্যায়নের প্রশ্ন আলোচনা করা যাইবে।

নির্দেশাবলীর কার্যকারিতা নানারূপে সীমাবদ্ধ :—

(1) আগেই বলা হইয়াছে যে সংবিধানের 37 ধারা অনুসারে চতুর্থ অংশের এই নির্দেশাবলী কোনও আদালত বলবৎ করিতে পারে না। মনে রাখিতে হইবে যে মৌলিক অধিকারগুলি (Fundamental Rights) সম্বন্ধে আদালতের এই ক্ষমতা আছে এবং সেইসব অধিকার লঙ্ঘিত হইলে আদালত অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ব্যবস্থা লইতে পারে। অর্থাৎ এই নির্দেশাবলী যদি মানা না হয় তাহা হইলে নাগরিকেরা আদালতের সাহায্য পাইবে না কিন্তু মৌলিক অধিকার যদি না মানা হয় তবে তাহারা আদালতের সাহায্যে অধিকার বলবৎ করিতে পারে।

(2) নির্দেশাবলী অনুযায়ী যদি আইন বিধিবদ্ধ হয় তবেই মাত্র আদালতের দ্বারা বলবৎ যোগ্য অধিকার জন্মাইবে। বলা বাহুল্য, এই আইন কেবলমাত্র উপযুক্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা সম্পন্ন আইন সভাই বিধিবদ্ধ করিতে পারে।

(3) আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নির্দেশাবলীর সহিত যদি কোনও আইনের বৈপরীত্য দেখা যায়, তথাপি আদালত তেমন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করিতে পারে না। কিন্তু মৌলিক অধিকারাবলীর সঙ্গে অনুরূপ ভাবে আইনের বিরোধ দেখা গেলে সেই আইন আদালত অবৈধ বলিয়া গণ্য করে।

(4) যদি মৌলিক অধিকার এবং এই নির্দেশাবলীর মধ্যে বিরোধ দেখা যায় তবে মৌলিক অধিকারকেই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নির্দেশাবলীকে গৌণ জ্ঞান করা সংবিধান সম্মত পন্থা। 1951 সালে এই বিষয়ে State of Madras *vs.* C. Dorairajan, 1951[1] মামলায় সুপ্রীম কোর্ট-এর বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাশ রায় দান কালে বলেন : "The Directive Principles of State Policy have to conform to and run subsidiary to the chapter on Fundamental Rights". 37 ধারা অনুসারে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশাবলী আদালত দ্বারা বলবৎ যোগ্য নয় এবং সংবিধানের তৃতীয় অংশের (Fundamental Rights) উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। এই রায়দানের পরেই 1951 সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধন (Amendment) দ্বারা অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং

1 52 S. C. J., 354

ভূসম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের জন্য বিশেষ ক্ষমতা বৈধ বলিয়া স্বীকৃত হয়। 1971 সালের সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধন আইন অবস্থার আরও পরিবর্তন করে। 13 (2) ধারায় সংবিধানে লিখিত আছে যে, মৌলিক অধিকারাবলীকে লঙ্ঘিত করিয়া যদি কোনও আইন বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে তবে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। চতুর্বিংশতিতম সংশোধন দ্বারা এই বাধা দূরীভূত হয়। চতুর্বিংশতিতম সংবিধান সংশোধন আইনের বলে পার্লামেণ্ট এখন রাষ্ট্রের নীতি নির্দেশক অংশে লিখিত যে কোন আদর্শ আইনে পরিণত করিতে পারে। এইরূপ আইন যদি কোন মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়, তাহাতেও এরূপ আইন অসিদ্ধ হয় না।

রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলীর সার্থকতা : মনে রাখা দরকার যে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশগুলির কার্যকারিতা এইভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ঐগুলির নানা সার্থকতা আছে, যথা—

(1) সংবিধানে রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশ দেওয়া আছে নীতি নির্ধারক বা আইন প্রণেতাদের উদ্দেশে। আদালত আইন প্রয়োগকালে নির্দেশসমূহ বলবৎ করিতে পারে না বটে, কিন্তু আইন প্রণেতার উদ্দেশ্য হইবে নির্দেশ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তাহার দ্বারা আদর্শের রূপায়ণ। সংবিধানের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধন কিছুটা এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল।

(2) যদিও নির্দেশগুলি আদালতে বলবৎ যোগ্য নয় তথাপি, সংবিধান ও আইন ব্যাখ্যা করিতে আদালত নির্দেশগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিহারে জমিদারী উচ্ছেদ সংক্রান্ত আইন ও কেরলের শিক্ষা বিষয়ক বিল সম্বন্ধে বিচারকালে সুপ্রীমকোর্ট মত প্রকাশ করেন যে সামাজিক স্বার্থে প্রণীত এই সব আইনের ব্যাখ্যা ও বৈধতা-বিচার সংবিধানের রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে করা দরকার। প্রশ্ন যদি এই হয় যে "জনস্বার্থে" (Public purpose) জমিদারি অধিগ্রহণ করা হইতেছে কিনা ? তাহা হইলে সংবিধানের একটি রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশ স্মরণ করা দরকার, যথা, "ধন উৎপাদনের উপায় ও উৎপন্ন ধন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কুক্ষিগত না হয়" (39 (খ) ও 39 (গ) ধারা) ; জমিদারী অধিগ্রহণকে এই নির্দেশ রূপায়িত করার উপায় হিসাবে "সর্বজনের স্বার্থের" অনুকূল বলা যায় ; সুতরাং জমি অধিগ্রহণ আইনসম্মত কেন না সংবিধানে { ধারা 31 (2) } "জনস্বার্থে" রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের সম্পত্তি দখল আইনসম্মত। বিহারের জমিদারি উচ্ছেদ আইন এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে সুপ্রীম কোর্ট বৈধ ঘোষণা করে। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায় : "ভূ-সম্পত্তির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্ব রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশাবলী রূপায়িত করার জন্য

নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহা সর্বজনের স্বার্থে ভিন্ন আর কিছু নয়।" (State of Bihar *vs*. Kameshwar Singh, (1962) ।[1]

(3) প্রকৃতপক্ষে নির্দেশাবলীসহ সমস্ত সংবিধানের মূলে যে সকল আদর্শ আছে তাহার সামগ্রিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে। আপাতঃদৃষ্টিতে যদিও বলবৎ-যোগ্য না হওয়ায় নির্দেশগুলি অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন, তথাপি ঐগুলির প্রভাব আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োগে যতদূর আছে এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধির সহিত এই নির্দেশাবলীর যতদূর সঙ্গতি স্থাপন করা যায়, ততদূরই নির্দেশাবলীর বাস্তব সার্থকতা। যদি রাষ্ট্র জনকল্যাণকারী কার্যক্রম গ্রহণ করে, তাহা হইলে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সামাজিক স্বার্থ, একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও সর্বজনের স্বার্থ ইত্যাদির মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে উচিত ঐ-জাতীয় বিরোধ মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক নির্দেশ ও আদালতে বলবৎ-যোগ্য বিধিবিধানের মধ্যে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করা ; অর্থাৎ সংবিধানের মৌল আদর্শকে সামগ্রিকভাবে দেখার চেষ্টা করাই উচিত। 1949 সালে বোম্বাই রাজ্য মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করিয়া একটি আইন পাশ করে। এই আইনের বৈধতা বিচার করিবার জন্য সুপ্রীম কোর্টে মামলা উত্থাপিত হয়। বিচারপতি ফজল্ আলী এই মোকদ্দমার রায়-এ মন্তব্য করেন : In judging the reasonableness of the restrictions imposed by the Act, one has to bear in mind the Directive Principle of State Policy set forth in Article 47, of the constitution. (Fram Nuserwanji Balsara *vs*. State of Bombay, 1951)[2] । অর্থাৎ যে সকল নিষেধ এই আইনে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা বৈধ কি না—বিচার করিতে হইলে, এই আইনটির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতি 47 ধারার কথা মনে রাখিতে হইবে। ঐ ধারায় মোটামুটি ভাবে বলা হইয়াছে যে মাদক দ্রব্য বা পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর বলিয়া কেবলমাত্র ঔষধে ব্যবহার করা উচিত; অন্যভাবে নহে। বিচারপতি ফজল্ আলী এই স্থানে সংবিধান এবং রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতির সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রক্ষাকে গুরুত্ব দিয়াছেন এবং আইনের ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতিটির (47 ধারা) উপর অনেকাংশে নির্ভর করিয়াছেন। কারণ এইস্থলে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দেশের সহিত বিধানমণ্ডলীর আইনের কোন বিরোধ নাই বরং দুই-এর সঙ্গতি রহিয়াছে।

---

1 S. C. [C. A. 413/59], also AIR, Patna 91
2 S. C. R. 682 (1951) C. C. 308(319)

অনেক কারণে সংবিধানের চতুর্থ অংশের নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, অনেকে মনে করেন যে নির্দেশগুলি পশ্চিমের কিছু রাজনীতিবিদ্‌দের প্রভাবের ফল এবং অন্তঃসারশূন্য। জেনিংস বলিয়াছেন যে এখানে ফেবিয়ন সমাজবাদের (Fabian Socialism) প্রভাব স্পষ্ট।[1] জাতিসংঘের চার্টার ও বিশ্বমানবের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা (Universal Declaration of Human Rights) দুইটিও বোধহয় সংবিধান প্রণেতাদের চিন্তাকে প্রভাবিত করিয়াছিল ; চার্টারটি আলোচিত হইতেছিল ভারতে সংবিধান প্রণয়ন-কালেই। তাছাড়া সংবিধান পরিষদ কর্তৃক রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে কিছু নির্দেশ সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবটিতে নিঃসন্দেহে আইরিশ গণতন্ত্রের সংবিধানের অনুরূপ একটি অংশের প্রভাব দেখা যায়। এই সকল কারণে অনেকে মনে করেন যে, নির্দেশাবলী নিছক অনুকরণ স্পৃহার ফল। দ্বিতীয়তঃ বলা হইয়াছে যে, এই নীতি নির্দেশগুলি আদালতে বলবৎ-যোগ্য নয় বলিয়া মূল্যহীন। এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে বিগত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে নীতি নির্দেশগুলি গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। নির্দিষ্ট আদর্শগুলি নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের পক্ষে উপেক্ষার বস্তু বলিয়া গণ্য হয় নাই। অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট ও রাজ্য বিধান সভা আইন প্রণয়ন করিয়া নির্দেশ নীতিগুলিকে কার্যকর করিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকাররক্ষা, মাদক দ্রব্য বর্জন, জমিদারী উচ্ছেদ, রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প অধিগ্রহণ বা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। আদালতের দ্বারা আইনবিধির ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে সংবিধানের এই অংশ কেবলমাত্র অনুকরণ স্পৃহা বা পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল নয়। ঐরূপ প্রভাব থাকিলেও উহাই নীতি-নির্দেশ লিপিবদ্ধ করার একমাত্র কারণ নয়। 1935 সাল হইতেই ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935) অনুসারে ব্রিটিশ সরকার নির্দেশ পত্র (Instruments of Instruction) দ্বারা রাষ্ট্রনীতি নির্দিষ্ট করিতে পারিতেন। সংবিধানের অন্যতম প্রণেতা শ্রীআম্বেদকর বলেন যে চতুর্থ অংশের নির্দেশগুলি 1935-এর আইনের ঐ নির্দেশপত্রের দ্বারা প্রভাবিত। তাহা ব্যতীত নির্দেশাবলীর অন্তর্গত অনেক নীতি বিশুদ্ধ ভারতীয় ধারণা প্রসূত এবং জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের (বিশেষতঃ মহাত্মা গান্ধীর)

1 Sir Ivor Jennings : Some Characteristics of the Indian Constitution (1953), Chapter II.

আদর্শ প্রভাবিত : যথা, গ্রাম পঞ্চায়েৎ দ্বারা স্থানীয় শাসন, মদ্যপান নিবারণ, কুটির শিল্পের প্রসার ইত্যাদি। সুতরাং সংবিধানের নীতি নির্দেশগুলিকে পাশ্চাত্য আদর্শের বুলি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ঐ নির্দেশগুলির পথে যদিও ভারত বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি উহাদের আদর্শগুলিকে অবহেলা করা ভুল হইবে।

রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতির রূপায়ণ

সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর 25 বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই অনতিদীর্ঘ সময়ে নির্দেশ নীতিগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক কতদূর পর্যন্ত কার্যে পরিণত করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক। এই নীতিগুলি রূপায়িত করিতে হইলে যে অর্থের প্রয়োজন ভারত এখনও সে অর্থ ঐ খাতে ব্যয় করিতে সমর্থ নহে। মনে রাখা প্রয়োজন যে স্বাধীনতার প্রারম্ভে ভারতের অর্থনীতি অত্যন্ত দুর্বল ছিল। এই কয় বৎসরে শিল্প ও কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতি অনেক পরিমাণে আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এখনও ভারতের অবস্থা এমন নহে যে নির্দেশমূলক নীতিগুলি ব্যাপকভাবে রূপায়িত করা যাইতে পারে। যে সকল বাধা রাষ্ট্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার একটি প্রধান বাধা হইতেছে জন-সংখ্যার অতি-মাত্রায় বৃদ্ধি। বর্ধিত জন-সংখ্যার সহিত আর্থিক উন্নতি তাল রাখিয়া চলিতে পারিতেছে না।

ব্রিটিশ যুগে যে অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তাহার বিরাট পরিবর্তন না করিতে পারিলে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথায় অল্পকালের মধ্যে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব নহে। গণতন্ত্র ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা : এই পন্থা ব্যতীত অন্য পন্থা ভারত গ্রহণ করিতে পারে না। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, হিংসাত্মক পথে সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তন করিলে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। মুষ্টিমেয় একদলের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় মাত্র। এই সকল কারণে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতি রূপায়ণ খুব বেশী দূর অগ্রসর হইয়াছে বলা চলে না। তবে যে সকল পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ও হইতেছে তাহা নিরাশাব্যঞ্জক নহে।

38 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে রাষ্ট্র এমন সমাজ-ব্যবস্থা স্থাপন করিবে যাহার ফলে দেশে সত্যকার কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু এই পথে বেশীদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। তবে সমাজতন্ত্রের ভিত্তি দেশে স্থাপিত হইয়াছে বলা যাইতে

পারে। শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইয়াছে। মৌলিক শিল্পগুলির লক্ষণীয় অংশ রাষ্ট্রায়ত্তে আসিয়াছে। লৌহ, কয়লা, সার, ভারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি শিল্প, বীমা ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতি রাষ্ট্রের পরিচালনা ও মালিকানায় চলিতেছে। একচেটিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রসার বন্ধ করিবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। শ্রমিক ও কৃষকগণের এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে দুর্বল ও শোষিত শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার্থে নানা প্রকার আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে শ্রমবিরোধ আইন, বোনাস্ আইন, ফ্যাক্টরী আইন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আইন, সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নরনারীর সাম্য ও নারী এবং শিশুদের জন্য বিশেষ কল্যাণমুলক ব্যবস্থার দিকেও রাষ্ট্র দৃষ্টিপাত করিয়াছে। অনেক রাজ্যে বৃদ্ধ ও অশক্ত ব্যক্তিবর্গকে আর্থিক সাহায্য দানেরও সূচনা করা হইয়াছে। মানিয়া লইতে হইবে যে নিয়োগের অধিকার ও বেকার ভাতা প্রভৃতি সুবিধাদানের সুযোগের দ্বার সরকার এখনও উন্মুক্ত করিতে পারে নাই ; কিন্তু আর্থিক উন্নতি আরও অগ্রগতি লাভ না করিলে তাহা সম্ভব হইবে না।

ছয় বৎসর হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও প্রবর্তিত হয় নাই সত্য, তবে শিক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াইয়া চলিয়াছেন এবং দেশে সাক্ষর ব্যক্তির সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। তপশীলীজাতি ও তপশীলী আদিবাসীগণের উন্নতির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে আগ্রহের লক্ষণ সুস্পষ্ট। চাকুরী, শিক্ষা এবং পার্লামেণ্ট ও বিধান সভায় প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধে তাহারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করিতেছে।

জাতীয় খাদ্যে পুষ্টির অভাব দূর করিবার জন্য গবেষণা-সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য প্রতি রাজ্যে বৎসর বৎসর বর্ধিত হারে অর্থ-ব্যয় করা হইতেছে। গ্রামীন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি জনসেবায় ব্রতী রহিয়াছে। গ্রামীন স্বায়ত্বশাসন আইন প্রতি রাজ্যেই পাশ হইয়াছে এবং গ্রামবাসীদিগকে দেশ গঠনে অংশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রামীন শিল্পের উন্নতির জন্য সর্বভারতীয় খাদি বোর্ড, সর্বভারতীয় হস্তশিল্প বোর্ড প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া চলিয়াছে। কৃষির উন্নতি ও গৃহপালিত গবাদি পশুর উন্নতি বিধান বিষয়ে সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা লইয়াছে। সেচ, উন্নত ধরনের বীজ সরবরাহ, সার, ট্র্যাকটার দ্বারা চাষের ব্যবস্থা প্রভৃতি ; পশু চিকিৎসা ও বৈজ্ঞানিক পশু-প্রজনন পদ্ধতি এই বিষয়ে লক্ষণীয়।

হিন্দু কোড্ আইন পাশ করিয়া সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্য একই সাম্য-

নীতি ভিত্তিক ব্যক্তিগত আইন (personal law) স্থাপনের পথে দেশ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতি অনুসারে রাষ্ট্র দেশের চারুকলার উন্নতি বিধানের জন্য ও জাতীয় ঐতিহ্যমূলক পুরাকীর্তি সংরক্ষণের জন্য আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছে। জাতীয় চারুশিল্প এ্যাকাডেমী, সাহিত্য এ্যাকাডেমী প্রভৃতি এই প্রচেষ্টার নিদর্শন। সর্বশেষে 51 ধারায় যে শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্বমূলক আন্তর্জাতিক নীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাও নিষ্ঠার সহিত ভারত অনুসরণ করিতেছে।

রাষ্ট্রের সাফল্য বিপুল নহে সত্য, কিন্তু রাষ্ট্রীয় নির্দেশ নীতির অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র কিছু না কিছু কাজ করিয়াছে। যাহারা আশা করে যে 25 বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পূর্ণভাবে রূপায়িত করা উচিত ছিল, তাহাদের বাস্তবের সঙ্গে যোগ নাই। স্মরণ করা কর্তব্য যে রাষ্ট্রকে এই 25 বৎসরের মধ্যে চারিটি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নানা সামাজিক-রাজনৈতিক বাধা রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করিয়াছে। এই সকল কারণে নীতিগুলির আশানুরূপ রূপায়ণ সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যাহা হইয়াছে তাহা প্রশংসার দাবি রাখে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ইউনিয়নের শাসন বিভাগ

ক্যাবিনেট সরকার বনাম রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার

ভারতীয় ইউনিয়নের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্রিটেনের দায়িত্বশীল ক্যাবিনেট ধরনের হইবে, কি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় রাষ্ট্রপতি-শাসিত হইবে, এই প্রশ্নটি লইয়া সংবিধান পরিষদে মতভেদ উপস্থিত হয়। যাহারা দ্বিতীয় ধরনের শাসন ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন তাহারা বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতি-শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণ কর্তৃক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন। সুতরাং এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতে প্রশাসন-যন্ত্রের স্থায়িত্বও প্রয়োজন। কারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির শক্তিগুলি ভারতে সক্রিয়। রাষ্ট্রপতি-শাসন প্রথায় রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য নিজ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইহার দ্বারা শাসন-ব্যবস্থা কিয়ৎ পরিমাণে স্থায়িত্ব লাভ করে এবং প্রশাসনের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। ভারতের পক্ষে এই প্রশাসনই আবশ্যক। অন্যপক্ষে কে. এম. মুন্সী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বলেন যে ভারতবাসীগণ ব্রিটেনের ক্যাবিনেট প্রথার সহিত পরিচিত। 1919 সাল হইতে কিছুটা দায়িত্বশীল ধরনের সরকার ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছিল। 1935 সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা এই নীতি আরও সম্প্রসারিত করা হয়। কংগ্রেস দীর্ঘকাল হইতে ডোমিনিয়ন ধাঁচের শাসনব্যবস্থা দাবি করিয়া আসিতেছিল। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে ক্যাবিনেট প্রথাই প্রচলিত। সুতরাং ভারতীয় রাজনৈতিক ঐতিহ্যের সহিত ক্যাবিনেট পন্থী প্রশাসন যুক্ত হইয়া গিয়াছে। এই ঐতিহ্য পরিত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শের দিকে ছুটিয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। জওহরলাল নেহেরুও এই মতাবলম্বী ছিলেন। বস্তুতঃ, সংবিধান পরিষদের বিরাট সংখ্যক সদস্যগণই এই মত সমর্থন করেন এবং ক্যাবিনেট সরকার গঠনের প্রস্তাব পরিষদে গৃহীত হয়।

ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির স্থান

ক্যাবিনেট ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী সংসদের নিম্নপরিষদের সংখ্যাগুরু সদস্যগণের সমর্থনপুষ্ট ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদই প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকেন। এই মন্ত্রী পরিষদ সংসদের নিম্নতম

সভার নিকট দায়িত্বশীল। অর্থাৎ তাহাদের স্থায়িত্ব সংসদের ঐ সভার অধিকাংশের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তাহারা অধিকাংশের ভোটে পদচ্যুত হইতেও পারেন। অথচ প্রশাসন ব্যবস্থার একটি অভঙ্গ ধারা-বাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক। ব্রিটেনে এই ধারা-বাহিকতা রক্ষা করেন রাজা বা রানী। ভারতে রাষ্ট্রপতি এই কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। সংবিধানের 51 (1) ধারা অনুসারে সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী নহেন। নামে মাত্র তিনি সর্বাধিক প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী, কিন্তু তিনি সব কিছুই করেন ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী-পরিষদের উপদেশ-অনুযায়ী। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা দ্বিস্তর-বিভক্ত। সত্যকার ক্ষমতার অধিকারী ক্যাবিনেট। তাহাদিগকে (Real Executive) বা প্রকৃত প্রশাসকমণ্ডলী বলা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতিকে Formal Executive বা আনুষ্ঠানিক বা বাহ্যানুষ্ঠানরত প্রশাসক বলিয়া অভিহিত করা যায়।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন

পরোক্ষ নির্বাচন : রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। পার্লামেন্টের বা কেন্দ্রীয় সংসদের উভয় কক্ষের অর্থাৎ লোকসভা ও রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্যগণ ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত একটি নির্বাচন সংস্থা (Electoral College) রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করে। সংবিধান পরিষদে কেহ কেহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতির নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুইটি কারণে এই প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই। প্রথমতঃ, ভারতের ন্যায় বিরাট দেশে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন নানা জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন তাহা হইলে তিনি দাবি করিতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের সদস্যগণ অপেক্ষা তাহার পশ্চাতে জনগণের বেশী সমর্থন রহিয়াছে। কারণ প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে তিনি সমগ্র জাতি দ্বারা নির্বাচিত হইতেছেন রাষ্ট্রপতিরূপে। প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের সদস্যগণ প্রত্যেকে নির্বাচিত হইতেছেন একটিমাত্র নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটদাতাগণ কর্তৃক কেবলমাত্র পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী বা ক্যাবিনেট সদস্যরূপে নহে। ঐ সকল দায়িত্বপূর্ণ পদে তাহারা নিযুক্ত হইতেছেন কারণ পার্লামেণ্টে যে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে তাহারা সেই দলেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং রাষ্ট্রপতির

ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন গৃহীত হইলে সঙ্গতভাবে মনে করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রপতির তুলনায় তাহাদের পশ্চাতে প্রত্যক্ষ জনসমর্থন খুবই সামান্য।

এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের প্রবলতব প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়াইতে পারিতেন। ইহাতে একদিকে রাষ্ট্রপতি এবং অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সংঘর্ষ হইবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারিত। এই সংঘর্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এড়াইবার জন্য রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত (Presidential form of Government) রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন সমীচীন বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু সংসদীয় (Parliamentary) প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাঞ্ছনীয় নহে। এইসকল কারণেই সংবিধান পরিষদে স্বল্পসংখ্যক সদস্যগণ সমর্থিত প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি মূল নীতি অনুসৃত হইয়াছে। সেই নীতিটি হইল সাম্য। এই নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য দুইটি নিয়ম অবলম্বন করা হইয়াছে। প্রথমতঃ—রাষ্টপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের ভোটদান অধিকারের আনুপাতিক মান একই রক্ষিত হইয়াছে। তবে জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটের সংখ্যা কম বা বেশী হইতে বাধ্য, কিন্তু আনুপাতিক সমতা রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলির দেয় ভোটসংখ্যা ও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের দেয় ভোটসংখ্যা আনুপাতিকভাবে একই হইতে হইবে। একটি বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে এই জটিল নীতিদ্বয় কার্যে পরিণত করা হইয়া থাকে।

(ক) প্রথমতঃ, রাজ্য বিধান সভার প্রতিটি ভোটারের প্রদত্ত ভোটের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। প্রতি রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণই ভোটের অধিকারী হইবেন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভার ভোটদাতাগণের সংখ্যাদ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভাগফলকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। শেষোক্ত ভাগফল যাহা হইবে তাহাই বিধানসভার প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের মূল্য বলিয়া গণ্য হইবে। কিন্তু শেষোক্ত ভাগের সময় যদি দেখা যায় যে 500 বা তাহার অধিক ভাগশেষ থাকিয়া যাইতেছে তাহা হইলে শেষোক্ত ভাগফলের সঙ্গে এক যোগ করিতে হইবে।

(খ) পার্লামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারণ :

সমস্ত রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের পূর্ব হিসাব অনুযায়ী মোট ভোট সংখ্যার মূল্য যোগ করিয়া, তাহাকে পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। যাহা ভাগফল হইবে তাহাই পার্লামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যা বলিয়া বিবেচিত হইবে। যদি ভাগশেষ অর্ধেক বা তাহার বেশী হয় তাহা হইলে ভাগফলের সহিত এক যোগ করিয়া পার্লামেণ্টের নির্বাচিত সদস্যগণের প্রদত্ত ভোটের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। নতুবা ভাগফলকেই নির্ণায়ক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

ধরিয়া লওয়া যাক যে একটি রাজ্যের জনসংখ্যা 44439840 এবং ঐ রাজ্যের বিধান সভার সদস্য-সংখ্যা 270। তাহা হইলে উপরোক্ত নিয়মানুযায়ী আমাদের উদাহরণে হিসাবটি এইরূপ দাঁড়াইবে, যথা :—

$$(\text{ক})\quad \frac{44439840\ (\text{রাজ্যের জনসংখ্যা})}{270\ (\text{বিধান সভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা})} = 164592$$

এই ক্ষেত্রে ভাগশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না ;

(খ) এই ভাগফল 164592 কে 1000 দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল হইল $164\frac{74}{125}$। যেহেতু $\frac{74}{125}$, $\frac{1}{2}$-এর চেয়ে বেশী, সেইহেতু এই হিসাবে উহাকে 1 ধরিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ ধরিয়া লইতে হইবে যে ভাগফল 164+1=165। সুতরাং উল্লিখিত রাজ্যের বিধান সভার প্রতি নির্বাচিত সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যে ভোট দিবার অধিকারী তাহার সংখ্যাগত মূল্য হইল 165 ;

(গ) বিধান সভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা 270। সুতরাং উদাহরণে উল্লিখিত রাজ্যে মোট ভোট সংখ্যা হইবে 165×270=44550। এইরূপে উপরে বর্ণিত নিয়মানুসারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত সদস্যবৃন্দের ভোট সংখ্যার হিসাব করিতে হইবে। তাহার পর প্রথমোক্ত রাজ্যের মোট ভোট সংখ্যা 44550-র সহিত অন্যান্য রাজ্যের মোট ভোট সংখ্যাগুলি যোগ করিতে হইবে। এইরূপে ভারতে সকল বিধান সভার সদগ্যগণের মোট ভোটের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারিত হইল ;

(ঘ) এখন ধরিয়া লওয়া যাক্ যে এই যোগফলটি 574700। এই যোগফলটিকে পার্লামেণ্টেয় মোট সদস্য সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। যদি পার্লামেণ্টের সদস্য সংখ্যা 750 হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিতভাবে হিসাব কষিতে হইবে, যথা :

$$\frac{574700 \text{ (সমস্ত রাজ্যগুলির বিধানসভার সদস্যগণের মোট ভোটের সংখ্যাগত মূল্য)}}{750}$$

$=766\frac{4}{15}$। যেহেতু $\frac{4}{15}$, $\frac{1}{2}$ এর চেয়ে কম, সেইহেতু ঐ ভগ্নাংশ সম্পূর্ণভাবে বাদ যাইবে। সুতরাং ভাগফল 766 বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই পার্লামেণ্টের প্রতি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সংখ্যাগত মূল্য।

এইরূপ হিসাবের সাহায্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বিধান সভার প্রতিটি নির্বাচিত সদস্যের ভোটের সহিত পার্লামেণ্টের প্রতিটি সদস্যের ভোট সংখ্যার আনুপাতিক সমীকরণ স্থাপন সম্ভব। এই স্থলে প্রদত্ত হিসাবটির ইহাই সার্থকতা।[1]

ভোটদান পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটদান পদ্ধতিও অভিনব। এই প্রথা অনুযায়ী প্রতি ভোট পত্রের প্রদত্ত অপ্রয়োজনীয় ভোটগুলি এক এক করিয়া অন্য-প্রার্থীর পক্ষে হস্তান্তর যোগ্য। এই পদ্ধতির দ্বারা আনুপাতিকভাবে প্রতি ভোটারের ভোটের মূল্য স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহাকে Proportional representation by the method of single transferable vote বলা হয়।

এই নিয়মানুযায়ী প্রতি ভোটারকে ভোটপত্রে নিজ নিজ পছন্দ অনুসারে প্রার্থীদের নামের পাশে 1, 2, 3 প্রভৃতি সংখ্যা লিখিয়া তাহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি পছন্দ জানাইয়া দিতে হয়। কিন্তু প্রথম পছন্দ মাফিক ভোট কাহাকে না কাহাকেও দিতে হইবে। নতুবা ঐ ভোট পত্রটি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পছন্দ মাফিক ভোট ভোটদাতা না'ও দিতে পারেন।

ভোট দান পর্ব শেষ হইলে আরম্ভ হয় ভোট গণনা পর্ব। নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হইয়া থাকে :

যে কয়টি 1 নম্বরের বৈধ ভোট বিভিন্ন প্রার্থী পাইয়াছেন, তাহা যোগ করিতে হইবে। যোগফলকে দুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলের সহিত এক যোগ করিতে হইবে। এই শেষোক্ত যোগফলকে কোটা (quota) বলে। যিনি নির্দিষ্ট কোটা পাইবেন তিনিই রাষ্ট্রপতিরূপে নির্বাচিত হইবেন। অর্থাৎ নির্বাচিত হইতে হইলে প্রদত্ত ভোটের অর্ধেকের বেশী পাইতে হইবে। উপরোক্তভাবে কোন প্রার্থীই যদি নির্বাচিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে

1 প্রদত্ত হিসাবটি সংবিধানের খসড়া প্রস্তুতকারী কমিটি কর্তৃক নির্দেশিত নীতির রূপায়ন।

প্রথমে সর্বনিম্ন ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীকে নির্বাচন দ্বন্দ্ব হইতে বাদ দিতে হয় এবং তাহার ভোট পত্রের ভোটসমূহ প্রদত্ত নম্বর অনুযায়ী অন্যান্য প্রার্থীদের ভিতর বণ্টন করিয়া দিতে হয়। অর্থাৎ যাহার ভোটপত্র হইতে ভোট বণ্টিত হইতেছে তিনি যাহাকে যেমন নম্বর দিয়াছেন পর পর সেই অনুযায়ী ভোট হস্তান্তরিত হইবে। যে পর্যন্ত কোন একজন প্রার্থী অর্ধেকের বেশী ভোট সীমায় না পৌঁছিতে পারেন সেই পর্যন্ত এই হস্তান্তর পদ্ধতি চলিতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির পদ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী

রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীরূপে উপযুক্ত বিবেচিত হইতে হইলে প্রার্থীকে :

(ক) ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। এইস্থলে লক্ষণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিধান আছে রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থী হইতে হইলে প্রার্থীকে জন্মসূত্রে নাগরিক হইতে হইবে ; ভারতে সেইরূপ কোন বাধা নিষেধ নাই ;

(খ) প্রার্থীকে অন্ততঃ 35 বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং

(গ) লোকসভায় নির্বাচিত হইতে পারেন, প্রার্থীর এইরূপ যোগ্যতা থাকাও আবশ্যক।

ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারের অধীনস্থ কোন কর্মচারী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। কিন্তু উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল বা ভারত ইউনিয়ন বা রাজ্যের কোন মন্ত্রীর প্রার্থী হইবার বাধা নাই। পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের অথবা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, যদি সেইরূপ কোন প্রার্থীর অন্যান্য যোগ্যতা থাকে। পার্লামেণ্টের বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোন সদস্য যদি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন তাহা হইলে যে তারিখে তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই তারিখ হইতে তাহার পূর্ব পদ হইতে তিনি খারিজ বলিয়া বিবেচিত হইবেন। রাষ্ট্রপতি লাভজনক অন্য কোন পদ গ্রহণ করিতে পারেন না।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল অর্থাৎ পাঁচ বৎসর শেষ হইলে তিনি পুনরায় এবং যতবার ইচ্ছা ঐ পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন।[1] মার্কিন

1 ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উপর্যুপরি দুইবার রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বা আয়ারল্যাণ্ডে দুইবারের বেশী কেহ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইতে পারেন না। ভারতে সেইরূপ কোন বাধানিষেধ নাই।

রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হইলে যতদিন পর্যন্ত তাহার স্থলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হন সেই পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে তাহার স্থলে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের অবশিষ্ট সময়ের জন্য উপরাষ্ট্রপতি স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলীন রুজেভেল্টের মৃত্যুর পর উপরাষ্টপতি ট্রুম্যান এবং রাষ্ট্রপতি জন কেনেডির হত্যার পর উপরাষ্ট্রপতি লিন্ডন্ জনসন্ স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। ভারতে সেইরূপ ব্যবস্থা নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটিলে তাহার স্থলে সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন অপরিহার্য। রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের পরলোক গমনের পর নূতন নির্বাচন মারফৎ শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি পাঁচ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি অসুস্থ হইলে বা কোন কারণে অনুপস্থিত থাকিলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

রাষ্ট্রপতি যে তারিখে নিজ পদে অধিষ্ঠিত হইবেন সেই তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কার্যকাল চলিতে থাকিবে। সংবিধানে আরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যে পর্যন্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নিজ পদে অভিষিক্ত না হইতেছেন সেই পর্যন্ত পূর্ব রাষ্ট্রপতি তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে তিনি উপরাষ্ট্রপতির নিকট লিখিত পত্র মারফত পদত্যাগ করিতে পারেন। তাহা করিলে উপ-রাষ্ট্রপতিকে ঐ পত্রটি অবিলম্বে লোকসভার অধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। লক্ষণীয় যে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির মৃত্যু বা পদচ্যুতি ঘটিলে অথবা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করিলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনিবার্য। এই তিন অবস্থাতেই যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন, তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর হইবে। রাষ্ট্রপতি পদ খালি হইবার পর ছয়মাসের মধ্যে নূতন নির্বাচন সমাধা করিতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি

সংবিধান অনুযায়ী প্রস্তাবাকারে অভিযোগ আনয়ন ও বিচারের পর অর্থাৎ Impeachment-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে তাহার নির্দিষ্ট কার্যকাল

শেষ হইবার পূর্বেই পদচ্যুত করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে সংবিধানে বিস্তারিত ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

(1) সংসদ বা পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত এক চতুর্থাংশকে প্রস্তাবাকারে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগ আনিতে হইবে।

(2) এই প্রস্তাব যে তারিখে আলোচিত হইবে সেইদিন হইতে চৌদ্দ দিন পূর্বে উপরোক্ত প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে।

(3) ঐ প্রস্তাব আলোচনান্তর ঐ কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হওয়া আবশ্যক।

(4) পাশ হইলে অপরকক্ষ ঐ অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিবে। অনুসন্ধানকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অথবা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া অনুসন্ধান কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। অনুসন্ধানের পর অনুসন্ধানকারী কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ যদি এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, অভিযোগটি প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা হইলে যে তারিখে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইবে সেই তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হইয়াছেন ধরিয়া লইতে হইবে। ভারতীয় সংবিধানের এই ব্যবস্থাটির অনুরূপ না হইলেও মূলতঃ অনেকটা একই ধরনের ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রহিয়াছে। সেখানে অভিযোগ উপস্থিত করেন প্রতিনিধি সভা এবং বিচারের ভার থাকে সেনেট সভার উপর।

রাষ্ট্রপতির বেতনাদি সংক্রান্ত ব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি অন্য কোন লাভজনক কার্যে লিপ্ত হইতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির বেতন ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে পার্লামেণ্টকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যে পর্যন্ত আইন প্রণীত না হয় সেই পর্যন্ত সংবিধানের দ্বিতীয় তপশীলে যে ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে তাহাই চলিতে থাকিবে। ঐ তপশীল অনুসারে রাষ্ট্রপতি মাসিক 10,000 টাকা বেতন এবং সংবিধান প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল যে সকল ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি পাইতেন, রাষ্ট্রপতি তাহা সকলই পাইতে থাকিবেন। তাঁহার বেতন ভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি রাষ্ট্রপতির কার্যকালে কমানো যায় না। রাষ্ট্রপতিকে কার্যভার গ্রহণ করিবার সময় একটি প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়। বলা বাহুল্য যে সংবিধান রাষ্ট্রপতির উপর প্রশাসন সংক্রান্ত আইনগত দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে। রাষ্ট্রপতি প্রতিজ্ঞা (Oath of allegiance) গ্রহণের মাধ্যমে কতকগুলি নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া

থাকেন। তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিজ্ঞা করিতে হয় যে তিনি বিশ্বস্তভাবে ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রপতির সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করিবেন এবং যথাসাধ্য সংবিধান পালন ও সংরক্ষণ এবং ভারতীয় জনগণের কল্যাণকল্পে আত্মনিয়োগ করিবেন।

রাষ্ট্রপতি এক হিসাবে আইনের উর্ধ্বে। কারণ পদাধিকার বলে সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পাদনজনিত কোন কার্যাবলীর জন্য তাঁহাকে কোন আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা করা চলে না। তাঁহাকে গ্রেপ্তার বা কারারুদ্ধ করাও যায় না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা করিতে হইলে দুই মাসের নোটিশ দিয়া জানাইয়া দিতে হইবে তাহার নিকট কি দাবি করা হইতেছে।

রাষ্ট্রপতির পদ মর্যাদা (Position) ও ক্ষমতা (Power)

সংবিধান অনুযায়ী ভারত ইউনিয়নের সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। 53 ধারাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: "The Executive power of the union shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with the constitution."

"In accordance with the constitution", কথা কয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শাসনতান্ত্রিক বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন এই কথাগুলি দ্বারা সূচিত হইতেছে যে ভারতের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক বা Constitutional Ruler। বিগত 25 বৎসর ভারতীয় সংবিধান যেভাবে বিবর্তিত হইয়াছে এবং যে ধরনের প্রশাসনিক প্রথা দানা বাঁধিয়াছে তাহাতে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি সত্যই একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক। প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রপতির নামে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ভারতীয় ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ। তাঁহারাই প্রকৃত ক্ষমতার (Real powers) অধিকারী। রাষ্ট্রপতি formal powers বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রশাসক ইউনিয়ন মন্ত্রী পরিষদ। রাষ্ট্রপতি বাহ্যানুষ্ঠানরত সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আসন ও পদমর্যাদার অধিকারী। ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তিনি যে আসনে অধিষ্ঠিত তাহা সত্রাকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। যথা,

(1) যদিও তিনি প্রকৃত ক্ষমতাহীন, তথাপি আনুষ্ঠানিক দিক হইতে

তিনি সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। প্রসাশন তাঁহারই নামে পরিচালিত হয়। এইজন্য তিনি সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। রাষ্ট্রপতি ব্যতীত প্রশাসন অচল হইয়া পড়ে। এই সূত্রে সংবিধানের 77(1) ধারাটি উল্লেখযোগ্য। ঐ ধারায় যে ভারত সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম প্রকাশ্যভাবে রাষ্ট্রপতির নামেই চলিবে।[1]

(2) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংসদ বা পার্লামেণ্টের অংশীদার।

(3) রাষ্ট্রপতি ন্যায় ও বিচারের উৎস। সর্বোচ্চ বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

(4) তিনি সমগ্র প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকর্তা।

(5) জাতির আপৎকালীন অবস্থায় তিনিই আইনের চক্ষে রাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রক্ষক ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকর্তা।

(6) রাষ্ট্রপতি জাতির একতা ও সম্মানের প্রতীক এবং সমগ্র জাতির প্রতিভূ বা প্রতিনিধি।

(7) রাষ্ট্রপতি নাগরিকগণকে দেয় জাতীয় সম্মানের উৎস।

(8) বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের নিকট রাষ্ট্রপতি জাতির প্রতিনিধি।

(9) রাষ্ট্রপতি তাহার কার্যকালে অনেক পরিমাণে আইনেরও উর্ধ্বে। আনুষ্ঠানিক ও সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলির সমন্বয়ে রাষ্ট্রপতি একটি মহিমান্বিত আসনের অধিকারী। প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও তিনি অপরিহার্য, কারণ তাঁহারই আদেশে ভারতের প্রশাসন চক্র আবর্তিত হইতে থাকে।

রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(1) রাষ্ট্রপতির শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী অথবা অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দের সাহায্যে রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনা করিবার অধিকারী। কিন্তু তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক, এইজন্য তিনি এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্যে ও উপদেশ অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন Aritlcle 74(1)। রাষ্ট্রপতি ইউনিয়ন সরকারের সর্বোচ্চ কর্মচারিগণকে নিয়োগ করেন। রাজ্যপালগণ, ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন বিষয়ক উপদেষ্টা এ্যাটর্নী জেনারেল, ইউনিয়নের সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব-পরীক্ষক (কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেল), নির্বাচন কমিশন, ইউনিয়নের সরকারী চাকুরী কমিশনের (পাবলিক সার্ভিস কমিশনের)

---

1 Article 77(1) of the Constitution of India : "All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the Precident."

সদস্যগণ, তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসী বিষয়ক বিশেষ কর্মচারী, এবং অর্থ কমিশন (ফাইন্যান্স কমিশন), আন্তঃরাজ্য কমিশন, যুগ্ম কমিশন এবং অন্যান্য সর্বভারতীয় কমিশনের তিনিই নিয়োগকর্তা। ইহা ছাড়া, হাইকোর্টের ও সুপ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে তিনি নিয়োগ করেন। সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণকেও তিনি বিভিন্ন পদে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য যে, সকল নিয়োগের ক্ষেত্রেই তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন।

(2) রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। ইহা দ্বারা সামরিক শক্তি যে অসামরিক শক্তির অধীন, ইহাই সূচিত হইতেছে। যদিও রাষ্ট্রপতি প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকর্তা তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, পার্লামেণ্টের প্রতিরক্ষা বাহিনী সংক্রান্ত সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রহিয়াছে। পার্লামেণ্টই যুদ্ধ ও শান্তি বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী।

(3) রাষ্ট্রপতির বৈদেশিক রাষ্ট্র সংক্রান্ত ক্ষমতা

আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিই ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতগণ রাষ্ট্রপতির নিকট আপন আপন পরিচয় পত্র প্রদান করেন এবং রাষ্ট্রপতি তাঁহাদিগকে স্বাগত জানান। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূতগণকে নিয়োগ করেন। কিন্তু বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সহিত কোন সন্ধি বা চুক্তি বিষয়ে পার্লামেণ্টই সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী।

(4) রাষ্ট্রপতির আইন বিষয়ক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্টের কোন কক্ষের সদস্য হইতে পারেন না। কিন্তু তিনি উভয় কক্ষের বাহিরে থাকিয়াও পার্লামেণ্টের অংশীভূত। বিলাতের পার্লামেণ্ট অর্থে যেমন রাজা বা রাণী, কমনস্ সভা ও লর্ডসভা বুঝায় তেমনি ভারতের পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ও রাজ্যসভা লইয়া গঠিত। আইন প্রণয়ন সম্বন্ধেও তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ব্যাপক।

(ক) রাষ্ট্রপতির পার্লামেণ্ট বা সংসদকে অধিবেশনে আহ্বান, সংসদের অধিবেশনের অবসান (Prorogue) এবং উহা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার (Dissolve) অধিকার রহিয়াছে।[1]

(খ) সাধারণ নির্বাচনের পর এবং প্রতি বৎসরের প্রথম অধিবেশনে

---

1 অধিবেশন চলাকালে অধ্যক্ষ বা স্পীকার অধিবেশন সাময়িক ভাবে স্থগিত (adjourn) রাখিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতি প্রারম্ভিক ভাষণ দিবার অধিকারী। এই ভাষণে মন্ত্রীসভার নীতি ঘোষিত হয়।

(গ) তিনি পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষে অথবা দুই-এর মিলিত অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারেন বা বাণী প্রেরণ করিতে পারেন।

(ঘ) বাজেট, অতিরিক্ত বাজেট, অর্থবিল; বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি অর্থ-কমিশনের সুপারিশ, ইউনিয়ন সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত কনট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের বিবরণ, কেন্দ্রীয় চাকুরী কমিশনের বিবৃতি, তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসী সংক্রান্ত ভারত সরকারের বিশেষ কর্মচারির বিবরণী, অনুন্নত শ্রেণী সম্বন্ধীয় কমিশনের বিবৃতি, প্রভৃতি বিষয় পার্লামেণ্ট বা সংসদের সম্মুখে একমাত্র রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী উপস্থাপিত হইতে পারে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় বিল দুই কক্ষে পাশ হইয়া গেলে তাহাতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আইনত প্রয়োজন। সাংবিধানিক আইন অনুসারে তিনি সম্মতি দিতে পারেন বা সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন কিম্বা বিলটি অর্থবিল না হইলে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নিকট বিলটি বা তাহার অংশ বিশেষ পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন। যদি উভয় কক্ষে পুনর্বিবেচনার পর বিলটি গৃহীত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার সম্মতি দিতেই হইবে। কিন্তু বিলটি যদি অর্থবিল হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর নাই। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে রাষ্ট্রপতিকে ঐরূপ অর্থবিলে সম্মতি দিতেই হইবে। 1972 সালের সংবিধান সংশোধন আইন দ্বারা ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে 368 ধারা অনুযায়ী সংবিধানের কোন সংশোধক বিল পার্লামেণ্টে পাশ হইলে রাষ্ট্রপতিকে ঐ বিলে সম্মতি দিতেই হইবে।

(চ) রাজ্য বিধানমণ্ডলীর যে সমস্ত বিল রাষ্ট্রপতির মতামতের জন্য রক্ষিত থাকে, তাহা পাশ হইতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতি অপরিহার্য।

(ছ) রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার 12 জন সদস্য এবং লোকসভার 2 জন ইঙ্গ-ভারতীয় (Anglo-Indian) সদস্য মনোনীত করিয়া থাকেন।

(জ) হুকুম আইন বা অর্ডিন্যান্স সম্বন্ধে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সংসদের অধিবেশন হইতেছে না এইরূপ সময় কোন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে আশু ব্যবস্থা করা দরকার হইতে পারে। রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সেইরূপ অবস্থায় আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি কৃত এই ধরনের আইনকে হুকুম আইন (Ordinance) বলা হয়।

বলা বাহুল্য যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক (Constitutional Ruler) হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী এই আইন প্রস্তুত করিতে হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যখন সংসদের অধিবেশন হইতেছে না—কেবলমাত্র এইরূপ সময়েই হুকুম আইন প্রণয়ন করা যাইতে পারে। এই আইন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় হইতে কার্যকর হয়। রাষ্ট্রপতি তৎকৃত আইন যে কোন সময় প্রত্যাহার করিতে পারেন। অত্যাবশ্যকীয় অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য এই বিশেষ ক্ষমতাটি রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিধান করা হইয়াছে যে পার্লামেণ্ট অধিবেশনে মিলিত হইলেই ঐ হুকুম আইন পেশ করিতে হইবে। তবে পার্লামেণ্ট অধিবেশনে মিলিত হইবার প্রথম দিন হইতে ছয় সপ্তাহের বেশী ইহা বলবৎ থাকিতে পারে না, যদি না ইতোপূর্বে পার্লামেণ্ট আইনটি অনুমোদন করে। রাষ্ট্রপতি-কৃত হুকুম আইন যদি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হয় তাহা হইলে আইনটি বাতিল হইয়া যায়। সর্বশেষে মনে রাখা প্রয়োজন যে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের পরিধি দ্বারা রাষ্ট্রপতির হুকুম আইনের পরিধি সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ পার্লামেণ্টের যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নাই রাষ্ট্রপতিও অত্যাবশ্যকীয় অবস্থায় সেই বিষয়ক হুকুম আইন প্রণয়ন করিতে পারেন না।

(5) রাষ্ট্রপতির মার্জনা করিবার ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি শাস্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির শাস্তি :

(ক) সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বা কোন শর্তসাপেক্ষে মকুব করিতে পারেন ;

(খ) শাস্তিদান স্থগিত রাখিবার হুকুম (Reprieve) দিতে পারেন বা শাস্তি কমাইয়া দিতে পারেন ;

(গ) মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তিনি কোন শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের হুকুম দিতেও পারেন। বিচারকগণ আইন অনুযায়ী শাস্তি দিয়া থাকেন। তাঁহারা আইনের ধারা অনুযায়ী শাস্তি দানে বাধ্য থাকেন। কিন্তু দু-এক ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রপ্রধানরূপে রাষ্ট্রপতিকে সেইজন্য মার্জনা করিবার এই অধিকারটি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ক্ষমতাটির ব্যবহার মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শের উপর নির্ভর করে।

(6) রাষ্ট্রপতির অর্থবিষয়ক ক্ষমতা

ব্রিটেনে একটি পুরাতন সাংবিধানিক ব্যবস্থা মোটামুটি ভাবে এখনও

প্রচলিত আছে। তদনুযায়ী রাজা (বা রাণী) অর্থ দাবী করেন, কমন্‌স্‌ সভা উহা মঞ্জুর করেন এবং লর্ডসভা তাহা অনুমোদন করেন ("The King demands money, the Commons grant it and the Lords assent to it)। মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, ভারতীয় সংবিধানেও এই নীতিটির মূল কথাটি গৃহীত হইয়াছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি অর্থসম্বন্ধীয় দাবি মন্ত্রী মারফৎ পেশ করাইয়া থাকেন, লোকসভা তাহা মঞ্জুর করে এবং রাজ্যসভা তাহা স্বীকার করিয়া লয়; কারণ রাজ্যসভার অর্থ ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধে ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত।

রাষ্ট্রপতিকে প্রতি বৎসর, ঐ বৎসরের নির্ধারিত (Estimated) আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিবরণী বা বাজেট পার্লামেণ্টের নিকট পেশ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। একমাত্র তাঁহার সুপারিশ অনুসারে কোন কর ধার্য করা বা ঋণ গ্রহণ করা যাইতে পারে বা রাজস্ব সম্বন্ধীয় কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হইতে পারে। রাষ্ট্রপতি অর্থবিষয়ে যে সকল সুপারিশ করেন তাহা পার্লামেণ্ট বিবেচনা করিবে এবং মঞ্জুর করিবে বটে, কিন্তু পার্লামেণ্টের এই বিষয়ে অগ্রাধিকার নাই। সুপারিশ রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে আসিতে হইবে। বলাবাহুল্য যে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক, তাই তিনি অর্থবিষয়ে যে ক্ষমতার অধিকারী তাহা প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীরই অধিকার।

(7) দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

দেশের জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে সংবিধান দ্বারা বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। জরুরী অবস্থা তিন প্রকারের হইতে পারে:

(ক) যদি যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আভ্যন্তরীণ অশান্তির দরুণ ভারতের বা ভারতের কোন অংশের নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটে বা সম্ভাবনা দেখা দেয়;

(খ) যদি কোন রাজ্যে সংবিধানোক্ত শাসন পদ্ধতির অচলাবস্থা উপস্থিত হয়; এবং

(গ) ভারতের বা ভারতের কোন অংশের আর্থিক স্থিরতা ও সুনামের অভাবের দরুণ আর্থিক সংকট ঘটে। ঐ তিনটি অবস্থায় রাষ্ট্রপতি ঘোষণা বলে সংবিধানোক্ত জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন।

বলা বাহুল্য যে বিলাতের রাজা বা রানীর ন্যায় ভারতের রাষ্ট্রপতিও এই বিষয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন।

সংবিধানের এই অংশটি 1920 সালের ব্রিটিশ জরুরী ক্ষমতা আইনের 123 ধারার অনেকটা অনুরূপ। এই আইন অনুযায়ী রাজা বা রানীকে জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

ঐরূপ ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করিতে হইবে এবং উহা দুই মাস মাত্র কার্যকর থাকিবে, যদি সংসদের উভয় কক্ষ প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা ঐরূপ ঘোষণা সমর্থন না করে। লোকসভা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে—এইরূপ অবস্থায়ও রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার অধিকার আছে। বলা হইয়াছে যে জরুরী অবস্থা ঘোষণার দুই মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ ঘোষণাটি সমর্থন করিয়া প্রস্তাব পাশ করিবে, নতুবা ঘোষণা বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণার দুই মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে এবং লোকসভা কর্তৃক জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বেও রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিধান করা হইয়াছে যে নূতন লোকসভা অধিবেশনে মিলিত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতির জরুরী ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে অনুমোদিত হইতে হইবে। নতুবা ঘোষণা খারিজ হইয়া যাইবে।

রাষ্ট্রপতি ও একনায়কত্ব

রাষ্ট্রপতি কি মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিয়া এবং পার্লামেন্ট ভাঙিয়া দিয়া সমস্ত ক্ষমতা কার্যতঃ নিজহস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন? বিগত 25 বৎসরের মধ্যে এইরূপ ঘটনা ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দেয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে যে ঘটিবে না, তাহা কেহই নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারে না। তাই এই প্রশ্নটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

ভারতের লিখিত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যপক ও সুদূর-প্রসারী। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিবার সর্বময় কর্তা; সমস্ত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, হুকুম আইন (ordinance) প্রণয়নের একমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকর্তা এবং জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ শাসন প্রবর্তনের একমাত্র অধিকারী। সর্বোপরি রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙিয়া দিতে পারেন। পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রণীত সাধারণ বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহা আইনে পরিণত হইতে পারে না।

কিন্তু সাংবিধানিক প্রথা (custom of the constitution) অনুযায়ী এই সকল ক্ষমতা একমাত্র মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে তিনি ব্যবহার করিয়া থাকেন, নিজ ইচ্ছানুযায়ী নহে। ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপতি

রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দু-কোড বিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি ঐ বিলে সম্মতি দান করিয়াছিলেন। এই নিয়ম প্রায় 25 বৎসর বলবৎ আছে।

যদি সংবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে প্রশাসন ও আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ তদনুযায়ী Indian Law Institute এর উদ্বোধনী ভাষণে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী—এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। এই সূত্রে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতির মতবিরোধ হইয়াছিল। এই অবস্থায় উপরে উল্লিখিত প্রশ্নের আলোচনা অবান্তর নহে।

(1) প্রথমতঃ, দেখা যাইতে পারে সাধারণ অবস্থায়, অর্থাৎ জরুরী অবস্থা ব্যতিরেকে, রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ আছে কি নাই। যদি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিয়া এবং লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া শাসনভার নিজহস্তে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি বেশিদিন প্রশাসন চালাইতে পারেন না। কারণ অর্থ মঞ্জুরীর ক্ষমতা একমাত্র পার্লামেণ্টেরই আছে। তাই লোকসভার পুনর্নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পার্লামেণ্ট আহ্বান করা তাহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠে (সংবিধানের 112 ধারা দ্রষ্টব্য)। ইহা ব্যতীত 85 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের এক অধিবেশনের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পার্লামেণ্টই উহার পরবর্তী অধিবেশনে মিলিত হইবে ; এইরূপ ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব। সুতরাং রাষ্ট্রপতিকে বাধ্য হইয়া পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হইতে হয়। দেখা যাইতেছে যে সাধারণ অবস্থায় তাহার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। কিন্তু আরও একটি দিক হইতে বিষয়টি বিবেচ্য। রাষ্ট্রপতির পক্ষে একনায়ত্ব স্থাপনের প্রয়াস অত্যন্ত বিপজ্জনক। কারণ তিনি যদি ঐরূপ করেন তাহা হইলে পার্লামেণ্ট সংবিধানের 61 ধারা অনুযায়ী তাহাকে বিচারান্তর (impeachment) পদচ্যুত করিতেও পারে।

আরও একটি অবস্থা কল্পনা করা যাইতে পারে। রাষ্ট্রপতি তাঁহার বিরুদ্ধবাদী লোকসভা ভাঙিয়া দিলেন এবং নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেন। নির্বাচিত নূতন লোকসভা যদি রাষ্ট্রপতির একান্ত বশংবদ হয়, তাহা হইলে তিনি একটি বশংবদ মন্ত্রীমণ্ডলীও গঠন করিবার সুযোগ পাইতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার নিরঙ্কুশ সুবিধা থাকে।

প্রশ্ন উঠিতে পারে বিরুদ্ধবাদী লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের

ব্যবস্থা করিবার পর আইনের প্রয়োজন হইতে পারে। তখন রাষ্ট্রপতি কি করিবেন ? এই বিষয়ে সংবিধানই রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করিবে। হুকুম আইন বা অর্ডিনান্স্ প্রণয়ন ক্ষমতা সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে দিয়াছে। তাহারই বলে তিনি আবশ্যকীয় আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। নূতন লোকসভা যদি রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধবাদীও হয় তাহা হইলেও প্রায় ছয়মাসকাল রাষ্ট্রপতি একনায়কত্ব চালাইতে পারেন।

(2) দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া পার্লামেণ্ট ভাঙিয়া দিতে পারেন এবং তাহারই সঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিয়া নিজহস্তে ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারেন। সংবিধানের অষ্টাদশ অংশে (352 হইতে 360 ধারা) জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতিকে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংবিধানের আক্ষরিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি সেইসকল ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী।

কিন্তু এই ক্ষেত্রে দুইটি বাধা দেখা দিতেছে। প্রথমতঃ, সংবিধানের 85 ধারা অনুযায়ী পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন হইতে অন্য অধিবেশনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয়মাসের কম থাকা আবশ্যিক। সুতরাং ছয়মাস অতীত হইবার পূর্বেই নূতন নির্বাচনোত্তর পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বার্ষিক অর্থমঞ্জুরীর জন্য রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হইতেই হইবে। নতন লোকসভা যদি রাষ্ট্রপতির তাঁবেদারে পরিণত হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির একনায়কত্বের সুবিধা নিরঙ্কুশ হইতে পারে, নতুবা নহে।

ভারতে একনায়কত্বে বিশ্বাসী রাজনৈতিকদলের অভাব নাই। দ্বিতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রথাসমূহ ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যেরূপ মর্যাদা পায়, আমাদের দেশে একনায়কত্বে বিশ্বাসী দলগুলির প্রচারের ফলে সেরূপ মর্যাদা পায় কি না সন্দেহ। সুতরাং ভবিষ্যতে গণতন্ত্রকে বিনাশ করিয়া একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে হইতে পারে না এইরূপ ভবিষ্যৎ বাণী করা যায় না। এই সকল বিবেচনা করিয়া গণতন্ত্র রক্ষার্থে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রথানুযায়ী যাহা আপাততঃ দাঁড়াইয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে সংবিধানে লিখিত হওয়া উচিত। নতুবা ভবিষ্যতে কোন দুঃসাহসিক রাষ্ট্রপতি কতকগুলি দল কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া একনায়কত্বের পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

সংবিধানের চতুর্বিংশতিতম সংশোধনের দ্বারা পার্লামেণ্ট ভারতীয় সংবিধানের যে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করিবার ক্ষমতা হাতে লইয়াছে। ঐ সংশোধনের 368(2) ধারাতে বলা হইয়াছে যে যদি 368 ধারা

অনুসারে কোন বিল পার্লামেণ্টের উভয় সভায় বিধিমত পাশ হইয়া যায় তাহা হইলে যখন ঐরূপ বিল রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত হয় তাহার সম্মতিসূচক স্বাক্ষরের জন্য, তখন রাষ্ট্রপতি ঐ বিলে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য থাকিবেন। অর্থাৎ চিরাচরিত প্রথার উপর নির্ভর না করিয়া বিষয়টি সম্বন্ধে সুস্পষ্টরূপে ক্ষমতা সীমিত করা হইয়াছে। তেমনি রাষ্ট্রপতির আইনগত ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের (Constitutional government) যে প্রথাসমূহের উদ্ভব হইয়াছে তাহা লিখিতভাবে সংবিধানে স্থান দেওয়া উচিত। তাহা হইলে ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা রোধ করা যাইতে পারে। তবে সামরিক বা অন্য ধরনের বিপ্লবের মাধ্যমে যদি একনায়কত্ব আসে তাহা হইবে পৃথক ব্যাপার।

(8) রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা

প্রশাসনিক আইন সম্বন্ধীয় ও বিধান সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্যতীত রাষ্ট্রপতিকে নানা বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। পার্লামেণ্টের যুগ্ম অধিবেশন, মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক যুক্তভাবে প্রশাসন কার্য পরিচালন, রাষ্ট্রপতির নামে প্রশাসন সংক্রান্ত হুকুমজারি, রাষ্ট্র সংক্রান্ত কোন জরুরী বিষয় সুপ্রীম কোর্টের নিকট মতামতের জন্য প্রেরণ, পার্লামেণ্টের ব্যবস্থা অনুযায়ী নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়মাদি প্রণয়ন, পার্লামেণ্টের আইন সাপেক্ষে ইউনিয়ন চাকুরী কমিশনের কার্যাবলী এবং মোটামুটি ভাবে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সংবিধান অনুযায়ী সুষ্ঠু পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির আছে। নিয়মাবলী ঘোষিত ও প্রকাশিত হয় রাষ্ট্রপতিরই স্বাক্ষরে। লক্ষণীয় যে এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে বিভিন্ন মন্ত্রীগণই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কারণ রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) শাসক মাত্র।

সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন প্রণয়ন বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে ওয়াকিবহাল রাখা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। ঐ সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যদি কোন তথ্য জানিতে চাহেন তাহা হইলে যথাযথভাবে উহা রাষ্ট্রপতিকে জানানোও প্রধানমন্ত্রীর করণীয়। যদি কোন মন্ত্রী নিজ দায়িত্বে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ দিলে, ঐ বিষয়টি মন্ত্রীমণ্ডী কর্তৃক বিবেচনার জন্য দাখিল করা প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য। ওয়ালটার ব্যাজট্ (Walter Bagehot) বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর তিনটি মূল্যবান অলিখিত অধিকার আছে, যথা: right to be informed, right to advise এবং right to warn।

অর্থাৎ সকল বিষয় জানিবার অধিকার, উপদেশ দানের অধিকার ও সতর্ক করিয়া দিবার অধিকার। এই কয়টি অলিখিত ক্ষমতা ভারতীয় রাষ্ট্রপতিরও রহিয়াছে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনন চীন-ভারত যুদ্ধের সময় (1962) প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মেননের অকর্মণ্যতা ও তাঁহার বিরুদ্ধে তীব্র জনমতের কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে কৃষ্ণমেননকে মন্ত্রীমণ্ডলী হইতে বিদায় দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নেহেরু অনিচ্ছা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মেননকে পদত্যাগ করিতে উপদেশ দেন এবং তিনি তাহাই করেন।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি

কেহ কেহ ভারতের রাষ্ট্রপতির সহিত মার্কিন রাষ্ট্রপতির তুলনা করিয়াছেন। ইহা নিরর্থক, কারণ এই দুই দেশের রাষ্ট্রপতিদ্বয়ের মধ্যে নামমাত্র সাদৃশ্য রহিয়াছে, সত্যকার কোন মিল দেখা যায় না। ভারতীয় রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন নামেমাত্র পরোক্ষ, কিন্তু প্রথাগতভাবে তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে পরিণত হইয়াছে। প্রশাসনিকক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। ভারতের রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক (Formal) প্রশাসনিক কর্তা। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নামে মন্ত্রীমণ্ডলী ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের এবং অন্যান্য সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিজেই ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। ঐ সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে সেনেটের অনুমোদন অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু প্রথাগতভাবে সেনেট বাধা দানে বিরত থাকে ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী নিয়োগ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হয়। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি অনেকস্থলে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে এই বিষয়েও মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হইবে। ভারতের সংবিধানেও ঐরূপ একটি ধারা আছে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে বলা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সহায়তা ও পরামর্শ দিবার জন্য একটি মন্ত্রীমণ্ডলী থাকিবে। এই সঙ্গে আরও স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য যে সংবিধান পরিষদ অনেক বিচার বিবেচনার পর রাষ্ট্রপতিকে কেবলমাত্র নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে খসড়া সংবিধান প্রণেতা কমিটির সভাপতি ডঃ আম্বেদকরের উক্তি পুনরায় স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন "Under

the......Constitution the President occupies the same position as the king under the English Constitution."[1] অর্থাৎ সংবিধান অনুযায়ী ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে প্রকৃত ক্ষমতার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডের রাজার যে আসন সেই আসনই দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করিতেই হইবে। বিগত 25 বৎসর কালে প্রথাগতভাবে এই নিয়মটি বেশ দানা বাঁধিয়াছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি মন্ত্রীপরিষদ প্রথাগতভাবে উদ্ভূত হইয়াছে। ঐ পরিষদের সদস্যগণ মার্কিন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিবার অধিকার মার্কিন রাষ্ট্রপতির আছে। এই স্থলে ভারতীয় ব্যবস্থা ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা বিপরীত। ভারতীয় রাষ্ট্রপতিকে ইমপিচ্‌মেণ্ট দ্বারা পদচ্যুত করিবার ক্ষমতার সহিত মার্কিন মুলুকের সমপদাধিকারীকে পদচ্যুত করিবার Impeachment প্রথার কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সহিত ভারতীয় রাষ্ট্রপতির নাম ব্যতীত অন্য কোন অর্থপূর্ণ সাদৃশ্য নাই।

ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ও তাঁহার মন্ত্রীপরিষদ: ব্রিটেনের সহিত তুলনা

ভারতীয় রাষ্ট্রপতি যে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় একজন নিয়মতান্ত্রিক (Constitutional) শাসক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বিষয়ে সংবিধান পরিষদে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট লইয়া উঠিয়াছে। ঐ পরিষদের সদস্য, কে. শান্তনমের উক্তির মধ্য দিয়া ভারতীয় সংবিধানের মতে রাষ্ট্রপতির আসন কি প্রকারের তাহা প্রতিফলিত হইয়াছে। কে. শান্তনম্ বলিয়াছিলেন "It is the Prime Minister's business, with the support of the council of ministers, to rule the country and the President may be permitted now and then to aid and advise the council of ministers"[2]

অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর সমর্থনে দেশ শাসন করিবেন। শাসন কার্যের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আবশ্যক অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির সাহায্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ঐ বিষয়ে তাঁহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই।

নামেমাত্র অনেক ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা বা রানীর হস্তে দেওয়া

1 Constituent Assembly Debates ; VII, p. 32.

2 C. A. D. VII, p. 1155

হইয়াছে। কিন্তু সে সকল ক্ষমতা রাজার নামে ক্যাবিনেটই ব্যবহার করিয়া থাকে। রাজা বা রানী মন্ত্রী পরিষদের মতামত গ্রহণে বাধ্য, তাঁহার গত্যন্তর নাই। ভারতীয় রাষ্ট্রপতিরও সমাবস্থা। 1955 সালে রাম জাওয়াইয়া বনাম পাঞ্জাব সরকার মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. কে. মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করেন তাহা এই সূত্রে স্মরণীয়। তিনি বলিয়াছিলেন "The President has been made a formal or constitutional head of the executive and the real executive powers are vested in the ministers or the cabinet.....”[1] সংসদীয় গণতন্ত্রে, মন্ত্রীমণ্ডলী সংসদের নিম্নতন সভার নিকট যৌথভাবে দায়ী। দায়িত্ব যাহাদের ক্ষমতা তাঁহাদের, এই নীতি সর্বজন গ্রাহ্য। যেহেতু মন্ত্রীমণ্ডলী সংসদের নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল, সেই কারণে তাহারাই ক্ষমতার অধিকারী। এই যৌথ দায়িত্ব চারিটি নীতির উপর নির্ভরশীল।

প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন মন্ত্রী নিযুক্ত হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রধানমন্ত্রী যদি মনে করেন যে মন্ত্রীমণ্ডলীর কোন সদস্যকে পদচ্যুত করা উচিত তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঐ সদস্যকে পদচ্যুত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

তৃতীয়তঃ, যদি প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙ্গিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহা হইলে রাষ্ট্রপতিকে তাহা করিতেই হইবে।

চতুর্থতঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীকে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট হইতে হইবে। দেখা যাইতেছে যে মন্ত্রীমণ্ডলী সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রকৃত-পক্ষে সীমাবদ্ধ হইয়া আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গত পঁচিশ বছরে প্রথার মধ্য দিয়া রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বিবর্তিত হইয়া ব্রিটেনের রাজা বা রানীর সমপর্যায়ে পরিণত হইয়াছে।

সংবিধান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য আল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার বলিয়াছেন যে যদি রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ করেন তাহা হইলে সংবিধানে তাহার পদচ্যুতি সম্বন্ধে যে বিধান করা হইয়াছে তাহা প্রযুক্ত হইতে পারে। এই কারণেও রাষ্ট্রপতি কখনই মন্ত্রীপরিষদের মতবিরোধী হইবেন না, আশা করা যাইতে পারে।[2] ভারতীয় সংবিধান পরিষদের সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান পরিষদে বলিয়াছিলেন

1 1955, 2 S. C. R. 225 ; S. C.J. 304

2 C. A. D. X. p. 270

যে, যদিও সংবিধানে স্পষ্ট করিয়া কোথাও লিখিত হয় নাই যে রাষ্ট্রপতি ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক হইবেন এবং সেই অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ লইয়া চলিবেন তথাপি স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহাই সংবিধান পরিষদের অভিপ্রায়।[1] বস্তুতঃ প্রথাগতভাবে এই নীতিটি উদ্ভুত হইয়া কালক্রমে স্থিরনীতিরূপে দানা বাঁধিয়াছে। যদিও রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান পরিষদে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন তথাপি পরবর্তীকালে তিনি অন্যরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ দিল্লীর ভারতীয় আইন সংস্থার (Indian Law Institute) উদ্বোধন উপলক্ষে যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতেই হইবে এবং তিনি তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না—এইরূপ কোন নির্দেশ সংবিধানে নাই। তিনি আরও বলেন: দুঃখের বিষয় যে তথাপি অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ও ব্রিটেনের রাজা বা রানীর ক্ষমতা একই প্রকার। তাঁহার মতে এইরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক। শোনা যায় যে এই মন্তব্যের জন্য তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর সহিত রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের দারুণ মতান্তর ও মনান্তর ঘটিয়াছিল। এইস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এইক্ষেত্রে সংবিধান পরিষদের আলোচনার ধারা এবং প্রথাগত নিয়মের উপযুক্ত মূল্য দেন নাই। কিন্তু কার্যতঃ তাঁহাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবেই দশ বৎসর কাল রাষ্ট্রপতির কার্য চালাইতে হইয়াছিল। সকলেরই জানা আছে যে, ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ হিন্দু কোড্ বিলের ঘোর বিরোধী ছিলেন; কারণ তিনি সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীনপন্থী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু কোড্ বিলের ব্যক্তিগত বিরোধিতা সত্ত্বেও যখন পার্লামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হিন্দু কোড্ বিল তাঁহার নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত হইল, তখন তাঁহাকে ঐ বিল অনুমোদন করিয়া স্বাক্ষর করিতে হইল। এই ঘটনার পর হইতে রাষ্ট্রপতি যে নিয়মতান্ত্রিক শাসক এবং সেইজন্য তিনি যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য, এই নীতিটি আরও সুনিশ্চিতভাবে সংবিধানের সুদৃঢ় প্রথায় পরিণত হইয়াছে।

উপরাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির পরই পদমর্যাদায় উপরাষ্ট্রপতি স্থান পাইয়া থাকেন। উপরাষ্ট্রপতি পার্লামেণ্ট বা সংসদের উভয় কক্ষের সদস্যগণের যুক্ত

1 C. A. D. X. p. 988

অধিবেশনে নির্বাচিত হন। গোপন এবং একক হস্তান্তরযোগ্য আনুপাতিক প্রথায় ভোট গ্রহণ করা হয়। উপরাষ্ট্রপতি পদে তাঁহারাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন যাঁহারা :

(ক) ভারতীয় নাগরিক ;

(খ) অন্ততঃ 35 বৎসর বয়স্ক এবং

(গ) রাজ্যসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হইতে পারেন। যদি কেহ ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে লাভজনক কোন পদাধিকারী হন, অথবা রাজ্য সরকারের অধীনে কোন স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থার কর্মচারী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি উপরাষ্ট্রপতির পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন না। কিন্তু রাজ্যপাল বা ইউনিয়ন বা কোন রাজ্যের মন্ত্রীর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে কোন বাধা নাই। উপরাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীর কোন কক্ষের সদস্য থাকিতে পারেন না। এইরূপ ব্যক্তি যদি উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন তাহা হইলে যে তারিখে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেন সেই তারিখ হইতে তাঁহার সদস্যপদ বাতিল লইয়া যায়। উপরাষ্ট্রপতি পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন।

উপরাষ্ট্রপতির পদে শূন্যতা (Vacancy)

উপরাষ্ট্রপতির পদ, মৃত্যু, পদত্যাগ ও পদচ্যুতির দ্বারা খালি হইতে পারে। ঐ তিন অবস্থায়ই পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। নির্বাচন যত শীঘ্র সম্ভব সমাধা করিতে হইবে, সংবিধানে এইরূপ নির্দেশ আছে। ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন সমাধা করিতেই হইবে। যিনি নির্বাচিত হইবেন তিনি কর্মভার গ্রহণ করিবার দিন হইতে পাঁচ বৎসর উপরাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে ঐ মর্মে একটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন আবশ্যক। যে দিন ঐ প্রস্তাব আলোচিত হইবে তাহার অন্ততঃ চৌদ্দদিন পূর্বে ঐ প্রস্তাবের নোটিশ দিতে হইবে। যদি রাজ্যসভার উপস্থিত ভোটদানকারী সদস্যগণের অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব পাশ হয় এবং লোকসভায় যদি ঐ প্রস্তাব উপস্থিত ভোটদানকারী অধিকাংশ সদস্য কর্তৃক সমর্থিত হয়, তাহা হইলে উপরাষ্ট্রপতির পদচুতি ঘটে।

উপরাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার অধ্যক্ষতা করেন। রাষ্ট্রপতির

মৃত্যু, পদত্যাগ বা পদচ্যুতির ক্ষেত্রে উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হন। তিনি ঐ পদাধিকারী থাকেন যে পর্যন্ত না সাংবিধানিক নিয়মানুযায়ী নূতন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। যদি রাষ্ট্রপতি অসুস্থতা, অনুপস্থিতি বা অন্য কোন কারণে কার্যাবলী সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কর্তব্যাদি সম্পাদন করেন, যে পর্যন্ত না রাষ্ট্রপতি পুনরায় তাহার কর্তব্যাদি নির্বাহ করিতে আরম্ভ করেন। যখন উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন বা যখন তিনি রাষ্ট্রপতির কর্তব্য সম্পাদন করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদার অধিকারী হন এবং তিনি রাষ্ট্রপতির প্রাপ্য বেতনাদি পাইয়া থাকেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত বিধান

ভারতীয় সংবিধানে তিন প্রকার আপৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে বিধান করা হইয়াছে।

(1) **বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা :** রাষ্ট্রপতির যদি বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার ফলে ভারতের বা তাহার কোন অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে বা বিঘ্নিত হইবার আশু আশঙ্কা আছে, তাহা হইলে তিনি আপৎকালীন বা জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি নিজ ঘোষণা, পরবর্তীকালের ঘোষণা দ্বারা প্রত্যাহার করিতে পারেন। জরুরী অবস্থার ঘোষণা সংসদের উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করিতে হয়। যদি ঐ ঘোষণা পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ সমর্থন না করে তাহা হইলে ঘোষণার তারিখ হইতে দুইমাস উত্তীর্ণ হইলেই উহা বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু যদি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ ঐ ঘোষণা অনুমোদন করে তাহা হইলে উহা অনির্দিষ্টকালের জন্য বলবৎ থাকিতে পারে। বস্তুতঃ বলবৎ থাকিবার কালের ঊর্ধ্বসীমা সংবিধানে উল্লেখ নাই। পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল শেষ হইলে যদি ঘোষণা প্রকাশিত হয় কিংবা ঘোষণা প্রকাশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে যদি লোকসভা বাতিল হইয়া যায় তাহা হইলে রাজ্য পরিষদে ঘোষণাটি উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং যদি রাজ্য পরিষদ উহা সমর্থন না করে তাহা হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। যদি রাজ্যসভা ঐ ঘোষণা অনুমোদন করে, তথাপি নবগঠিত লোকসভা প্রথম অধিবেশনের দিন হইতে একমাসের মধ্যে যদি ঐ ঘোষণা সমর্থন না করে, তাহা হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়।

ঘোষণা চলতি থাকা কালে আপৎকালীন অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য পার্লামেণ্টের পাঁচ বৎসর আয়ুষ্কালের পরেও, উহার মেয়াদ এক একবার এক বৎসর করিয়া বাড়ানো চলে। একমাত্র পার্লামেণ্টই আয়ুষ্কাল বর্ধিত করিতে পারে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর ছয়মাসের বেশী পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল বাড়ানো চলে না।

ঘোষণার ফল

উপরোক্ত ঘোষণার ফল সুদূরপ্রসারী। প্রথমতঃ, যতদিন পর্যন্ত জরুরী অবস্থা চলিবে ততদিন রাষ্ট্রপতি (কার্যতঃ ইউনিয়ন সরকার) ঐ ঘোষণার

আওতায় যত রাজ্য আছে, তাহাদিগকে কিরূপে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে হইবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিতে পারে। অর্থাৎ জরুরী অবস্থা চলাকালে রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কার্যতঃ কেন্দ্রের হাতেই চলিয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা চলা কালে রাজ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারে। তৃতীয়তঃ, সংবিধানোক্ত রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজ্যের যে রাজস্ব প্রাপ্য, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে পারে অথবা যে কোনভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ব্যবস্থা রহিয়াছে যে রাষ্ট্রপতির ঐ সকল হুকুম পার্লামেণ্টের অনুমোদনের জন্য উভয় কক্ষে পেশ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, যতদিন আপৎকালীন ঘোষণা চালু থাকে ততদিন কেন্দ্র 19 ধারায় লিখিত মৌলিক অধিকার শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রয়োগে সাময়িক-ভাবে সীমিত বা অকেজো করিয়া দিতে পারে। পঞ্চমতঃ, মৌলিক অধিকার রক্ষাকল্পে আদালতের আশ্রয় লওয়ার যে অধিকার রহিয়াছে তাহা রাষ্ট্র সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিতে পারে। কিন্তু এই সকল হুকুমই পার্লামেণ্টের দুই কক্ষে অনুমোদনের জন্য পেশ করিতে হইবে। সংবিধানে 19 ধারায় যে সকল মৌলিক অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা জরুরী অবস্থায় স্থগিত থাকে—পূর্বে এই মত অনেকে পোষণ করিতেন। কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের রায় এই বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। সুপ্রীম কোর্ট 1964 সালের মাখন সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মোকদ্দমায় রায় দিয়াছে যে রাষ্ট্রপতির হুকুম দ্বারা মৌলিক অধিকারের সমর্থনে নাগরিকগণের আদালতের আশ্রয় গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হয়। এই অধিকারটুকুই স্থগিত থাকে মাত্র। নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারটি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয় না।

1962 সালে ভারত-চীন যুদ্ধ, 1965 সালে পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধ এবং 1971 সালে পুনরায় পাকিস্থানের সহিত যুদ্ধের সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইয়াছে এবং প্রতি বারই ভারতরক্ষা আইন (Defence of India Act) পাশ করা হইয়াছে। ভারতের প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য ঐ আইন অনুসারে অনেক ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

(2) **রাজ্য শাসনতন্ত্রে অচলাবস্থা :** যদি কোন রাজ্যের রাজ্য-পালের রিপোর্ট পাইয়া অথবা অন্য কোনভাবে সংবাদ পাইয়া রাষ্ট্রপতির বিশ্বাস জন্মে যে ঐ রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী সরকার পরিচালনা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে 356 ধারার বলে তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারেন এবং রাজ্যপালের বা অন্য যে কোন আধিকারিকের হস্তে ন্যস্ত শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আপন হাতে তুলিয়া লইতে

পারেন। ঘোষণা দ্বারা তিনি আরও স্থির করিতে পারেন যে, রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা বিধানমণ্ডলীর পরিবর্তে পার্লামেণ্টই ব্যবহার করিবে। পার্লামেণ্ট এই সকল ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন এবং পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রপতিকে এমন ক্ষমতা দিতে পারেন যাহার দ্বারা তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতা অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতেও পারেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করিবার অধিকারী। প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের যে কোন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বা আংশিক-ভাবে স্থগিত করিয়াও দিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হাইকোর্টের কোন ক্ষমতা নিজের হস্তে গ্রহণ করিতে পারেন না। এই ঘোষণা অনুযায়ী কাজ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি লোকসভার অধিবেশন স্থগিত থাকাকালে পার্লামেণ্ট-এর পরবর্তী অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।

352 ধারা অনুযায়ী যেমন জরুরী অবস্থায় সকল ঘোষণা এবং হুকুম পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করিতে হয়, তেমনি 356 ধারা অনুসারে ঘোষণা ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা আছে। পার্লামেণ্টের অনুমোদন দুইটি ক্ষেত্রেই অপরিহার্য।

356 ধারা অনুসারে ঘোষণার মেয়াদ দুই মাস। পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদ প্রস্তাব পাশ করিয়া ইহার কার্যকারিতার কাল আরও ছয় মাস বাড়াইয়া দিতে পারে। এই অতিরিক্ত ছয়মাসের পর পুনরায় প্রস্তাব করিয়া পার্লামেণ্ট ইহার মেয়াদ ছয় মাস করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তিন বৎসর পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করিতে পারে।

356 ধারাটি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার জন্য বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। রাজ্য মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে বিভিন্ন দলের সংহতির অভাবের দরুণ উপদলের উদ্ভব, ব্যক্তিগত স্বার্থে দায়িত্বহীনভাবে দলত্যাগ, রাজ্য মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ, সু-পরিকল্পিতভাবে সংবিধানোক্ত শাসনপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া দিবার প্রচেষ্টা প্রভৃতি কারণে বার বার সংবিধান অনুযায়ী শাসন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে এবং সংকট উপস্থিত হইয়াছে। সেইজন্য রাষ্ট্রপতি সংকটকালে 356 ধারা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

(3) **আর্থিক স্থায়িত্ব হানি :** যদি কোন সময় রাষ্ট্রপতির বিশ্বাস হয় যে ভারতের অথবা ভারতীয় রাষ্ট্রের যে কোন অংশের আর্থিক স্থায়িত্ব ও আর্থিক সুনাম বিপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি 360 ধারা অনুযায়ী তদনুরূপ ঘোষণা করিতে পারেন। এই ঘোষণা যতদিন বলবৎ থাকে ততদিন কেন্দ্রীয় সরকার সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে অর্থ সম্বন্ধীয় সকল প্রকার নির্দেশ দিতে

পারে। ইহা ব্যতীত সংবিধানের অন্য নির্দেশ সত্ত্বেও রাজ্যের আর্থিক উন্নতিকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার—

(ক) রাজ্য কর্মচারীবৃন্দের বেতন ও ভাতা কমাইয়া দিবার নির্দেশ দিতে পারে।

(খ) অর্থ বিল ও অন্যান্য বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক গৃহীত হইবার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য সংরক্ষিত রাখিবার নির্দেশ দিতে পারে।

(গ) ঘোষণা চলাকালে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সকল শ্রেণীর বা নির্দিষ্ট শ্রেণীর কর্মচারীগণের বেতন ও ভাতা হ্রাস করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। এমন কি প্রয়োজন হইলে সুপ্রীমকোর্টের ও হাইকোর্টের বিচারপতি-গণও এই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন।

অর্থ সংকট সম্বন্ধীয় জরুরী ঘোষণার মেয়াদের সম্বন্ধে নিয়মাবলী 352 (2) ধারার অনুরূপ। এই ঘোষণা ও তদনুযায়ী প্রদত্ত হুকুমাদি পার্লামেন্টের উভয় সভায় সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করাও বাধ্যতামূলক। এ সম্বন্ধেও 352 (2) ধারার অন্যান্য অংশ এই স্থলে প্রযোজ্য।

জরুরী ক্ষমতা সম্বন্ধে বিতর্ক

সংবিধান পরিষদে জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক ব্যবস্থাদিকে কেন্দ্র করিয়া প্রচণ্ড বিতর্কের সৃষ্টি হয়। কে. টি. শাহ,[1] হরিবিষ্ণু কামাথ,[2] শিব্বনলাল সাক্সেনা[3] প্রভৃতি বলেন যে জরুরী ব্যবস্থার অধ্যায়টি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাজ্যের সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যবহারের স্বাধীনতা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়া একটি একনায়কত্বপন্থী শাসনতন্ত্র কায়েম করিবে।

তাঁহারা আরও বলেন যে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ায় এইরূপ ক্ষমতা রাষ্ট্রপ্রধানকে দেওয়া হয় নাই। তাঁহারা যে সকল আপত্তি তুলিয়া ছিলেন তাহা এইরূপ:

(1) জরুরী অবস্থার অধ্যায়টি সংবিধানের যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি ধ্বংস করিয়া দিতেছে এবং কেন্দ্রকে সর্বশক্তিমান করিয়া তুলিতেছে।

(2) এ ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের শাসন ক্ষমতা ইউনিয়ন শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত হইতেছে।

(3) ইহার দ্বারা রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

1 C.A.D. IX, p. 539 and C.A.D. VIII, p. 196
2 C.A.D. IX, pp. 533-38
3 C.A.D. IX, p. 541

(4) রাজ্যের আর্থিক স্বাধীনতা ইহার দ্বারা রদ করা হইতেছে।

(5) জরুরী ব্যবস্থাদির ফলে মৌলিক অধিকারসমূহ অর্থহীন হইয়া পড়িবে এবং ভারতীয় সংবিধানের গণতান্ত্রিক ভিত্তি বিনষ্ট হইবে।

পরবর্তীকালেও জরুরী ব্যবস্থার সমালোচকেরা এই সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। অন্যপক্ষে ডঃ আম্বেদকর,[1] কে. শান্তনম্,[2] টি. টি. কৃষ্ণমাচারী,[3] নাজিরুদ্দিন আহমেদ[4] প্রভৃতি সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ বলেন যে জরুরী ক্ষমতা শীর্ষক ব্যবস্থাসমূহ অসাধারণ অবস্থাতেই প্রযোজ্য। ইহা জাতির স্বার্থেই প্রয়োজন। জরুরী অবস্থায় কেন্দ্র ব্যতীত অন্য কাহারও উপর নির্ভর করা চলে না। তাঁহারা আরও বলেন যে ইহাতে রাজ্যের অধিকার বা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বিপন্ন হইবে এবং রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব শুরু হইবে এইরূপ আশঙ্কা অমূলক।

স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে, জরুরী অবস্থায় প্রচুর ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত হইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি সাময়িকভাবে স্থগিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, যুদ্ধ, শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা, রাজ্যের দারুণ আর্থিক অবক্ষয়ের মোকাবিলা করিবার দায়িত্ব একমাত্র কেন্দ্রকেই দেওয়া চলে। কেন্দ্রীয় সরকার জাতির স্বার্থে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবে ইহাই সংবিধান প্রণেতাগণের কাম্য ছিল। অতিরিক্ত ক্ষমতা অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হইবে এবং রাষ্ট্রপতির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এইরূপ আশঙ্কা করা অমূলক, কারণ পার্লামেণ্ট ও জনমত কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে।

ডঃ আম্বেদকর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিয়া একাধিকবার সংবিধান পরিষদে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সংবিধান (Constitution) যুক্তরাষ্ট্রীয়, কিন্তু প্রয়োজন হইলে এই সংবিধানকে একতান্ত্রিক প্রবণতা দেওয়া চলে। জরুরী অবস্থায় এই প্রবণতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। ইহাতে রাষ্ট্রপতির অর্থাৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু জাতির স্বার্থে তাহা না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া যাইতে পারে।

যাহারা বলেন যে আমাদের সংবিধানের একমাত্র ভিত্তি ব্যক্তি-স্বাধীনতা তাহাদের সহিত একমত হওয়া সুকঠিন। সমগ্র জাতির কল্যাণ, সাম্য,

1 Constituent Assembly Debates, Vol. VII, p. 42
2 Ditto, IX, p. 153
3 C.A.D. IX, p. 125
4 C.A.D. IX, p. 116

স্বাধীনতা এবং আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ। জনগণের প্রকৃত স্বার্থ ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, সর্বাঙ্গীন ন্যায় বিচার ও জনগণের প্রকৃত স্বার্থ রক্ষার জন্যই আপৎকালে জরুরী ক্ষমতার আবশ্যক। ইহা ব্যতীত জরুরী অবস্থায় মৌলিক অধিকারের বিনাশ ঘটে এইরূপ যুক্তিও গ্রহণ করা চলে না। কারণ উহা সাময়িকভাবে জাতির স্বার্থে অকার্যকর হয় মাত্র। উহার বিনাশ ঘটে না ; ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষায় আদালতের আশ্রয় লইবার অধিকার সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। জাতির জরুরী স্বার্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে— এই নীতি স্মরণ রাখিলে রাষ্ট্রপতির আপৎকালীন ক্ষমতা সংবিধানের মৌলিক আদর্শ বিধ্বংসী বলিয়া মনে হয় না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী, মন্ত্রীপরিষদ (ক্যাবিনেট) ও পার্লামেণ্ট

সংসদীয় গণতন্ত্রে, গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদ বা পার্লামেণ্ট যেমন সমগ্রজাতির প্রতিনিধিস্থানীয় এবং আইন প্রণয়ণের অধিকর্তা, তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের ও জাতির সর্বাগ্রগণ্য কার্যনির্বাহক কমিটি। পার্লামেণ্ট ও তাহার নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রীমণ্ডলী সংসদীয় গণতন্ত্রকে (Parliamentary democracy) একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে।

মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্বশীলতার নীতি ঃ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহার মনোনয়ন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ রাষ্ট্রপতিকে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ-দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রীরূপে বাছিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রধান-মন্ত্রী যাঁহাদের মন্ত্রী পরিষদে লইতে চান তাহাদিগকে রাষ্ট্রপতির মনোনীত করিতেই হয়। এই দুইটি বিষয়ে তাঁহার গত্যন্তর নাই। পার্লামেণ্টের নির্দেশ সাপেক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলী জাতিকে আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য নেতৃত্ব দান করে। দায়িত্বশীল মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন আছে বলিয়া ইহার ক্ষমতা ব্যাপক, প্রায় বাধাহীন ও সর্বতোপ্রসারী। সংবিধানের 53(1) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির হস্তে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে। 74(1) ধারা অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ (Advice) ও সাহায্য (Aid) অনুসারে তিনি এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাষ্ট্রপতি নামেমাত্র রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান প্রশাসক, কিন্তু প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তা মন্ত্রীমণ্ডলী। সুতরাং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলীর স্থান অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তলাইয়া দেখিলে আরও একটি বিশেষত্ব চোখে পড়ে। প্রথার (Custom) মারফত মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্য হইতেই উহারই একটি ছোট কমিটি জন্মলাভ করিয়াছে। ইহাকে মন্ত্রীপরিষদ (Cabinet) বলা যাইতে পারে। এই ক্যাবিনেটই এখন সমগ্র প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রথার মধ্য দিয়া ভারত-সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক নিয়মের প্রকৃত পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে (Formally) সংবিধানের নিয়ম পালন করা

হইতেছে। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক প্রধান এবং মন্ত্রীমণ্ডলী সমষ্টিগতভাবে লোকসভার নিকট দায়ী, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছে মন্ত্রী পরিষদ (Cabinet)। মন্ত্রী পরিষদের সিদ্ধান্ত পরিষদের বাহিরের মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণকে মানিয়া লইতে হয়। তাঁহারা মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের সহিত যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল, যদিও মন্ত্রীপরিষদের বাহিরের মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনার সম্পূর্ণ সুযোগ নাই।

মন্ত্রীপরিষদ (Cabinet) ও মন্ত্রীমণ্ডলী (Council of Ministers)

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সংবিধানের 74(1) ধারা অনুসারে বিধান করা হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতিকে শাসনকার্যে সাহায্য করিবার ও পরামর্শ দিবার জন্য (Aid and Advice) রাষ্ট্রপতি একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করিবেন এবং তাহার পর প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীগণকে মনোনীত করিবেন। এইরূপে প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। লক্ষণীয় যে, সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যবৃন্দের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ নাই। কিন্তু প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমল হইতে প্রথানুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণের মধ্যে তিনটি শ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। এই তিন শ্রেণীর মন্ত্রী হইতেছেন:—(1) পূর্ণ মন্ত্রী, (2) রাষ্ট্র মন্ত্রী, (3) উপমন্ত্রী। মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধান প্রধান মন্ত্রীবর্গকে লইয়া ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়। ক্যাবিনেটই নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকেন এবং ক্যাবিনেটের নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী প্রশাসন কার্য চলে। রাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ক্যাবিনেটের বাহিরে থাকেন বটে, তবে কোন একটি বিশেষ দপ্তরের পূর্ণ-ভার তাহাদের উপর দেওয়া হইতে পারে। ঐ দপ্তর সংক্রান্ত কোন আলোচনার সময় তাহাদিগকে ক্যাবিনেটের অধিবেশনে আহ্বান করা হয়। উপ-মন্ত্রী কোন একটি বিশেষ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া উক্ত মন্ত্রীকে সাহায্য করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রিটেনের ন্যায় ভারতেও মন্ত্রীমণ্ডলীকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণ, যাহাদের সমষ্টিগতভাবে মন্ত্রীপরিষদ বলা যায় এবং ক্যাবিনেটের বাহিরের মন্ত্রীগণ। প্রশাসনিক কারণে, হয়তো বা দলীয় কারণেও মন্ত্রীমণ্ডলী অনেক সময় বৃহদাকার ধারণ করে। বৃহৎ মন্ত্রীমণ্ডলীতে গোপন ও ঘনিষ্ঠ আলোচনা সম্ভব হইয়া উঠে না। সেইজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রধানদের লইয়া ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হইয়া থাকে। মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রিটেনের ন্যায় ভারতে ক্যাবিনেটের বা মন্ত্রী পরিষদের

সদস্য সংখ্যার কিছুই স্থিরতা নাই। প্রধান মন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের সদস্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়। সেই সংখ্যা তিনি প্রয়োজনবোধে বাড়াইতে পারেন। ব্রিটেনে ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের বাহিরের মন্ত্রী—এই দুই শ্রেণীর মন্ত্রীদের লইয়া মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। ভারতেও ব্রিটেনের ধারা অনুসৃত হইয়াছে। ব্রিটেনের ন্যায় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী ক্যাবিনেটের বা মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা যেমন কমন্‌স্‌ সভার নিকট দায়ী, তেমনি ভারতে মন্ত্রীপরিষদ তথা মন্ত্রীমণ্ডলী ভারতীয় সংসদের নিম্নতন সভা অর্থাৎ লোকসভার নিকট দায়ী। ব্রিটেনে যেমন একটি ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট বা ক্যাবিনেটের নিজস্ব দপ্তরখানা আছে তেমনি ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু একটি মন্ত্রী পরিষদীয় দপ্তরখানা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহা এখনও বিদ্যমান। ভারতের মন্ত্রীমণ্ডলী লিখিত সংবিধানে স্থান পাইয়াছে, ব্রিটেনে সেরূপ ব্যবস্থা নাই। সেখানে ক্যাবিনেটসহ মন্ত্রীমণ্ডলী প্রথাগতভাবে উদ্ভূত হইয়াছিল এবং কেবলমাত্র বিংশ শতাব্দীতে কিছুটা সরকারী স্বীকৃতি পাইয়াছে। উভয়দেশেই ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাসনযন্ত্র।

আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ (Inner Cabinet)

মন্ত্রীমণ্ডলীর (Council of Ministers) মধ্যে যেমন কয়েকজন পূর্ণমন্ত্রীকে লইয়া ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীপরিষদের উদ্ভব হইয়াছে, ঠিক একই কারণে আবার মন্ত্রীপরিষদের (Cabinet) মধ্যে আর একটি ক্ষুদ্র চক্র গড়িয়া উঠিয়াছে যাহাকে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ বা Inner Cabinet বলা যাইতে পারে। এই আভ্যন্তরীণ ক্ষুদ্র পরিষদটিতে কতজন মন্ত্রী থাকিবেন, কে কে থাকিবেন এবং কখন তাঁহাদিগকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করা হইবে—তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যাঁহাদের উপর তাঁহার বিশ্বাস (Confidence) আছে এবং যাঁহারা তাঁহাকে সত্যই পরামর্শ-দ্বারা সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, তাহাদিগকেই এই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদে (Inner Cabinet) স্থান দেওয়া হয়। গোপন পরামর্শ করিয়া দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্যই এই পরিষদটির উদ্ভব হইয়াছে।

নেহেরুর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময় যে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে বল্লভভাই প্যাটেল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ছিলেন। প্যাটেলের পরলোকপ্রাপ্তির পর নেহেরু একমাত্র আজাদকেই তাঁহার সর্বাপেক্ষা

বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া মনে করিতেন। আজাদের মৃত্যুর পর ক্যাবিনেটে নেহেরুর একাধিপত্য চলিতে থাকে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীত্ব অল্পকাল স্থায়ী ছিল; কিন্তু ঐ অল্পকালের মধ্যেই আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদের উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। তিনি প্রধানতঃ নির্ভর করিতেন টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, গুলজারিলাল নন্দ, এস. কে. পাতিল ও সঞ্জীভ রেড্ডির উপর। প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী এবং এই চারজনকে লইয়া তাঁহার আভ্যন্তরীণ পরিষদ গঠিত হইয়াছিল। শ্রীমতী গান্ধীর মন্ত্রীপরিষদে যে সকল ক্যাবিনেট মন্ত্রীগণের উপর তিনি সাধারণতঃ নির্ভর করিয়া থাকেন, সম্ভবতঃ তাঁহারা হইতেছেন, ফকরুদ্দীন আলী আহ্‌মেদ,[1] দুর্গাপ্রসাদ ধর, জগজীবন রাম ও যশবন্তরাও চ্যবন।

মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট একটি Informal বা লিখিত আইন হইতে একটি ব্যতিক্রম, ঠিক তেমনি আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ বা Inner Cabinet-ও ব্যতিক্রমের আর একটি উদাহরণ। মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে মন্ত্রীপরিষদ হইতেছে প্রথম চক্র; এই প্রথম চক্রটির মধ্যে আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীপরিষদ হইতেছে দ্বিতীয় চক্র।

ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদের (ক্যাবিনেটের) বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনে ক্যাবিনেট-সরকারের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, ভারতেও মন্ত্রীপরিষদের সেই সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদীয় সরকারের লক্ষণগুলি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে: (ক) যদি'ও রাষ্ট্রপতি আইনতঃ প্রশাসন যন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় তথাপি কার্যতঃ মন্ত্রীপরিষদ বা মন্ত্রী-মণ্ডলীতে তাঁহার স্থান নাই। ব্রিটেনে রাজা বা রানী তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলীর 'ও ক্যাবিনেটের বাহিরে রহিয়াছেন, যদিও তিনি ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার প্রধান। (খ) মন্ত্রীপরিষদ তথা মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত লোকসভার ঘনিষ্ঠ যোগ ভারতের মন্ত্রীপরিষদীয় সরকারের আর একটি বিশেষ লক্ষণ। লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের মতামত মন্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলীতে প্রতিফলিত হয়। বলা যাইতে পারে যে, পরোক্ষভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীকে লোকসভাই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। ব্রিটেনের মন্ত্রীমণ্ডলী ও ক্যাবিনেট তেমনি কমন্‌স সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। (গ) ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদের বা মন্ত্রীসভার একত্ব--ইহার আর একটি বিশেষত্ব। মন্ত্রীমণ্ডলী পার্লামেন্টে একতাবদ্ধ থাকেন এবং একই নীতি লইয়া অগ্রসর হন। জনগণের নিকটও তাঁহারা

1 ইনি 1974 সালে রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ঐরূপ সমষ্টিগতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। আবার রাষ্ট্রপতির নিকটও তাঁহাদের একত্ব বজায় রাখিতে হয়। ইহার কারণ এই যে একই দলভুক্ত ব্যক্তিবর্গ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করেন। দলের নীতি দ্বারা তাঁহারা ঐক্যবদ্ধ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে তাঁহাদের ঐক্য ত্রিমুখী। পার্লামেণ্ট, জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তাঁহারা নীতিগতভাবে অভিন্ন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহাদের একই নীতি প্রকাশ ও সমর্থন করিতে হয়। যদি কোন মন্ত্রী নিজস্ব মতামত প্রকাশ করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীপদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপ অবস্থায় তিনি যে সভার সদস্য সেই সভার অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া বিবৃতি দিতে পারেন। মন্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলীর সমষ্টিগত সত্তার আর একটি দিক আছে। পার্লামেন্টের কিছু সদস্য যদি কোন একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন, তাহা হইলে সমগ্র মন্ত্রীসভার উপরই অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইবে। কারণ পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব যৌথ। সুতরাং যৌথভাবেই মন্ত্রীপরিষদকে দায়ী করিয়া অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। (ঘ) ভারতীয় মন্ত্রীমণ্ডলীতে তথা মন্ত্রীপরিষদে **(Cabinet)** প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রাধান্য। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্টপতি অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিযুক্ত করেন। তিনিই মন্ত্রীপরিষদকে ও মন্ত্রীমণ্ডলীকে সক্রিয় করিয়া তোলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে ও পরিচালনাধীনে, প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রীমণ্ডলী যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ব্রিটেনেও প্রধানমন্ত্রীর এইরূপ প্রাধান্য ও নেতৃত্ব বর্তমান। (ঙ) মন্ত্রী-মণ্ডলীর সকলকেই পার্লামেন্ট বা সংসদের সদস্য হইতে হইবে। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে সংসদের বাহিরের ব্যক্তিকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সেইরূপ মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে লোকসভা বা রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি মন্ত্রীপদে থাকিতে পারেন না। মন্ত্রীগণ হয় রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য হইতে পারেন, উভয় কক্ষের নহে। মন্ত্রীগণ একটি কক্ষের সদস্য থাকেন তথাপি তাঁহারা যে কোন সভায় উপস্থিত হইয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। সংসদীয় গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে মন্ত্রীগণের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিবার অধিকার পার্লামেন্টের আছে; এইজন্যই সকল মন্ত্রীকে পার্লামেন্টের সদস্য হইতে হয়। মন্ত্রীগণকে পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উপস্থিত হইয়া বিভাগীয় নীতি বুঝাইতে হয় এবং সমালোচনার উত্তর দিতে হয়। (চ) পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে মন্ত্রীমণ্ডলী যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়িত্ব-শীল। যদি লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা

প্রকাশ করেন, বাজেট বা কোন রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটিতে মন্ত্রীমণ্ডলী যদি লোকসভায় পরাজিত হন, তাহা হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর যৌথদায়িত্ব হইতেছে সমষ্টিগত দায়িত্ব। তাঁহারা সমষ্টিগতভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীতে প্রবেশ করেন। যতদিন পর্যন্ত তাহাদের প্রতি পার্লামেন্টের বিশ্বাস থাকে অর্থাৎ যতদিন মন্ত্রীমণ্ডলী পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন পাইতে থাকেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহারা নিজ নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন। ব্রিটেনে প্রথাগতভাবে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট কমন্স্ সভার নিকট দায়ী; ভারতে লোকসভার নিকট মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্ব সংবিধানগত (73(3) ধারা)। মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে লোকসভার অন্ততঃ ত্রিশজন সদস্যকে সেই প্রস্তাবের সমর্থনে দাঁড়াইতে হইবে। যদি কোন মন্ত্রী বিশেষের প্রতি অনাস্থা থাকে তাহা হইলেও সমগ্রমন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনিতে হইবে, সেই বিশেষ মন্ত্রীর প্রতি নহে, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কারণ, সংসদের নিকট মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব যৌথ এবং পার্লামেন্টে মন্ত্রীমণ্ডলীর রাজনৈতিক সত্তা অভিন্ন।

ভারতীয় ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের পাঁচটি প্রধান কর্তব্য রহিয়াছে। এইসকল কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইলেই প্রশাসন ব্যবস্থা সার্থক হইয়া উঠে। প্রথমতঃ, ক্যাবিনেট সকল আইন সম্বন্ধীয় খসড়া প্রস্তাব বিল আকারে পার্লামেন্টে দাখিল করিবার পূর্বে বিচার বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করে। দ্বিতীয়তঃ, সকল প্রধান প্রধান নিয়োগ ক্যাবিনেটের সম্মতিক্রমেই হইয়া থাকে। এই স্থলে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর মতামত অনুসারেই সাধারণতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তৃতীয়তঃ, অর্থবন্টন বা অন্য কোন বিষয়ে বিভিন্ন বিভাগের দ্বন্দ্ব ক্যাবিনেটই নিষ্পত্তি করিয়া দেয়। এই ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর মতামত প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, সরকারের বিভিন্ন রকমের কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থার একটি সংহত রূপ দান করে। পঞ্চমতঃ, যুদ্ধ ও শান্তি এবং পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আধুনিককালে ক্যাবিনেটের কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে ক্যাবিনেটের পরামর্শদাতা নানা কমিটি গঠিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ক্যাবিনেট কমিটিগুলির সদস্যগণকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী হইতে হইবে। কমিটির সংখ্যা নির্ণয়, সদস্যগণকে বিভিন্ন কমিটিতে মনোনয়ন

প্রধান মন্ত্রীই করিয়া থাকেন। তিনি প্রতি কমিটির সভাপতিরূপেও কাজ করেন। দুই-ধরনের কমিটি আছে, কতকগুলি স্থায়ী আর কতকগুলি অস্থায়ী কমিটি। ক্যাবিনেটের চারিটি স্থায়ী কমিটি, যথা: প্রতিরক্ষা কমিটি (Defence Committee), অর্থনৈতিক কমিটি (Economic Committee), প্রশাসনিক কমিটি (Administrative Committee), সংসদীয় (Parliamentary Committee) ও আইন বিষয়ক কমিটি (Legal Affairs Committee)। সাময়িক কাজের তাগিদে অস্থায়ী কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। কমিটি-গুলির শাখা কমিটি (Sub-committee) গঠনও মাঝে মাঝে দরকার হইয়া পড়ে। ক্যাবিনেট সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন মিলিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতি ক্যাবিনেট সভার জন্য দ্রষ্টব্য কাগজপত্র ক্যাবিনেট দপ্তর (Cabinet Secretariat) প্রস্তুত করিয়া সভার বেশ কিছুদিন পূর্বে ক্যাবিনেটের বিভিন্ন সদস্যদের নিকট প্রেরণ করে। প্রয়োজন হইলে প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি-ক্রমে কোন মন্ত্রী স্মারকলিপি পাঠাইতে পারেন। এই সকল কাজে ক্যাবিনেট দপ্তর আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে। একজন পুরাতন ও অভিজ্ঞ উচ্চ কর্মচারী ক্যাবিনেট দপ্তরের আধিকারিক হিসাবে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত-গুলি লিপিবদ্ধ হইয়া ক্যাবিনেটের সদস্যগণের নিকট প্রেরিত হয়। সকল কাজেই প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে।

ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর স্থান

(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় রাজনীতি, প্রশাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্রের সামগ্রিক নীতি নির্ধারণের বিষয়ে নেতৃত্ব করেন। তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি অন্যান্য মন্ত্রীগণকে নিযুক্ত করেন। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করিয়া দেন। কোন মন্ত্রীকে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে বদলি করিবার ক্ষমতা তাঁহার রহিয়াছে। যে কোন মন্ত্রীকে তিনি পদচ্যুত করিতেও পারেন। সমস্ত মন্ত্রীমণ্ডলী ভাঙিয়া দেওয়ার ক্ষমতারও তিনি অধিকারী। এইসকল ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে বাধ্য থাকেন। তাঁহার নির্দেশে, তাঁহার দ্বারা নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে মন্ত্রীমণ্ডলীর বা

ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। তিনি মন্ত্রীমণ্ডলীর সভাপতি এবং মন্ত্রীমণ্ডলীতে তাঁহার স্থান সর্বোচ্চে। বলা বাহুল্য যে, প্রধানমন্ত্রীর স্থান বহুল পরিমাণে তাঁহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে। জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীমণ্ডলীতে যেরূপ অপ্রতিহত প্রতাপ ছিল, ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সে স্থান ছিল না। দুই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের পার্থক্যের জন্যই মন্ত্রী-মণ্ডলীতে তাঁহাদের দুইজনের স্থান বিভিন্ন ছিল। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব তাঁহাকে তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীতে একটি অভাবনীয় আসনের অধিকারী করিয়াছে। বিভিন্ন মন্ত্রীর অধীনস্থ বিভাগগুলির প্রশাসনিক নীতি সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান প্রধানমন্ত্রীরই ক্ষমতার অন্তর্গত। তিনিই বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলির কার্যাবলী সংহত (co-ordinate) করিয়া প্রশাসনকে একটি সামগ্রিকতা দান করেন।

(খ) ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টের নেতার আসনে অধিষ্ঠিত। পার্লামেন্টে তাঁহার দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন তাঁহার মন্ত্রীসভা কর্তৃক আনীত আইন বা প্রস্তাবাদি লোকসভায় সহজেই গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে প্রশাসনিক ও আইন-প্রণয়নের দিক হইতে প্রধান-মন্ত্রীর হস্তে বিপুল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে।

(গ) পরোক্ষভাবে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনগণের প্রতিভূ-স্থানীয়; কারণ নির্বাচনে তাঁহারই নেতৃত্বে তাঁহার দল জনসাধারণের ভোটে পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। জনগণ আশা করে যে, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁহার দল যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার দল সেই অনুযায়ী প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন। তাই প্রধান-মন্ত্রীকে জনগণের নিকট রাজনৈতিক দিক হইতে জবাবদিহি করিতে হয়। জনগণের কক্ষ লোকসভার নিকট তাঁহার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ, জনগণের নিকট তাঁহার দায়িত্ব পরোক্ষ।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা এবং তিনিই তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে যোগসূত্র। সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর উপর কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, মন্ত্রীপরিষদ রাষ্ট্রের প্রশাসন ও আইন সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হন, রাষ্ট্রপতিকে তাহা যথাযথ জানাইবার ভার প্রধানমন্ত্রীর উপর। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি যদি উপরোক্ত বিষয়ে কোন তথ্য জানিতে চাহেন, তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রীকেই তাঁহার প্রার্থিত তথ্য যথাযথ জানাইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, যদি কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদে আলোচনা না করিয়া সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নির্দেশ

দিতে পারেন যে আলোচনার জন্য ঐ বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদে পেশ করা হউক। এইরূপ অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে হইবে।

উপ-প্রধান মন্ত্রী

1947 সালে গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি হয়। নেহেরু প্রধান মন্ত্রী এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল উপ-প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্যাটেল 1947 হইতে তাঁহার মৃত্যু (1950) পর্যন্ত উপ-প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1950 হইতে 1966 সাল পর্যন্ত ভারতের কোন উপ-প্রধান মন্ত্রী ছিলনা। 1966 সালে লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরলোক গমনের পর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হইলেন। সেই সময় হইতে 1969 সাল পর্যন্ত মোরারজি দেশাই উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 1969 সালে কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহার পর আর কেহ উপ-প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন নাই। উপ-প্রধানমন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্যাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কিন্তু উপ-প্রধানমন্ত্রীর পদ-সৃষ্টি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। উপরোক্ত উভয় ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট উপ-প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের ব্যক্তিত্ব ও দলীয় মর্যাদা বিবেচনা করিয়াই নূতন পদের সৃষ্টি করা হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী (Council of Ministers), মন্ত্রীপরিষদ (ক্যাবিনেট্) ও পার্লামেণ্ট

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রীপরিষদ (ক্যাবিনেট) মন্ত্রীমণ্ডলীর (Council of Ministers) অন্তর্গত কয়েকজন বিশিষ্ট মন্ত্রীগণের অপেক্ষাকৃত ছোট বৈঠক। দ্রুত, গোপন এবং ঘনিষ্ঠ আলোচনার জন্যই এই ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। মন্ত্রী পরিষদের নেতৃত্বে রহিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনিই মন্ত্রী পরিষদের মন্ত্রীগণকে মনোনীত করেন এবং তাহার সংখ্যা নির্ধারণ করেন। তিনি পরিষদের মন্ত্রীসংখ্যা নিজ ইচ্ছানুযায়ী কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন। এক বিভাগের পরিষদীয় মন্ত্রীকে অন্য বিভাগ দেওয়ার ক্ষমতাও তাঁহার আছে। মন্ত্রীপরিষদ স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সৃষ্টি। কিন্তু প্রথাগতভাবে জন্মলাভ করিয়া এই মন্ত্রী বৈঠকটি

ভারতের কেন্দ্রীয় প্রশাসনে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রী পরিষদের বাহিরে মন্ত্রীমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যগণ পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রথার মধ্য দিয়া উদ্ভূত এই পরিষদটি বৃহত্তর মন্ত্রীমণ্ডলীর সাংবিধানিক ক্ষমতা দখল করিয়া লইয়াছে। আইনের চক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলী (Council of Ministers) প্রশাসন চালাইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিষদই প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণ করে।

(ক) পার্লামেন্ট বা কেন্দ্রীয় সংসদের সহিত মন্ত্রীমণ্ডলীর তথা মন্ত্রী-পরিষদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। প্রথমতঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীর সকলকেই সংসদের সদস্য হইতে হইবে। প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশে রাষ্ট্রপতি সংসদের বাহিরের ব্যক্তি-কেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিতে পারেন; কিন্তু সেইরূপে নিয়োগপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে হয় লোকসভা, না হয় রাজ্যসভার সদস্য হইতে হইবে। তাহা না হইলে তিনি মন্ত্রীপদে থাকিতে পারেন না। মন্ত্রীগণ একটি কক্ষের সদস্য থাকেন তথাপি তাঁহারা যে কোন কক্ষে উপস্থিত হইয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে কক্ষের সদস্য নহেন: সে কক্ষে ভোট দিতে পারেন না। সংসদীয় গণতন্ত্রে (Parliamentary Democracy) মন্ত্রীগণের কার্যাবলী সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হয়। মন্ত্রীগণ পার্লামেণ্টের সদস্য হইয়া সভায় উপস্থিত থাকিলে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। এই কারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীগণকে পার্লামেণ্টের সদস্য থাকিতে হইবে—এই নীতিটি গৃহীত হইয়াছে।

(খ) পার্লামেণ্ট বা সংসদ নানাভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করে। (1) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যম: কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রীকে ঐ বিভাগ সম্বন্ধীয় প্রশাসন সম্বন্ধে যে কোন সংসদীয় সদস্য প্রশ্ন করিতে পারেন। মন্ত্রীমহাশয়কে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিত বা মৌখিক উত্তর দিতে হইবে। মন্ত্রীর উত্তরের উপর ভিত্তি করিয়া সদস্যগণ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। (2) বক্তৃতা ও সমালোচনার মাধ্যম: যে কোন সদস্য পার্লা-মেণ্টে উত্থাপিত যে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া কোন মন্ত্রীর বা মন্ত্রীমণ্ডলীর সমালোচনা করিতে পারেন। (3) বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল ও বিভাগীয় অর্থ বন্টনের আলোচনা কালে সদস্যগণের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হয়। তখন তাঁহারা ব্যাপকভাবে প্রতি বিভাগ সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে পারেন। এই সূত্রে আনীত কোন অর্থবিলে মন্ত্রীমণ্ডলীর হার হইলে, তাঁহারা

পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। (4) অনাস্থা প্রস্তাবঃ সদস্যগণ সমগ্র মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করিবার অধিকারী। অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলেও মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। (5) অনুসন্ধান কমিশন নিয়োগঃ পার্লামেণ্ট প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কোন বিষয়ে অনুসন্ধান কমিশন নিযুক্ত করিতে পারে। কমিশনের বিবরণী (Report) সংসদে পেশ করিতে হয়। পার্লামেন্ট উহার সমালোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।

সংবিধানগত ভাবে মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। কিন্তু এই দায়িত্বশীলতা কার্যক্ষেত্রে কতটা সত্য হইয়া উঠে তাহা বিবেচনার বিষয়। প্রথমতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভার অধিকাংশ সদস্যগণের সমর্থন পুষ্ট। তাহা না হইলে মন্ত্রীমণ্ডলী কিছুতেই টিকিয়া থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় এবং এইজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাঁহারা সর্বক্ষেত্রে সমর্থন করিয়া থাকেন। এইরূপ দলীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্য লোকসভার উপর মন্ত্রীমণ্ডলীর একটি পরোক্ষ ক্ষমতা গড়িয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যদিও ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভার নিকট দায়িত্বশীল, প্রকৃতপক্ষে এই দায়িত্বশীলতা নামেমাত্র পর্যবসিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আমল হইতে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্ব পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, কংগ্রেস দল লোকসভায় যেরূপ লক্ষণীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে তাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলীই স্বচ্ছন্দে লোকসভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কার্যতঃ লোকসভা মন্ত্রী পরিষদকে সমালোচনার মাধ্যমে যতটা সম্ভব, ততটা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলীর পদচ্যুতি ঘটাইবার ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে লোকসভা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব অবিসংবাদীভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর (প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীপরিষদের) হাতে আসিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক র‍্যামসে মূয়র (Ramsay Muir) বলিয়াছেন যে, কমন্‌স্‌ সভায় দলীয় রাজনীতির বিবর্তন হেতু বিলাতে ক্যাবিনেট কার্যতঃ একনায়কত্ব লাভ করিয়াছে।[1] ভারতেও দলীয় সরকারের বিবর্তনের ফলে ঐরূপ ধারা লক্ষ্য করা যাইতেছে। কিন্তু দলীয় নিয়মানুবর্তিতা ব্যতীত লোকসভার ক্ষমতার অবক্ষয় অন্য কারণেও হইয়াছে। প্রথমতঃ, প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য থাকেন।

---

1 Ramsay Muir: How Britain is Governed (Constable—1933) p. 81-91.

প্রথার মধ্য দিয়া এই নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। অর্থাৎ যদি লোকসভা মন্ত্রীমণ্ডলীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে তাহা হইলে মন্ত্রীসভাও লোকসভার আয়ুষ্কাল সমাপ্ত করিয়া দিতে পারে। এইজন্য লোকসভা অনাস্থা প্রস্তাব বা অনুরূপ কোন প্রস্তাব পাশ করিতে স্বভাবতঃই দ্বিধা বোধ করে। এই স্থলে মনে রাখা আবশ্যক যে লোকসভার নির্বাচনকেন্দ্রগুলি বৃহৎ ও বিস্তৃত। নির্বাচন দ্বন্দ্ব বিপুল পরিশ্রম ও ব্যয় সাপেক্ষ; এই অবস্থায় লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিলে সদস্যগণ পুনরায় নির্বাচিত হইয়া লোকসভার সদস্যরূপে আসিতে পারিবেন কি না তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই সকল কারণে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে লোকসভার সদস্যগণ অত্যন্ত সতর্কতাব সহিত ঐ চরম ক্ষমতা ব্যবহার করা উচিত কিনা, তাহা বিবেচনা করেন। 1971 সালে শ্রীমতী গান্ধী লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন লোকসভা নির্বাচনের পরামর্শ রাষ্ট্রপতিকে দিয়াছিলেন। বাষ্ট্রপতি সেই অনুযায়ী কাজও করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া ভারতীয় সংবিধানের ইতিহাসে 1971-এব নির্বাচনেব পটভূমিকা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংসদীয় নির্বাচনকে বিধানসভার নির্বাচন হইতে বিযুক্ত করিবার ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

ষোড়শ অধ্যায়

পার্লামেণ্ট বা সংসদ

সংবিধানের 79 ধারায় লিখিত হইয়াছে যে, ভারতীয় ইউনিয়নের পার্লামেণ্ট বা সংসদ রাষ্ট্রপতি ও দুইটি কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা (Council of States) ও লোকসভা (House of the People) লইয়া গঠিত হইবে। বিশেষ লক্ষণীয় যে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য থাকিতে পারেন না। কিন্তু তিনি আইন-প্রণয়নের ক্ষেত্রে সভাদ্বয়ের অপরিহার্য অংশ। বলা বাহুল্য, এই বিষয়ে ব্রিটেনের সাংবিধানিক ধারা অনুসরণ করা হইয়াছে। ব্রিটেনে রাজা বা রানী কমন্স্ বা লর্ডস্‌সভার সদস্য নহেন, কিন্তু তথাপি তিনি পার্লামেণ্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্রিটেনে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা বা রানীর যেমন সম্মতি প্রয়োজন তেমনি ভারতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আইন প্রণয়নের জন্য আবশ্যক। অন্য দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অংশ নহেন, যদিও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে শেষ পর্যায়ে তাঁহার সম্মতি অপরিহার্য।

কেন্দ্রে দ্বিকক্ষ নীতি

পার্লামেণ্ট বা সংসদের দুইটি সভার মধ্যে রাজ্যসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির প্রতীক। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী ও ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহের প্রতিনিধি-বর্গ এবং কয়েকজন মনোনীত সদস্যবর্গকে লইয়া রাজ্যসভা গঠিত। লোকসভা ভারতের জাতীয় ও রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক। এই সভাটি ভারতের জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয়, সার্বজনীন বয়স্ক ভোটের (Adult franchise) মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত। ভারতে দ্বিকক্ষ নীতি (Bicameralism) গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে সংবিধান পরিষদে বিশেষ মতভেদ দেখা দেয় নাই। একজনমাত্র সদস্য এককক্ষ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। যাহা হউক, কেহ কেহ মনে করেন যে ভারতের দুইটি কক্ষের কোন আবশ্যকতা নাই। তাহারা এককক্ষ নীতির স্বপক্ষে যে সব যুক্তি দেখান তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে অবিবেচনা প্রসূত অতি ব্যস্ততার মধ্যে আইন প্রণয়নে রাজ্যসভা বাধা দিতে পারে নাই। দ্বিতীয়বার ব্যাপক আলোচনায়ও রাজ্যসভা বিশেষ দক্ষতা দেখাইতে পারে নাই। ঐ সভায় কেবল নিম্নতন পরিষদের যুক্তিতর্কের

পুনরাবৃত্তি হইয়াছে। রাজ্যসভায় জাতির ব্যয়ও কম নহে। রাজ্যসভা লোকসভারই একটি ছোট সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সুতরাং ইহার সংস্কার অথবা বিলোপ-সাধন কাম্য।

অধ্যাপক মরিস-জোন্স্ তাঁহার 'Government and Politics in India' পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, দুইটি কক্ষ আছে বলিয়া সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আলোচনার সুবিধা হয়। তাহা ছাড়া, আইন সংক্রান্ত কার্যাদি দুইকক্ষে ভাগ করিয়া দেওয়ায় ঐ বিষয়গুলির পর্যাপ্ত বিচার-বিবেচনার সুযোগ থাকে। কিন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে উপরিতন ও নিম্নতন পরিষদের সদস্যগণের রাজনৈতিক আচার ব্যবহারে বা তাহাদের কর্ম-পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। অর্থাৎ উপরিতন পরিষদ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল যাহাকে House of Statesman বা রাজনীতি বিশারদ-গণের কক্ষ বলিয়াছেন, সেইস্তরে উঠিতে পারে নাই সত্য, তথাপি যেহেতু ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সেইহেতু বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিনিধি-মূলক একটি ব্যবস্থাপকসভা থাকা আবশ্যক। রাজ্যসভা এই আবশ্যকতা পূরণ করিতেছে। ইহা ব্যতীত অল্পসংখ্যক হইলেও কিছু বিল রাজ্যসভায় উপস্থাপিত হইয়াছে। রাজ্যসভার প্রস্তাবিত কিছু কিছু সংশোধন প্রস্তাবও লোকসভা গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যসভার প্রয়োজনীয়তা নাই বলা অসমীচীন।

রাজ্যসভার গঠনপদ্ধতি

এই সভাটি 250 জনের অনধিক সদস্য লইয়া গঠিত হয়। চারুকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবায় যাহারা বৈশিষ্ট্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এইরূপ 12 জন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি সদস্যপদে নিয়োগ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য যে এই মনোনয়ন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই দেওয়া হইয়া থাকে। অবশিষ্ট 238 জনের অনধিক সদস্য বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী কর্তৃক আনুপাতিক একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের (Proportional Representation by the Method of Single Transferable Vote) সাহায্যে নির্বাচিত হইয়া থাকেন।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সেনেটে বা উপরিতন পরিষদে অন্তর্ভুক্ত রাজ্য-গুলির প্রতিনিধির সংখ্যা সর্বক্ষেত্রেই দুইজন। অর্থাৎ সেনেটে সমস্ত রাজ্যকেই সমপ্রতিনিধিত্ব দেওয়া হইয়াছে। স্যুইটজারল্যাণ্ডের উপরিতন

পরিষদের গঠনে সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি গৃহীত হইয়াছে। প্রতি ক্যাণ্টন হইতে দুইজন এবং প্রতি অর্ধক্যাণ্টন হইতে একজন নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি ভারতের রাজ্যসভার গঠনপদ্ধতিতে স্বীকৃত হয় নাই। ভারতে প্রতিরাজ্যের বা ইউনিয়ন অঞ্চলের জনসংখ্যার আনুপাতিক ভিত্তিতে প্রতিনিধির সংখ্যা স্থিরীকৃত হইয়াছে। রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব পরিহার করা গোঁড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতি হইতে একটি লক্ষণীয় বিচ্যুতি। অনেকে বলেন সংবিধানের এই বিধান ইউনিটারী বা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থারই অনুরূপ। সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন যে ইহার ফলে জনবহুল রাজ্যগুলির প্রতিনিধিসংখ্যা বেশি হইয়া থাকে। এইরূপ কয়েকটি রাজ্য একত্র হইয়া ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির স্বার্থ-পরিপন্থী কার্যে লিপ্ত হইতে সহজেই সুযোগ পাইতে পারে। এইরূপ সুযোগের মধ্যে 249 ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধারা অনুসারে রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রস্তাব করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারে যে জাতীয় স্বার্থে রাজ্যের ক্ষমতাধীন কোন বিষয় সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট আইন করিতে পারিবে। জনবহুল রাজ্যগুলির সদস্যবৃন্দ একত্রিত হইলে এইরূপ প্রস্তাব পাশ করা সহজ হয়। দেখা যাইতেছে যে, ইহার দ্বারা সংশ্লিষ্ট রাজ্য-গুলির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইয়া যায়। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় গঠন পদ্ধতি হইতে ব্যতিক্রম ঘটে। যাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থা সমর্থন করেন তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঙ্গত কারণেই ভারতে অনুসৃত হয় নাই। প্রতিরক্ষা, রাজনৈতিক ঐক্য, সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও সামাজিক ঐক্য ও আর্থিক উন্নয়নের প্রয়োজনে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় নহে, আধাযুক্তরাষ্ট্রীয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও এককেন্দ্রিক—এই দুই নীতির সংমিশ্রণে সংবিধান গঠিত হইয়াছে। সমালোচকেরা আরও বলিয়াছেন যে রাজ্যসভার সদস্যগণের পরোক্ষ নির্বাচনপদ্ধতি অগণতান্ত্রিক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের উপরিতন পরিষদ সেনেট-সদস্যগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। কিন্তু 1913 সালের পূর্বে আমেরিকার সেনেট-সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইতেন। প্রতি রাজ্যের বিধানমণ্ডলী ঐ রাজ্যের দুইজন সদস্য নির্বাচন করিয়া সেনেটে পাঠাইতেন। সুইটজারল্যাণ্ডে অধিকাংশ ক্যাণ্টনে (ক্যাণ্টনগুলি লইয়া সুইস্ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত) প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি ক্যাণ্টনে আবার পরোক্ষ নির্বাচন প্রথানুযায়ী ক্যাণ্টনের পরিষদ ঐ ক্যাণ্টন হইতে নির্ধারিত সদস্যসংখ্যা নির্বাচন করিয়া থাকেন। ভারতে এই প্রথাই গৃহীত হইয়াছে।

রাজ্যসভার সভাপতি

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকার বলে রাজ্যসভার সভাপতি। তিনিই রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে উপ-সভাপতি সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। উপসভাপতি রাজ্যসভার মধ্য হইতে ঐ সভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। যদি উপসভাপতি রাজ্যসভার সদস্য না থাকেন তাহা হইলে ঐ পদ শূন্য হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয় এবং পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যসভার উপসভাপতি সভাপতির নিকট পত্র লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারেন। যদি রাজ্যসভার মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ উপসভাপতির অপসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভোটে পাশ করেন তাহা হইলে উপসভাপতি তাহার পদ হইতে অপসারিত হইয়াছেন ধরিয়া লইতে হইবে। তবে এইরূপ প্রস্তাবের জন্য চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রয়োজন। যদি রাজ্যসভার সভাপতি ও উপসভাপতি, দুই পদই শূন্য হইয়া যায় তাহা হইলে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার যে কোন সদস্যকে সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করিতে পারেন।

রাজ্যসভার স্থায়িত্ব

রাজ্যসভার বিশেষত্ব এই যে ইহা একটি স্থায়ী সভা। লোকসভা প্রতি নির্বাচনের পর নূতন কলেবর ধারণ করে। রাজ্যসভার সদস্যগণ আমেরিকার সেনেটের সদস্যগণের ন্যায় ছয় বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তাহাদেরই মত দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশের কার্যকাল শেষ হয় এবং সেখানে নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই কারণে রাজ্যসভার রাজনৈতিক চরিত্র অনেক পরিমাণে অপরিবর্তিত থাকে।

রাজ্যসভার আসন বণ্টন

1972 সালের চব্বিশে জুন রাজ্যসভার সদস্য বণ্টন নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

অন্ধ্রপ্রদেশ	..	18
আসাম	..	7
বিহার	..	22
গুজরাট	..	11
হরিয়ানা	..	5
হিমাচল প্রদেশ	..	3
জম্মু ও কাশ্মীর	..	4

কেরল	..	9
মধ্যপ্রদেশ	..	16
মহারাষ্ট্র	..	19
মণিপুর	..	1
মেঘালয়	..	1
কর্ণাটক (মহীশূর)	..	12
নাগাল্যাণ্ড	.	1
ওড়িশ্যা	..	10
পাঞ্জাব	..	7
রাজস্থান	..	10
তামিলনাড়ু	..	18
ত্রিপুরা	..	1
উত্তরপ্রদেশ	..	34
পশ্চিমবঙ্গ	..	16
অরুণাচল	..	1
দিল্লী	..	3
মিজোরাম	..	1
পণ্ডিচেরী	..	1
মনোনীত	..	12
		243[1]

লোকসভা

লোকসভার সদস্য সংখ্যা 525। ইহার মধ্যে অনধিক 25 জন ইউনিয়ন অঞ্চল সমূহ হইতে পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী বাছিয়া লওয়া হয়। ইহারা পার্লামেণ্টের আইনবলে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইতেছেন; অবশিষ্ট 500 জন রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিরূপে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। বিভিন্ন রাজ্যসমূহের ভোটারগণ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা প্রতি রাজ্যের জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী আদমসুমারীর জনসংখ্যা এইক্ষেত্রে প্রামাণিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। লোকসভার সাধারণ আয়ুষ্কাল 5 বৎসর; কিন্তু এই আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি সভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি

1 সংবিধানের 36 তম সংশোধন অনুসারে সিকিম ভারতের সহযোগী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং সিকিমকে রাজ্যসভায় একটি আসন দেওয়া হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। নির্বাচনের পর সভার প্রথম অধিবেশনের দিন হইতে লোকসভার আয়ুষ্কাল গণনা করা হইয়া থাকে। সাধারণভাবে পার্লামেণ্টের আয়ু শেষ হইয়া গেলেও জাতীয় জরুরী অবস্থায় পার্লামেণ্ট এক এক বারে, এক বৎসরের জন্য লোকসভার আয়ু বাড়াইয়া দিতে পারে। জরুরী অবস্থার অবসান হইবার পর ছয় মাসের বেশিকাল লোকসভা জিয়াইয়া রাখা চলে না, যদি সাধারণভাবে পার্লামেণ্টের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া গিয়া থাকে।

রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়া ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায় যথাযোগ্যভাবে লোকসভায় প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তিনি অনধিক দুইজন ইঙ্গ-ভারতীয়কে লোকসভার সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারেন। নির্বাচনে তপশীলী জাতি (ব´) ও তপশীলী আদিবাসী (উপজাতি)দের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। সংবিধানে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, সংবিধান চালু হইবার 10 বৎসর পর এই সুবিধা বাতিল হইয়া যাইবে, কিন্তু বর্ণ ও উপজাতির দাবি অনুযায়ী 1960 সাল হইতে দশ বৎসরের জন্য এবং পুনরায় 1970 হইতে 10 বৎসরের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থার কাল বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

লোকসভাকে বৎসরে অন্ততঃ দুইবার অধিবেশনে মিলিত হইতে হইবে। একটি অধিবেশন ও তাহার পরবর্তী অধিবেশনের মধ্যে ছয় মাসের কম ব্যবধান রাখিতে হইবে। অর্থাৎ একটি অধিবেশনের পর ছয় মাস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে দ্বিতীয় অধিবেশন ডাকিতেই হইবে। রাষ্ট্রপতি অধিবেশন আহ্বান করিবার কর্তা, তিনিই অধিবেশনের স্থান, কাল নির্দেশ করেন। তিনিই অধিবেশন Prorogue বা অনির্দিষ্ট কালের জন্য অবসান করিয়া দিবার কর্তা। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিয়া থাকেন।

লোকসভার আসন বণ্টন

লোকসভার আসন বণ্টন 1972 সালের চব্বিশে জুন নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

অন্ধ্রপ্রদেশ	..	41
আসাম	..	14
বিহার	..	53
গুজরাট	..	24
হরিয়ানা	..	9

হিমাচল প্রদেশ	..	4
জম্মু ও কাশ্মীর	..	6
কেরল	..	19
মধ্যপ্রদেশ	..	37
মেঘালয়	..	2
মহারাষ্ট্র	..	45
কর্ণাটক (মহীশূর)[1]	..	27
নাগাল্যাণ্ড	..	1
ওড়িষ্যা	..	20
পাঞ্জাব	..	13
রাজস্থান	..	23
তামিলনাড়ু	..	39
উত্তর প্রদেশ	..	85
পশ্চিমবংগ	..	40
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ		1
চণ্ডীগড়	..	1
গোয়া, দমন ও দিউ	..	2
দাদরা ও নগর হাভেলী		1
দিল্লী	..	7
লাক্ষাদ্বীপ (লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জ)[2]		1
মণিপুর	..	2
পণ্ডিচেরি	..	1
ত্রিপুরা	..	2
অরুণাচল	..	1
মিজোরাম	..	1
ইঙ্গ-ভারতীয় (মনোনীত)		2
		524[3]

1 1973 সালের আগষ্ট মাসে পার্লামেণ্ট মহীশূর রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিয়া কর্ণাটক নাম দিয়াছে।

2 লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিভি দ্বীপপুঞ্জের নূতন নাম হইয়াছে লাক্ষাদ্বীপ।

3 সংবিধানে 36 তম সংশোধন অনুসারে সিকিম ভারতের সহযোগী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে এবং সিকিমকে লোকসভায় একটি আসন দেওয়া হইয়াছে।

1952 সালের নির্বাচনের পর মার্চ মাসে লোকসভার আসন সংখ্যা ছিল 521। 1952 সালে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চল (পুনর্গঠন) আইন অনুযায়ী এই সংখ্যা বাড়িয়া 524 হয়। এই সংখ্যার মধ্যে 506 জন একুশটি রাজ্য ও নয়টি ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইলেন। নবগঠিত অরুণাচল প্রদেশ হইতে একজন এবং ইঙ্গ-ভারতীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে দুইজনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করিয়াছেন।

সংসদের সদস্যপদের যোগ্যতাবিষয়ক নিয়মাবলী

(1) প্রার্থীগণের বয়স রাজ্যসভার ক্ষেত্রে 30 বৎসর ; এবং লোকসভার ক্ষেত্রে 25 বৎসর হইতে হইবে।

(2) সংসদের সদস্যপদ প্রার্থীদের ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। যদি কেহ কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন বা বিদেশী রাষ্ট্রে নিজ চেষ্টায় নাগরিকতা অর্জন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি প্রার্থী হইতে পারেন না।

(3) আদালত যদি কাহাকেও বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া ঘোষণা করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রার্থী হইতে পারে না।

(4) দায় হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া হয় নাই, এরূপ দেউলিয়াও নির্বাচনে দাঁড়াইতে পারে না।

(5) ভারত বা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক চাকুরীতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেও প্রার্থী হইতে দেওয়া হয় না। তবে এই বিষয়ে আইন করিয়া পার্লামেণ্ট কোন কোন পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গকে এই নিষেধাজ্ঞা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারে। এ বিষয়ে পার্লামেণ্ট যে আইন করিয়াছে তাহা দ্বারা মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর সদস্য, রাজনৈতিক সচিবগণ (Parliamentary Secretary), বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি পদাধিকারী এবং আরও অনেকে প্রার্থী হইয়া নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইতে পারেন।

লোকসভার অধ্যক্ষ (Speaker)

সংবিধানের প্রবর্তন কাল হইতে আজ পর্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লোকসভার অধ্যক্ষের আসনে নির্বাচিত হইয়াছেন, যথা : জি. ভি. মভলঙ্কর, অনন্তশায়নম আয়েঙ্গার, সর্দার হুকুম সিং, সঞ্জীব রেড্ডি, জি. এস. ঢিলন্।

লোকসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার লোকসভার সভাপতি এবং ঐ সভার নিয়ম-শৃঙ্খলা, মর্যাদা, সদস্যগণের অধিকার প্রভৃতির রক্ষক।

ভারতীয় সংবিধান পরিষদ এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষের উপর গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যতীত ব্রিটেনে কমন্‌স্‌ সভার স্পীকারকে ঘিরিয়া যে বিরাট ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছে সংবিধান পরিষদ তাহাও পরোক্ষভাবে লোকসভার স্পীকারের পদে আরোপ করিয়াছিলেন বলা চলে। সাতশত বৎসর পূর্বে ইংল্যাণ্ডে পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইয়াছিল। তখন হইতেই এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছে। তবে 1377 সালে পার্লামেণ্টের দলিলে (Rolls of Parliament) প্রথম দেখা যায় যে ঐ সভার সভাপতি স্যার টমাস হাঙ্গারফোর্ডকে স্পীকার বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে। প্রথাগতভাবে বিলাতের স্পীকারের ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও কর্তব্য অনেকাংশে ভারতীয় সংবিধানের অংশীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অলিখিত বিবর্তন উপেক্ষা করিলে লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষের আসনটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা সুকঠিন।

স্পীকার বা অধ্যক্ষের কর্তব্য ও ক্ষমতা

(1) স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসভার মুখপাত্র। তিনি রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার মধ্যে যোগসূত্র। মধ্যযুগে বিলাতের কমন্‌স্‌ সভার স্পীকার প্রয়োজন হইলে ঐ সভার বক্তব্য রাজার নিকট উপস্থাপিত করিতেন। তেমনি রাজার আদেশাদি কমন্‌স্‌ সভায় তিনিই প্রকাশ করিতেন। এই জন্যই তিনি স্পীকার নামে অভিহিত হইতে থাকেন। এই ঐতিহ্য ভারতে অনুসৃত হইয়াছে।

(2) স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসভার নিরপেক্ষ সভাপতি, তিনি সভার কোন বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না। সাধারণতঃ তিনি ভোটেরও অধিকারী নহেন; কিন্তু কেবল যখন দুইদিকে সমসংখ্যক ভোট পড়ে এবং অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়, তখন মীমাংসার জন্য তিনি মীমাংসক ভোট (casting vote) দিতে বাধ্য থাকেন।

(3) তিনি সভার কার্য স্থগিত রাখিতে পারেন কিম্বা যখন সভা করিবার উপযোগী সর্বনিম্ন সংখ্যক সদস্য (Quorum) সভায় উপস্থিত না থাকেন তখন সভা সাময়িকভাবে বাতিল (suspend) করিয়া দিতে পারেন অথবা মুলতুবি রাখিতে পারেন। কোন সদস্য পদত্যাগ করিতে চাহিলে তাঁহাকে অধ্যক্ষেরই নিকট পত্র লিখিতে হয়।

(4) কোন বিল অর্থবিল কিনা তাহা স্পীকারই ঠিক করিয়া দেন;

তিনি ঐরূপ বিল রাষ্ট্রপতির বা রাজ্যসভার নিকট পাঠাইবার পূর্বে উহা যে অর্থবিল তাহা লিখিয়া সহি মোহর করিয়া দেন।

(5) কেন্দ্রীয় দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন।

(6) লোকসভার ভিতরে তিনি যে সকল কাজ করেন তাহার জন্য তিনি একমাত্র ঐ সভার নিকট দায়ী থাকেন। স্পীকার হিসাবে তাঁহার সিদ্ধান্ত (ruling) আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

(7) যদি কোন সদস্য হিন্দী বা ইংরাজীতে বক্তৃতা দিতে না পারেন, তাহা হইলে অধ্যক্ষ তাহাকে মাতৃভাষায় বক্তৃতা করিবার অনুমতি দিতে পারেন।

(8) লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মানুযায়ী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন, প্রস্তাব, বিল, সংশোধক প্রস্তাব প্রভৃতি গ্রহণের বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষের রহিয়াছে। সভার অনুমোদিত নিয়মাবলীর তিনি যে ব্যাখ্যা দিবেন তাহাই চূড়ান্ত বলিয়া গৃহীত হইবে।

(9) সভায় শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণ তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত। শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি যে নির্দেশ দিবেন সদস্যগণকে তাহাই মানিয়া লইতে হইবে।

(10) লোকসভার অধ্যক্ষ সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সকল দলের ও প্রতি সদস্যের স্বাধিকার ও মর্যাদার রক্ষক এবং সমষ্টিগতভাবে সমগ্র লোকসভার সম্মানের আশ্রয়।

(11) কোন সদস্য বিশৃঙ্খল আচরণে দোষী হইলে অধ্যক্ষ তাহাকে ঐ দিনের জন্য লোকসভার অধিবেশন হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন। শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে লোকসভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার আদেশ দেওয়ার অধিকারও তাঁহার রহিয়াছে।

(12) এই পদের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যদিও লোকসভার আয়ুষ্কাল শেষ হয় তথাপি স্পীকার বা লোকসভার অধ্যক্ষ তাঁহার পদে আসীন থাকেন সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত না নূতন লোকসভা নির্বাচিত হইয়া স্পীকার নিযুক্ত করে।

(13) পার্লামেণ্ট লোকসভার অধ্যক্ষের বেতন নির্ধারণ করে; কিন্তু নির্ধারিত বেতন পার্লামেণ্টের বার্ষিক ভোটের আওতায় আসে না।

স্পীকার বা অধ্যক্ষের নিরপেক্ষতা

ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রকৃতি লোকসভার স্বাধীন আলোচনা ও মতপ্রকাশের

উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল। লোকসভার অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ থাকিয়া, স্বাধীন আলোচনা যাহাতে চলিতে পারে, সেই পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সংখ্যা নির্বিশেষে সমস্ত দল, সমস্ত সদস্য অধ্যক্ষের নিকট ন্যায় বিচার আশা করে। এই কারণেই সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মস্থান ব্রিটেনে কমন্স্ সভার স্পীকার সম্বন্ধে কতকগুলি প্রথা উদ্ভূত হইয়াছে। কমন্স্ সভার যিনি স্পীকার থাকেন তিনি যদি পরবর্তী নির্বাচনে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইতে চান, তাহা হইলে তিনি কোন দলীয় প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন না ; নির্দলীয় প্রার্থীরূপেই নির্বাচন প্রার্থী হইয়া থাকেন। এইরূপ হইলে কোন দল সাধারণতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করান না। ব্রিটেনে এই নিয়মের কদাচিৎ ব্যতিক্রম হইয়াছে। তাই ব্রিটেনের স্পীকার প্রায়ই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই নিয়মটির দ্বারা স্পীকারের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা রক্ষিত হয়। নূতন স্পীকার নির্বাচনের সময় সাধারণতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ সরকার পক্ষের দলনেতা বিরোধীদলের নেতার সহিত আলোচনা করেন এবং পুরাতন স্পীকার যিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ সদস্যরূপে পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহাকেই পুনরায় স্পীকার পদের জন্য সুপারিশ করেন। বিরোধী নেতা ইহাতে সব সময়েই সম্মতি দেন। তাই কমন্স্ সভায় স্পীকার প্রায় সকল সময়ই সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হইয়া আসিতেছেন। পুরাতন স্পীকার নির্বাচনে না দাঁড়াইলে কোন নূতন সদস্যকে স্পীকার নিযুক্ত করিতে হয়। এইক্ষেত্রেও সরকার ও বিরোধীপক্ষের নেতৃদ্বয়ের মধ্যে আলোচনার পর একটি উভয়পক্ষ-সম্মত ব্যক্তিকেই ঐ মর্যাদাপূর্ণ পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করা হয়। এইরূপে কমন্স্ সভায় স্পীকারের নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হইয়া থাকে।

দুঃখের বিষয় ভারতবর্ষে এইরূপ প্রথা এখনও গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু তথাপি লোকসভার অধ্যক্ষগণ অল্পকালের মধ্যেই নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছেন বলা যাইতে পারে। লোকসভার অধ্যক্ষ আপন নিরপেক্ষতা রক্ষা করিবার জন্য কোন দলীয় সমাবেশ, সভা বা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন না। আরও বলা যাইতে পারে যে লোকসভার নির্বাচনের পর, তাঁহার দল হইতে পদত্যাগ করা প্রায় প্রথায় পরিণত হইয়াছে।

অধ্যাপক মরিস্-জোন্স্ বলিয়াছেন যে কেন্দ্রে স্পীকার বা লোকসভার অধ্যক্ষের ঐতিহ্য তেমনভাবে রাজ্যগুলিতে অনুসৃত হয় নাই। রাজ্যের বিধানসভা এবং বিধানপরিষদের অধ্যক্ষগণ অনেক সময় স্থানীয় দলাদলির আবর্তে পড়িয়া গিয়া টাল সামলাইতে পারেন নাই।

সংসদ ও উহার সদস্যগণের স্বাধিকার
(Privileges and Immunities)

গণতন্ত্রের মূলগত নিয়মানুযায়ী সংসদের সদস্যগণের কতকগুলি বিশেষ অধিকার সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছে। এইসকল অধিকার ব্যতীত পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করা সুকঠিন হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্টের অভ্যন্তরে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাক্‌স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। পার্লামেণ্টের মধ্যে তাঁহারা যাহাই বলুন না কেন, সেজন্য তাঁহারা কোন আদালতের কাছে দায়ী নহেন। এমনকি দেশের সাধারণ আইন অনুসারে যাহা বলা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ উক্তির জন্যও পার্লামেণ্টের সদস্যগণের বিরুদ্ধে আদালতে কোন নালিশ চলে না। কিন্তু এইসূত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে সদস্যগণকে সংবিধান ও পার্লামেণ্টের নিয়ম-কানুন (Rules and Standing Orders of the House) মানিয়া চলিতে হয়। প্রতি কক্ষ নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন প্রস্তুত করিবার অধিকারী। এই সকল নিয়ম-কানুন দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে মানহানিকর মন্তব্য নিষেধ করা হইয়াছে। লোকসভার অধ্যক্ষ, রাজ্যসভার সভাপতি অথবা তাহাদের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গ কোন সদস্য ঐরূপ মন্তব্য করিলে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। যথা, অন্যায়ভাবে বাক্‌স্বাধীনতার অধিকার ব্যবহার করিলে সদস্যকে অধ্যক্ষ বা সভাপতি কক্ষ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারেন। সদস্যের বক্তব্য কক্ষের আলোচনা সম্বলিত সরকারী বিবরণী হইতে কাটিয়া দিতে পারেন, কিম্বা সদস্যের কার্যের নিন্দা করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যেরূপ সদস্যগণের বাক্‌স্বাধীনতা আছে ঠিক তেমনি পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত কোন কমিটিতেও সেইরূপ বাক-স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। যে কোন কক্ষের কর্তৃত্বে প্রকাশিত পুস্তকাদিতে প্রচারিত কোন তথ্য বা মন্তব্যের জন্য কক্ষের কাহারও আদালতে জবাবদিহি করিতে হয় না। এইক্ষেত্রে মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়া থাকে।

কমন্‌স্ সভার ও ভারতীয় পার্লামেণ্ট সদস্যগণের স্বাধিকার

সংবিধানের 105(3) ধারায় বলা হইয়াছে যে, অন্যান্য বিষয়ে ব্রিটেনের কমন্‌স্ সভার সদস্যগণের যে অধিকার আছে, ভারতীয় পার্লামেণ্টের সদস্যগণেরও সেই অধিকার স্বীকৃত হইবে। এই ধারাটি লইয়া সংবিধান পরিষদে তীব্র মতভেদের সূচনা হয়। এইচ. ভি. কামাথ,[1] কে. টি. শা[2]

1 C. A. D., VIII, p. 144
2 C. A. D., VIII, p. 145

প্রভৃতি সদস্যগণ বলেন যে সংবিধানের এইরূপ বিধান একটি সার্বভৌম সংবিধান পরিষদের পক্ষে অপমানজনক। শ্রীআল্লাদী কৃষ্ণস্বামী আইয়ার[1] ও আম্বেদকর সংবিধান খসড়া প্রস্তুত কমিটির (Drafting Committee) পক্ষ হইতে বলেন যে ইহাতে কোন অপমানের প্রশ্ন নাই। সদস্যগণের পার্লামেণ্টের অধিকার সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলেই আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। সংবিধান প্রণয়নের কাজ দ্রুত সমাধা করিবার জন্য স্বাধিকার সংক্রান্ত বিস্তারিত ব্যবস্থা করা সংবিধান পরিষদের পক্ষে তখনই সম্ভব ছিল না। অষ্ট্রেলিয়ার সংবিধানেও কতকটা অনুরূপ ধারা স্থান পাইয়াছে। কমন্‌স্ সভার নিয়মানুসারে ভারতীয় পার্লামেণ্টের ও তাহার সদস্যবর্গের নিম্নলিখিত অধিকারও রহিয়াছে।

(1) সমষ্টিগতভাবে রাজ্যসভা বা লোকসভার স্বাধিকার ভঙ্গ করা হইয়াছে অথবা কক্ষের কোন সদস্যের স্বাধিকার ভঙ্গ করা হইয়াছে—এই অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কক্ষের নিয়মানুসারে সদস্যগণ দাবি করিতে পারেন যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক। যদি সভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া লয় তাহা হইলে প্রস্তাবটি সভার স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। সেই কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করিয়া সভা ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লোকসভা বা রাজ্যসভা তদনুযায়ী দোষী ব্যক্তিকে সমন দ্বারা সভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করিতে পারে। সভার অধ্যক্ষ বা সভাপতি অপরাধীকে সভার নির্দেশ অনুযায়ী ভর্ৎসনা করিতে পারেন, এমনকি কারারুদ্ধ করিতেও পারেন। এই শাস্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতেই আপীল চলে না। যদি অপরাধী কারাগারে আবদ্ধ হন তাহা হইলে পার্লামেণ্টের অধিবেশন শেষ হইলেই তিনি মুক্তি পান। 1961 সালে বোম্বাই সহরের একটি পত্রিকার সম্পাদকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠিয়াছিল যে তিনি সভার একজন সদস্যকে লোকসভার অভ্যন্তরে প্রদত্ত তাহার বক্তৃতার জন্য অন্যায়ভাবে হেয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বাধিকারকমিটি ও লোকসভা সিদ্ধান্ত করে যে উক্ত সম্পাদকের পত্রে প্রকাশিত মন্তব্যে যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সদস্যমহোদয়ের পক্ষে অপমানজনক। তদনুযায়ী স্পীকার উক্ত সম্পাদককে লোকসভার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ দান করেন এবং অপরাধী উপস্থিত হইলে তাহাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন।

---

1 C. A. D., VIII. p. 148

(2) যদি পার্লামেণ্টের কোন সদস্য গ্রেপ্তার হন ও ফৌজদারি আইন-ভঙ্গের অপরাধের জন্য আটক হন অথবা আদালত কর্তৃক বিচারের পর কারারুদ্ধ হন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে লোকসভার অধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে উক্ত সদস্যকে কেন গ্রেপ্তার, আটক ও কারাবন্দী করা হইয়াছে। তেমনি যদি কোন সদস্যকে আটক অবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় তাহা হইলেও অধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে যে তথ্য পাইয়াছেন যথাসম্ভব শীঘ্র তাহা অধ্যক্ষকে লোকসভায় ঘোষণা করিতে হইবে। পার্লামেণ্টের সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ। ঠিক তেমনি দেওয়ানী বা ফৌজদারী আইন বিষয়ক কোন সমন বা নোটিশ প্রভৃতি লোকসভার অধ্যক্ষ বা রাজ্যসভার সভাপতির বিনা অনুমতিতে পার্লামেণ্টের সীমানার মধ্যে কোন সদস্যকে দেওয়া চলে না।

1964 সালে লোকসভার একজন সদস্য প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পার্লামেণ্টের দৈনন্দিন কার্য-সমাধার পর সদস্যদের পার্লামেণ্ট ভবনে থাকিবার অধিকার আছে কি না। অধিকার সংক্রান্ত এই প্রশ্নের উত্তরে লোকসভার স্পীকার বলিয়াছিলেন যে পার্লামেণ্টের দৈনিক কাজ শেষ হইবার পর সদস্যগণ কতক্ষণ পার্লামেণ্ট ভবনে থাকিয়া যাইতে পারেন তাহা নির্ধারণ করা স্পীকারেরই এক্তিয়ার ভুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার সদস্যগণ কোন অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার এড়াইবার উদ্দেশ্যে বা রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখাইবার জন্য বিধানসভা ভবনে একাধিক দিন অবস্থান করিয়াছেন। কিন্তু কোন রাজ্য বিধানসভার কোন স্পীকার বা অধ্যক্ষ লোকসভার স্পীকারের ন্যায় এই বিষয়ে কোন রুলিং দেন নাই। বলা বাহুল্য, পার্লামেণ্টে ঐরূপ অবস্থানের ঘটনা এখনও ঘটে নাই।

(3) লোকসভার স্পীকার বা রাজ্যসভার সভাপতি ইচ্ছা করিলে যে কোন অ-সদস্য ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারেন বা উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে পারেন অথবা গোপনীয়তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দর্শকগণের বসিবার স্থানে তাহাদের আগমন ও উপস্থিতি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন।

(4) যে বিষয় সভায় উত্থাপিত হয় সদস্যগণ সেই প্রসঙ্গই আলোচনা করিতে পারেন ; অবান্তর বিষয়ে নহে। কোন সদস্য রুচিবিগর্হিত, অপরাধজনক, মানহানিকর বা রাজদ্রোহজনক কোন মন্তব্য করিতে পারেন না। কোন মোকদ্দমার বিচার চলাকালীন অবস্থায় ঐ সম্বন্ধে মন্তব্য করা

চলে না। এই সকল ক্ষেত্রে লোকসভার স্পীকার ও রাজ্যসভার সভাপতিকে বিচার করিয়া ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহারা ঐরূপ আলোচনা বা উল্লেখ বারণ করিতে পারেন; সভার বিবরণী হইতে আইন বিরুদ্ধ বিষয় বাদ দিতে পারেন, এমনকি দুর্বিনীত সদস্যগণকে সভাকক্ষ হইতে বহিষ্কারের আদেশও দিতে পারেন। একই অপরাধে তিনি সদস্যের এক বা একাধিক দিনের জন্য উপস্থিতি নিষিদ্ধ করিতে পারেন।

(5) পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হইবার চল্লিশ দিন পূর্ব হইতে এবং অধিবেশন শেষ হইবার চল্লিশ দিন পর পর্যন্ত এবং অধিবেশন চলাকালে কোন সদস্যকে দেওয়ানী দায়ে গ্রেপ্তার করা চলে না। কিন্তু ফৌজদারি আইনানুযায়ী কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে এই নিয়ম নাই।

(6) সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী সদস্যগণ পার্লামেণ্ট নির্ধারিত বেতন ও ভাতা পাইবার অধিকারী। কিন্তু লক্ষণীয় যে তাঁহারা সরকারী কর্মচারী বলিয়া পরিগণিত নহেন।

পার্লামেণ্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

অন্যান্য গণতন্ত্রের ন্যায় ভারতীয় গণতন্ত্রেও পার্লামেণ্ট সমগ্র শাসনতন্ত্রের মধ্যমণি। ইহার ক্ষমতা ব্যাপক ও কার্যাবলী বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিস্তৃত। পার্লামেণ্ট শুধু আইন-প্রণয়নের কর্তা নহে; পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ভারতীয় জনগণের প্রতিনিধিমূলক দুইটি সভা—লোকসভা ও রাজ্যসভা যথাক্রমে গণতন্ত্র ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বরূপ ও চরিত্র অনেকাংশে পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করে। পার্লামেণ্ট একাধারে পরোক্ষভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর নিয়োগকর্তা, আইনকর্তা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর ও ভারতের অর্থসংক্রান্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রাতা।

নির্বাচনে লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাহারাই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া থাকে। মন্ত্রীমণ্ডলীকে তাহার আয়ুষ্কালে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিয়া লোকসভার বিশ্বাসভাজন হইতে হয়। যখন তাহারা লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলেন তখনই তাহাদের পদত্যাগ করিতে হয়। কারণ সংবিধান অনুযায়ী লোকসভার নিকটই মন্ত্রীমণ্ডলী দায়িত্বশীল। মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের কালে যেমন লোকসভার পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, তেমনি মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিবার সময়ও একমাত্র লোকসভাই ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী। মন্ত্রীমণ্ডলী ও পার্লামেণ্টের সহিত সম্পর্কের

আলোচনায় বলা হইয়াছে যে পার্লামেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা সীমিত। কারণ ভারতে দলীয় সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। যে দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহারাই মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিয়া থাকে। অর্থাৎ মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট মন্ত্রীমণ্ডলী যে সকল প্রস্তাব বা আইন পার্লামেণ্টে পেশ করেন তাহাই পাশ হইয়া যায়। এই কারণে পরোক্ষভাবে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বস্তুতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতেই ন্যস্ত হয়।

(ক) পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা

(1) পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে সংবিধানে বিবৃত করা হইয়াছে। কি কি বিষয়ে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিতে পারেন তাহা সংবিধানের 246 ধারা অনুযায়ী সংবিধানের সপ্তম তপশীলে ইউনিয়ন তালিকায় লিখিত হইয়াছে। যে নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ইউনিয়ন সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বণ্টন করা হইয়াছে তাহা মোটামুটি এই যে, সর্বভারতীয় বিষয়গুলি এবং সমগ্র ভারতের সুষম ও ন্যায়সঙ্গত আর্থিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অর্পণ করা হইয়াছে এবং যে সকল বিষয় প্রধানতঃ বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাহা রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই নীতি আধুনিককালে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নহে। ভারতীয় সংবিধানেও তাহা হয় নাই। কারণ ভারতের ন্যায় কল্যাণরাষ্ট্রে কেন্দ্র-রাজ্য নির্বিশেষে প্রায় সকল বিষয় পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং একটি আর একটির উপর নির্ভরশীল। সেইজন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য বিষয়গুলির মধ্যে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিভাগ করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, সংবিধানে আইন প্রণয়ন বিষয়গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে, (ক) কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত বিষয় (central list), (খ) রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় (state list) ও (গ) যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয় (concurrent list)। প্রথমটি কেন্দ্রের, দ্বিতীয়টি রাজ্যের এবং তৃতীয়টি কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের এক্তিয়ারের অন্তর্গত। সংবিধানের সপ্তম তপশীলে এই তিনটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সর্বভারতীয় বিষয় অর্থাৎ যে সকল বিষয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী তাহাদের মধ্যে কতকগুলি উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা, প্রতিরক্ষা, সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমানবাহিনী, রেল, বন্দর,

জাহাজ চলাচল, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা, নাগরিকত্ব, ভারতের ভূ-খণ্ড, অসামরিক বিমান, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাম, টেলিভিশন, ব্যাঙ্ক, বীমা, খনি, সামুদ্রিক মৎস্য শিকার, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (আলিগড়, বারাণসী, বিশ্বভারতী, দিল্লী, জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়) ভূবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও নৃতত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধীয় সমীক্ষা বিভাগ, আদমসুমারী, কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের হিসাব পরীক্ষা, আয়কর, আভ্যন্তরীণ শুল্ক (excise duties), সম্পত্তির উত্তরাধিকার কর, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহির্নীতির প্রয়োজনে আটক প্রভৃতি।

(2) ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট তিনটি ক্ষেত্রে রাজ্যসমহকে প্রদত্ত বিষয়েও আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। রাজ্যসভা যদি সভায় উপস্থিত সদস্যগণের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে সিদ্ধান্ত করে যে রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত কোন বিষয়ে পার্লামেণ্ট কর্তৃক আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন বা জাতীয় স্বার্থে সমীচীন, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট ঐ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী হইবে (249 ধারা)। দ্বিতীয়তঃ, যদি দুই বা ততোধিক রাজ্য বিধানমণ্ডলী এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিকারস্থ কোন বিষয়ে পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করা সমীচীন, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে উপরোক্ত রাজ্যসমূহের জন্যও পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে। অন্য রাজ্যগুলি যাহারা উপরোক্ত প্রস্তাব করে নাই, তাহারাও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পার্লামেণ্টকৃত আইন রাজ্য আইন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে (252 ধারা)। ইহা ব্যতীত যখন রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন তখন পার্লামেণ্ট রাজ্য আইন মণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে (250 ধারা)। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সংবিধান পার্লামেণ্টকে বিস্তৃত ক্ষমতা দিয়াছে।

পার্লামেণ্টের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা আরও ব্যাপক। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংবিধানের সপ্তম তপশীলে যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) বলিয়া একটি তালিকা আছে। ঐ তালিকায় যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে তাহাদের সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে ও রাজ্যবিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন প্রণয়নের অধিকারী। তবে সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে, যদি পার্লামেণ্ট এবং কোন রাজ্যবিধানমণ্ডলী উভয়েই যুগ্ম তালিকার কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে এবং ঐ বিষয়ে যদি পার্লামেণ্টের আইন ও রাজ্য আইনের মধ্যে বিরোধ থাকে তাহা হইলে পার্লামেণ্টের আইন বলবৎ থাকিবে; রাজ্য আইন নহে। অর্থাৎ রাজ্য আইনের যে অংশ কেন্দ্রীয় আইনের

বিরোধী, সেই অংশটুকু বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে (254 ধারা)। আইন প্রণয়নের বিষয়গুলি সংবিধানের সপ্তম তপশীলে ইউনিয়ন তালিকা, যুগ্ম তালিকা ও রাজ্য তালিকা এই তিনটি তালিকায় বিভক্ত করা হইয়াছে। যে সকল বিষয় এই তিনটি তালিকার একটিরও অন্তর্ভুক্ত নহে তাহা residuary power বা অবশিষ্ট ক্ষমতার আওতায় পড়ে। সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে আইন প্রণয়নের অবশিষ্ট ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইবে (248 ধারা)।

(3) ভারার্পিত আইন (Delegated Legislation)

আধুনিক কালে সকল দেশেরই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিমূলক পার্লামেণ্টের একটি ভাগীদারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকা ব্যাপক, তাই অনেক আইন প্রণয়ন করিতে হয় যাহার অর্থনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য সুদূর প্রসারী। এই সকল বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তথ্যাদি জানা থাকা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যগণের এই রূপ তথ্য-জ্ঞান থাকে না। সেইজন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট আইনের মুখ্য ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করে এবং খুঁটিনাটি বিধান সম্বন্ধে ভারার্পণ করে মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর। মন্ত্রীমণ্ডলীর সংশ্লিষ্ট বিভাগ (অর্থাৎ আইনটি যে বিভাগ সম্বন্ধীয়) এই খুঁটিনাটি নিয়মাদি (Rules) প্রস্তুত করে। ইহাকে নিয়মাবলী (Rules) বলা হয় বটে কিন্তু ইহার তাৎপর্য গুরুতর হইতে পারে। বলা বাহুল্য, এই নিয়মাবলীগুলি পার্লামেণ্টের সভায় পেশ করার নিয়ম আছে। কোন আপত্তি না উঠিলে ঐরূপ নিয়মাদি আইনে পরিণত হইয়া যায়। পাছে ভারার্পিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার কোন অপব্যবহার না হয় সেজন্য লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় পৃথক পৃথক কমিটি আছে। ইহাকে ভারার্পিত আইন কমিটি বলা যাইতে পারে—(Committee on Subordinate Legislation)। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীবিভাগ কর্তৃক প্রণীত নিয়মাবলী যাচাই করিয়া দেখাই ইহার কাজ।

পার্লামেণ্টের আইন-প্রণয়ন ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ

মন্ত্রীপরিষদ পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট বলিয়া তাঁহারা পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা দখল করিয়াছে। ইহার দ্বারা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এই যে মন্ত্রীপরিষদই আইন প্রণয়ন করিতেছে পার্লামেণ্টের

সম্মতি লইয়া। ব্রিটেনের ন্যায় ভারতে ক্যাবিনেট প্রথা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মন্ত্রীপরিষদ পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অধিকার করিয়া লইয়াছে। ভারার্পিত আইন মারফৎ মন্ত্রীপরিষদ আরও ক্ষমতা হাতে পাইয়াছে। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন যে ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই একনায়কত্ব করিতেছে ; ভারতে ক্যাবিনেট প্রথার বিবর্তনের ফলে ভারতীয় মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট যে আইনের ক্ষেত্রেও অতিশয় শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

(খ) পার্লামেণ্ট ও ভারতের আয়-ব্যয়

ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা সংসদের আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা আলোচনার পর ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর পার্লামেণ্টের ক্ষমতা আলোচনা করা আবশ্যক। পার্লামেণ্ট ভারত সরকারের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে আয়-ব্যয় মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা। আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রস্তাব করা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীর এক্তিয়ারভুক্ত। কিন্তু সংবিধানে লিখিত আছে যে রাষ্ট্রপতি আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রস্তাব পার্লামেণ্টে দাখিল করাইবেন। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতেই রহিয়াছে, কারণ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করেন না।

ব্রিটেনে শত শত বৎসর পূর্বে একটি নীতি গৃহীত হইয়াছিল। তাহা হইল এই যে, রাজা আয়-ব্যয়ের প্রস্তাব করেন, কমন্‌স্ সভা তাহা মঞ্জুর করেন এবং লর্ডসভা তাহাতে সম্মতি দেন। ভারতেও সেই নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবের কর্তা রাষ্ট্রপতি (প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রীমণ্ডলী), অনুমোদনকর্তা লোকসভা, সম্মতি দানের কর্তা রাজ্যসভা। আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সমস্ত প্রস্তাব কেবলমাত্র লোকসভায় পেশ করা যায়, রাজ্যসভায় নহে। লোকসভায় আলোচনার পর আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিল রাজ্যসভায় প্রেরিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী 14 দিনের মধ্যে ঐ বিল রাজ্যসভা হইতে লোকসভায় ফেরৎ পাঠাইতে হইবে। না পাঠাইলে উহা আইনে পরিণত হয়। রাজ্যসভা 14 দিনের মধ্যে সংশোধক প্রস্তাবসহ অথবা বিনা সংশোধনে বিলটি লোকসভায় পাঠাইতে পারে। লোকসভা ঐ সংশোধক প্রস্তাব গ্রহণ অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারে এবং বিবেচনার পর লোকসভা যেভাবে বিল গ্রহণ করিবে সেই ভাবেই উহা পাশ হইয়া যাইবে। পার্লামেণ্ট সভার আয়-ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আলোচনার মধ্য দিয়া বিরোধীপক্ষের দলসমূহ সরকারের সমালোচনা করিয়া থাকে এবং তাহাদের গঠনমলক

প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এই বিষয়েও পার্লামেণ্টের প্রকৃত ক্ষমতা সীমিত। কারণ মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে সংখ্যা-গরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী রাষ্ট্রপতির নামে যে আয়-ব্যয়ের প্রস্তাবই দিক না কেন এবং পার্লামেণ্টে তাহার যেরূপ সমালোচনাই হউক না কেন, প্রস্তাবিত বিল পাশ হইতে কোন অসুবিধা নাই। আরও লক্ষণীয় যে কতকগুলি ব্যয় লোকসভার ভোটের আওতায় আসে না। সে সকল ব্যয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকারী স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) হইতে খরচ করিতেই হইবে। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যসভার সভাপতি, উপ-সভাপতি, লোকসভার অধ্যক্ষ, এবং সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতনাদি সংক্রান্ত খরচ, ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের বেতনাদি, রাষ্ট্রীয় দেনা বাবদ সুদ প্রভৃতির জন্য খরচ এই শ্রেণীতে পড়ে। আরও মনে রাখা প্রয়োজন যে বাজেট অধিবেশনে পার্লামেণ্টের বিশেষতঃ লোকসভার কাজের চাপ এত বেশি থাকে যে আলোচনার জন্য খুব বেশি সময় দেওয়া হয় না। সেইজন্য পার্লামেণ্টের সমালোচনার সুযোগ স্বভাবতই সীমিত হইয়া যায়। সর্বশেষে বলা যায় যে, বাজেট ও অন্যান্য অর্থবিল সাধারণতঃ এতই জটিল হয় যে, অধিকাংশ সদস্য ঐ সকল বিষয়ে গভীরে প্রবেশ করিতে পারেন না। তাই সমালোচনাও ভাসা ভাসা ধরনের হইয়া পড়ে। এই সকল কারণে অর্থবিল এবং আয়-ব্যয় আলোচনার মাধ্যমে মন্ত্রীমণ্ডলীকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ আকার ধারণ করে। তথাপি বিরোধী পক্ষের সরালোচনাকে মোটেই তুচ্ছ করা চলে না। এই সকল সমালোচনা সংবাদপত্র মারফৎ প্রচারিত হইয়া জনসাধারণের উপর অল্প-বিস্তর প্রভাব বিস্তার করে।

(গ) ভারতীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রীমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ

ভারতীয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী এবং সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা পার্লামেণ্টের অন্যতম ক্ষমতা। পার্লামেণ্ট এই ক্ষমতা বিভিন্নরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে: যথা, (1) অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, (2) অর্থবিল অর্থাৎ আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিল সম্বন্ধে বিতর্ক, (3) প্রস্তাব উত্থাপন, (4) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, (5) রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক প্রারম্ভিক বক্তৃতার উপর বিতর্ক, (6) মুলতবী প্রস্তাব, (7) অনুসন্ধান কমিটি বা কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব উত্থাপন, (8) দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশ দ্বারা কোন বিষয় উত্থাপন, (9) যে কোন বিলের উপর আলোচনা, (10) সরকার কর্তৃক পার্লামেণ্টে উত্থাপিত

নীতি বিষয়ক প্র াবের উপর বিতর্ক, (11) সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটির ও ব্যয় পরীক্ষা কমিটির রিপোর্টের উপর বিতর্ক—এই সকল উপায়ে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে।

সরকার পক্ষীয় কোন নীতি বা মন্তব্যের প্রতিবাদে অনেক সময় বিরোধী কোন দল বা দলসমূহ সভাকক্ষ হইতে কিছুক্ষণের জন্য বাহির হইয়া যায়। ইহাও প্রতিবাদের একটি পন্থা। দ্বিতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের বিরোধী দলগুলি মাঝে মাঝে পার্লামেণ্টের মধ্যে চীৎকার ও গণ্ডগোল সৃষ্টি করিয়া আপত্তি জানাইতে থাকে। বিরোধীদলগুলি সরকারী নীতির বিরোধিতার অন্যতম পন্থা হিসাবে এই উপায়টি অবলম্বন করে। বলাবাহুল্য যে সভাকক্ষ ত্যাগ অথবা চীৎকার করিয়া অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণভাবে পার্লামেণ্টারী রীতি বিরুদ্ধ। সরকারকে পর্যুদস্ত করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়াই বিরোধী দলগুলি অসহায়তা বশতঃ ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে। ভারতের সমস্ত দল সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য, কোন বিশেষ দল বা দলসমূহ সম্বন্ধে নহে। বলা বাহুল্য যে ঐ সকল পন্থা সংসদীয় গণতন্ত্রে সর্বথা বর্জনীয়।

ভারতীয় সংবিধানে পার্লামেণ্টের স্থান (The Place of the Indian Parliament in the Constitution of India)

ভারতীয় সংবিধান পরিষদের উপর যে দুইটি সংবিধান সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহার একটি হইল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের আর একটি হইল ব্রিটেনের সংবিধান। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টে বা দেশের সর্বোচ্চ আদালতকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিউজ্ বলিয়াছিলেন যে "We are under the Constitution but the Constitution is what the judges say it is."[1] অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু সংবিধানের অর্থ কি তাহা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণই স্থির করিবেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্ উড্রো উইলসন বলিয়াছেন যে সুপ্রীম কোর্ট হইল "a kind of Constitutional convention in continuous session" অর্থাৎ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট একটি চিরস্থায়ী সংবিধান

1 Charles E. Hughes: Addresses (Harpar & Brothers, New York, 1908) p. 139

পরিষদরূপে কাজ করিয়া যায়। সংবিধান পরিষদ যেমন সংবিধান পরিবর্তন করিবার অধিকারী তেমনি সুপ্রীম কোর্ট ভাষ্যের মারফৎ সংবিধানের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারে। সুতরাং আমেরিকাতে ঐ দেশস্থ কংগ্রেস বিধানমণ্ডলী অপেক্ষা মর্যাদাশীল।

ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও আইনবিদ্ ডাইসি বলিয়াছেন যে বিচারকেরা পার্লামেণ্টের আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই তুলিতে পারেন না। পার্লামেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করে তাহার উপর কোন কথা বলিবার অধিকার বিচারবিভাগের নাই। পার্লামেণ্টের মর্যাদা সর্বোচ্চ। ভারতের পার্লামেণ্ট এই অর্থে ব্রিটেনের পার্লামেণ্টের সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যবস্থাপক সভা নহে। কারণ ভারতের পার্লামেণ্ট একটি সার্বভৌম আইনসভা নহে। আইন সংবিধানানুগ হইয়াছে কি না তাহা বিচার করিবার ক্ষমতা ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের রহিয়াছে। কিন্তু আইন সংবিধানানুগ হইলে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট কোন পার্লামেণ্টীয় বা রাজ্য বিধানমণ্ডলীকৃত আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে না। কিন্তু আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসকৃত কোন আইন আনুষ্ঠানিকভাবে সংবিধান সম্মত হইলেও আইনটি স্বাভাবিক ন্যায়নীতি (Natural Justice) ও যুক্তি বিরুদ্ধ এই হেতু দেখাইয়া অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিজ নিজ পরিবেশে মর্যাদার দিক হইতে ভারতীয় পার্লামেণ্ট ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট অপেক্ষা কম মর্যাদাসম্পন্ন; কিন্তু আমেরিকার কংগ্রেস অপেক্ষা ভারতীয় পার্লামেণ্টের ক্ষমতা বেশি। এইস্থলে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য (1950) নামক সুপ্রসিদ্ধ মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি দাশ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাদের সংবিধান আইনসভাগুলির উপর কতকগুলি বাধা নিষেধ চাপাইয়া দিয়াছে সত্য, তথাপি এই সকল বাধা নিষেধের গণ্ডীর বাহিরে আমাদের সংবিধান পার্লামেণ্ট ও রাজ্যবিধানমণ্ডলীকে নিজ নিজ সীমার মধ্যে পূর্ণ ক্ষমতা দান করিয়াছে। সংবিধান-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পার্লামেণ্টের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। কিন্তু যেহেতু সীমা নির্দিষ্ট আছে, সেই হেতু পার্লামেণ্ট একটি সার্বভৌম আইনসভা নহে।

এই বিষয়টি লইয়া সাম্প্রতিককালে নানা বিতর্কের শুরু হইয়াছে। অনেকে বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায় সার্বভৌম আইনসভা বাধাহীনরূপে যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে ও সংশোধন করিতে পারে। কিন্তু ভারতীয় পার্লামেণ্ট সেরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন আইন-

সভা নহে। গোলকনাথের মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট এই মতই সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকার সম্বলিত অংশটি সংশোধন করিতে পারে না। কিন্তু 1973 সালে কেশবানন্দ ভারতী বনাম কেরল রাজ্যসরকার ও অন্য আর এক পক্ষ মোকদ্দমাটিতে সুপ্রীম কোর্ট গোলকনাথ মোকদ্দমার রায়ের বিরুদ্ধতা করিয়া রায় দিয়াছেন যে, পার্লামেণ্ট মৌলিক অধিকারগুলিও তাহার সংশোধনী ক্ষমতার আওতায় আনিতে পারে। গোলকনাথ মামলায় পার্লামেণ্টের ক্ষমতার উপর যে অতিরিক্ত নিষেধ চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহা কেশবানন্দ ভারতী মামলার রায় দ্বারা অপসারিত হইল। এই মামলার রায়ে ঘোষিত হইল যে পার্লামেণ্টের constituent power বা সংবিধান পরিবর্তনের পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে, যদি পার্লামেণ্ট 368 ধারার বিধান মানিয়া চলে। কিন্তু তথাপি পার্লামেণ্টের সংবিধান সংশোধন 368 ধারা অনুযায়ী হইয়াছে কিনা তাহা বিচার করিবার ভার সুপ্রীম কোর্টের হস্তে রহিয়াই গেল। কেশব ভারতীর মোকদ্দমায় সুপ্রীম কোর্ট আরও রায় দিয়াছেন সংবিধানের ভিত্তি সংক্রান্ত কোন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের নাই। এইজন্য ভারতীয় পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম আইনসভা বলিয়া অভিহিত করা চলে না।

প্রধান বিচারপতি দাশ যেমন বলিয়াছেন যে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ভারতীয় পার্লামেণ্ট পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন আইনসভা। সংবিধান পরিবর্তন বিষয়ে constituent power বা সংবিধান সংশোধনের পূর্ণ ক্ষমতার সহিত যদি পার্লামেণ্টের অন্যান্য ক্ষমতা, যথা, মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ, ইউনিয়ন সরকারের অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে আইনের মারফৎ নিয়ন্ত্রণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতাদি যোগ করিয়া সামগ্রিকভাবে পার্লামেণ্টের স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে, পার্লামেণ্ট ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট হইয়া উঠে যে ব্রিটেনে যেমন ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে নেতৃত্ব দেয় তেমনি ভারতে মন্ত্রীপরিষদ বা Cabinet ভারতীয় সংসদকে নেতৃত্ব দিতেছে। একজন প্রখ্যাত ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রবিদ্ বলিয়াছেন যে পার্লামেণ্টর ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে ক্যাবিনেট দখল করিয়া ফেলিয়াছে কারণ তাহাদেরই পশ্চাতে পার্লামেণ্টের অধিকাংশের সমর্থন রহিয়াছে। বিলাতে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের উদ্ভব হইয়াছে।[1] ভারতেও

---

1 Ramsay Muir : How Britain is governed (Constable, 1933), pp 81-91.

ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব ও প্রভাবের দরুণ পার্লামেণ্ট কোন-ঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। সংবিধান চালু হইবার পর হইতেই পার্লামেণ্টে কংগ্রেস দলের নিরবচ্ছিন্ন একাধিপত্য চলিতেছে। বর্তমান পার্লামেণ্টে 524 জন সদস্যের মধ্যে 368 জন কংগ্রেস দলের অর্থাৎ পার্লামেণ্টের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সদস্য কংগ্রেসী। এইরূপ অবস্থায় কংগ্রেস ক্যাবিনেটের নেতৃত্ব প্রায় একনায়কত্বের পর্যায়ে পৌঁছাইতে পারে। আনুষ্ঠানিকভাবে পার্লামেণ্টের মর্যাদা অবিসংবাদী; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট পার্লামেণ্টকে অনেকাংশে তাহার প্রাপ্য আসন হইতে প্রায় বেদখল করিয়া ফেলিয়াছে। সংসদীয় শাসনতন্ত্রে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বিতর্ক, সমালোচনা প্রভৃতির মধ্য দিয়া পার্লামেণ্ট জনগণের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে সত্য, তাহার মূল্যও কম নহে। কিন্তু যে স্থলে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্ন উঠে, সেস্থলে পার্লামেণ্ট ক্যাবিনেটকে অনুসরণ করে, নেতৃত্ব দিতে পারে না।

সপ্তদশ অধ্যায়

পার্লামেণ্টের কার্যপ্রণালী

ভারতীয় সংবিধান লোকসভা ও রাজ্য সভাকে নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই নিয়মাবলী সংবিধানের পরিপন্থী হইতে পারে না। এই নিয়মাবলীর প্রধানত চারটি উদ্দেশ্য। প্রথমত, সংবিধান অনুসারে সরকার চালাইবার অনুকূল নিয়ম প্রণালী গঠন: দ্বিতীয়ত, সময় নষ্ট না করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের উপর ন্যস্ত সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পাদন। তৃতীয়ত, বিরোধী পক্ষ যাহাতে সরকারী নীতি ও কার্যাবলী সমালোচনা করিবার ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধাদি পায় তাহার ব্যবস্থা করা। চতুর্থত, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে যাহাতে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হইতে পারে নিয়মাবলী দ্বারা তাহারও ব্যবস্থা করা।

নিয়মাবলী : প্রতি কক্ষ (লোকসভা ও রাজ্যসভা) নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া নিজ নিজ কক্ষের অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য খুঁটিনাটি নানা বিষয় নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। নিয়মাবলীতে বলা হইয়াছে যে, কোন সদস্য সভার একধার হইতে অন্য ধারে যাওয়া আসা করিবেন না, সভার অধিবেশন কালে সভাস্থলে কোন বই বা সংবাদপত্র পড়িবেন না, কোন সদস্যকে বক্তৃতা কালে বাধা দিবেন না; বক্তৃতা করিবার সময় কেবলমাত্র সভার অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিবেন; কোন মান হানিকর বা সুরুচি বিরুদ্ধ মন্তব্য করিবেন না প্রভৃতি।

সভা আহ্বান করিয়া রাষ্ট্রপতি সভার তারিখ সময় ও স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। নূতন সাধারণ নির্বাচনের পর প্রতি সদস্যকে অঙ্গীকার করিতে হয়। তাহার পর সভা, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষকে নির্বাচন করিতে অগ্রসর হয়। অধ্যক্ষের নির্বাচনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতি ঐ নির্বাচনে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রতি অধিবেশনের (Session) প্রথমে (যেমন বাজেট অধিবেশন, বর্ষাকালীন অধিবেশন, শরৎকালীন অধিবেশন, শীতকালীন অধিবেশন) সংশ্লিষ্ট সভার অধ্যক্ষ অনধিক ছয়জন সদস্যকে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নিয়োগ করিয়া থাকেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে ঐ ছয়জনের যে কোন ব্যক্তিকে সাময়িকভাবে সভাপতিত্ব করিতে হয়।

স্পীকার বা সভাপতি প্রতি কক্ষের সরকারী নেতার সহিত পরামর্শ

করিয়া অধিবেশনের কার্যাবলী নির্ধারণ করেন এবং কার্যাবলীর তালিকা প্রতি সদস্যের নিকট প্রেরিত হয়।

কোরাম ঃ আইন সম্মত সভার জন্য প্রতি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ এক দশমাংশ প্রতি অধিবেশনে উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে অধ্যক্ষ সভার কাজ স্থগিত রাখেন।

সংসদে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ঃ লোকসভায় ও রাজ্যসভায় নিয়মানুসারে প্রতি অধিবেশনে প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্নাদি উত্থাপন ও তাহার উত্তর দানের জন্য পৃথকীকৃত থাকে। প্রশ্নকারী সদস্যকে উত্তর দানের তারিখের দশ দিন পূর্বে লিখিত ভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর কাছে উত্তর চাহিয়া কক্ষের সচিবের নিকট লিখিয়া পাঠাইতে হয়। সচিব অধ্যক্ষের নির্দেশে উত্তরের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। দুই ধরনের প্রশ্ন হইতে পারে: (ক) তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন এবং (খ) সাধারণ প্রশ্ন। তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দিতে হয়। প্রশ্ন-কর্তা বা কক্ষের যে কোন সদস্য মন্ত্রী কর্তৃক প্রশ্নের উত্তর দানের পর অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার অধিকারী। একজন সদস্য একদিনে তিনটির বেশী তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন করিতে পারেন না ; করিলে সাধারণ প্রশ্নের ন্যায় তাহার লিখিত উত্তর দেওয়া হয়। ঐ উত্তরের উপর কোন অতিরিক্ত প্রশ্ন চলে না। কক্ষের নিয়মানুযায়ী প্রশ্নের উদ্দেশ্য জনজীবন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ। সেইজন্য প্রশ্নের মধ্যে তর্ক বিতর্কের স্থান নাই। প্রশ্নগুলি গ্রহণ ও বর্জন সম্বন্ধে কক্ষের অধ্যক্ষকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

মুলতবী প্রস্তাব ঃ প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরে মুলতবী প্রস্তাব তোলা যাইতে পারে। সর্বসাধারণ সম্বন্ধীয় কোন জরুরী এবং নির্দিষ্ট ব্যাপার আলোচনার জন্য এই প্রস্তাব উত্থাপন করা যাইতে পারে। মূলতবী প্রস্তাব আলোচিত হইবে কিনা তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা অধ্যক্ষকে দেওয়া হইয়াছে। যদি তিনি উহা গ্রহণ যোগ্য বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে তিনি প্রশ্ন করেন কতজন সদস্য ঐ প্রস্তাব আলোচনার পক্ষপাতী। যদি লোকসভার 25 জন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে দণ্ডায়মান হন, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রস্তাব সভায় উত্থাপন করিবার অনুমতি দেন। যে দিন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় সেই দিনই বিকালে 4 ঘটিকায় ঐ প্রস্তাব আলোচনার জন্য ধার্য হইয়া থাকে। মুলতবী প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হইতে পারে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী আড়াই ঘন্টার বেশী ঐ আলোচনা চলিতে পারে না।

সাধারণ প্রস্তাব ঃ সদস্যগণ কক্ষে সাধারণ প্রস্তাব উত্থাপনের অধিকারী। যিনি প্রস্তাব তুলিবেন তাঁহাকে 15 দিনের লিখিত নোটিশ দিতে হইবে। অন্য যে কোন সদস্য ঐ প্রস্তাবের কোন সংশোধক প্রস্তাব পেশ করিতে

পারেন। বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা থাকে। একাধিক প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া গেলে তাহার কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে আলোচিত হইবে তাহা লটারী দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অনাস্থা প্রস্তাব : মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার যে কোন সদস্যের রহিয়াছে। • এ জন্য লিখিত নোটিশ দেওয়া আবশ্যক। যদি লোকসভার ত্রিশজন সদস্য এই প্রস্তাবের সমর্থনে দণ্ডায়মান হন তাহা হইলেই প্রস্তাবটি আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। লোকসভায় এই প্রস্তাব পাশ হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়।

বিলের সূত্রপাত

আয়ব্যয় সংক্রান্ত সকল প্রকার বিলের (Money Bill) একমাত্র উৎপত্তি স্থান (Originating House) লোকসভা। অর্থাৎ একমাত্র লোকসভায়ই ঐ প্রকারের বিলের প্রথম উপস্থাপন হইতে পারে ; রাজ্য সভায় নহে। লোকসভায় প্রথম উত্থাপনের ও আলোচনার পরই ঐ ধরনের বিল রাজ্য সভায় যাইতে পারে, নতুবা নহে। ঐ প্রকারের বিল ব্যতীত অন্যান্য বিল হয় লোক-সভা বা রাজ্যসভা, এই দুইটি কক্ষের যে কোন কক্ষে প্রথম উপস্থাপন করা চলে। সংশোধন ব্যতীত বা সংশোধন সহ বিলটি দুই কক্ষেই ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়া আবশ্যক।

মনে রাখা প্রয়োজন যে যখন একটি আইনের খসড়া প্রস্তাবাকারে সংসদে উত্থাপিত হয়, তখন তাহাকে বিল বলে। সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হইয়া বিল যখন রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে ও সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয় তখন উহাকে Act বলা হয়।

তামাদি বিল : পার্লামেন্টের অধিবেশনের কালে কোন একটি কক্ষে যদি কোন বিল আলোচিত হইতে থাকে, কিন্তু আলোচনা শেষ না হয়, তাহা হইলে পার্লামেণ্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত (Prorogued) হইলেও সেই বিল তামাদি (Lapse) হইয়া যায় না। পরবর্তী অধিবেশনে ঐ বিলটির পুনরায় আলোচনা শুরু হয়। রাজ্য সভায় যে বিল আলোচিত হইতেছে সেই বিল যদি লোকসভায় পাশ না হইয়া থাকে তাহা হইলে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া (Dissolve) দিলেও উহা তামাদি হয় না। কিন্তু লোকসভায় যে বিলের আলোচনা শেষ হয় নাই অথবা যে বিল লোকসভায় আলোচনা হইবার পর রাজ্যসভায় আলোচিত হইতেছে, এমন বিল লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিলে তামাদি হইয়া যায়।

সরকারী বিলের নেপথ্য প্রস্তুতি

পার্লামেন্টে তিন প্রকারের বিল উত্থাপিত হইতে পারে, সরকারী

বিল, বেসরকারী বিল ও অর্থ বিল। অর্থ বিল সম্বন্ধে পৃথক ব্যবস্থা আছে। অন্য দুই ধরনের বিল পাশের বিভিন্ন পর্যায় ও বিধি কতকটা একই প্রকারের।[1] কোন বিষয়ে বিল উত্থাপন করা হইবে কিনা তাহা বিভাগীয় মন্ত্রী বিবেচনা করিয়া ক্যাবিনেটে বিলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য উপস্থাপিত করেন। ক্যাবিনেট, বিভাগীয় মন্ত্রীর প্রস্তাব না পাইলেও, আপন ইচ্ছায় যে কোন বিভাগ সম্বন্ধে বিলের প্রাথমিক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে। বলা বাহুল্য, উভয় ক্ষেত্রেই ক্যাবিনেটই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকে। ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পর বিল প্রস্তুতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রতি বিলে যে ব্যবস্থা করা হয় তাহা একাধিক বিভাগের সহিত সম্পর্কিত থাকে। যেমন খাদ্য ও কৃষি বিভাগ সেচ বিভাগের সহিত সম্পর্কিত। অর্থ বিভাগের সহিত সকল বিভাগেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। বিভাগীয় সচিব অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সচিবগণের সহিত পরামর্শ করেন। এই স্তরে বিভিন্ন মন্ত্রীগণও প্রয়োজন মত আলাপ আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভাগীয় সচিবালয় বিলের মোটামুটি কাঠামো প্রস্তুত করে। কিন্তু বিলটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয় আইন বিভাগ (Ministry of Law), কারণ তাহারাই বিল প্রস্তুতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ইহার পর অনুমোদনের জন্য বিলটি ক্যাবিনেটে উপস্থাপিত করা হয়। বিলটি ক্যাবিনেটের অনুমোদন লাভ করিলে ছাপানো হয় এবং পার্লামেন্টে বিল উত্থাপনের প্রস্তুতি শুরু হয়।

বেসরকারী বিল ঃ বেসরকারী সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিলকে বেসরকারী বিল বলে। এই সকল বিল সরকারের সমর্থন না পাইলে কিছুতেই পাশ হইতে পারে না; কারণ সরকারের পশ্চাতে লোকসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন থাকে। সরকার সাধারণতঃ এই সকল বিলকে সহানুভূতির চোখে দেখেন না এবং নানা আপত্তি তুলিয়া সংখ্যা গরিষ্ঠের চাপে বিলটিকে বানচাল করিয়া দেন। এই কারণে বেসরকারী বিলের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তবে সরকার পক্ষের সমর্থন থাকিলে বেসরকারী বিলের ভাগ্য উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। কিন্তু তাহা কদাচিৎ হয়।[2]

বিলের কাঠামো ঃ প্রতি সরকারী ও বেসরকারী বিলের কয়েকটি অংশ থাকে। প্রথমতঃ, প্রস্তাবনা (Preamble); ইহাতে যে বিষয়ে বিল তাহা অতি সংক্ষেপে লিখিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ, মূল বিল বা প্রস্তাবিত আইনটি কতকগুলি ধারায় বিভক্ত থাকে। তৃতীয়তঃ, প্রতি বিলের শেষে বিলের

1 'বেসরকারী বিল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান' শীর্ষক পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।
2 'বেসরকারী বিল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান' শীর্ষক পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

লক্ষ্য ও উহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কারণগুলি বিবৃত হয়। ইহাকে ইংরাজীতে Statement of Objects and Reasons বলে। চতুর্থতঃ, বিলে একটি আর্থিক স্মারকলিপি ও (Financial Memorandum) যোগ করিয়া দেওয়া হয়। বিল পাশ হইলে তাহার দরুণ আনুমানিক আর্থিক আয়ব্যয় কিরূপ হইবার সম্ভবনা তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করা হয়।

বিল পাশের বিভিন্ন স্তর

(1) প্রথম পাঠ বা প্রথম পর্যায়ে (First reading) বিল উত্থাপন :

একটি বিলের জন্য সাধারণতঃ একমাসের নোটিশ প্রয়োজন হয়। যে সদস্য বিল উত্থাপন করিতে চাহেন তাহাকে প্রথমতঃ বিলটি উত্থাপনের জন্য সভার অনুমতি লাভ করিতে হয়। এই জন্য তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়া বিলের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন। বিরোধীগণের বক্তব্যেরও সুযোগ থাকে। এই স্তরে বিতর্কের সুযোগ বিলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যেই সীমিত। প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য সমর্থন করিলে বিলটির উত্থাপন পর্ব অর্থাৎ প্রথম পাঠ শেষ হয়। উত্থাপনের পর বিলটি জনগণের অবগতির জন্য সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে বিলটি লোক সভার স্পীকার বা রাজ্য সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে সরাসরি গেজেটে প্রকাশিত হইতে পারে। ইহা-কেই বিলের প্রথম পর্যায় বলিয়া গণ্য করা হয়।

(2) দ্বিতীয় স্তরে বিল উত্থাপক নিম্নলিখিত প্রস্তাবের যে কোন একটি উত্থাপন করিতে পারেন। যথা : (ক) বিলটি সভা কর্তৃক বিচার বিবেচনা করা হউক। (খ) বিলটি সভাকর্তৃক নির্বাচিত একটি কমিটির নিকট তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামত দানের জন্য প্রেরিত হউক। (গ) বিলটি দুই সভা হইতে (লোকসভা ও রাজ্যসভা) কয়েকজন করিয়া সদস্য লইয়া গঠিত একটি যুক্ত কমিটির নিকট তাহাদের সুচিন্তিত মতামত দানের জন্য প্রেরণ করা হউক এবং (ঘ) বিলটির উপর জনসাধারণের মতামতের জন্য প্রচার করা হউক।

এইস্থলে প্রথমোক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে আরও আলোচনা প্রয়োজন। খুব কম সংখ্যক বিলই কমিটিতে প্রেরণ করা হয় বা জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হয়। লক্ষণীয় যে ভারতীয় পার্লামেন্টে যে সকল বিল উত্থাপিত হয় তাহা প্রায় সবই সরকারী বিল, অর্থাৎ সরকারের পক্ষ হইতে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিলের দ্বিতীয়

পাঠের সময় প্রায় সকল ক্ষেত্রেই প্রথম প্রস্তাবটি অর্থাৎ কমিটিতে না পাঠাইয়া বা জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার না করিয়া সরাসরি বিচার বিবেচনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাকেন। ঐ প্রস্তাব পাশ হইলে এই পর্যায়েই ধারাভিত্তিক আলোচনা চলিতে থাকে। সদস্যগণ বিভিন্ন ধারার উপর সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। সংশোধক প্রস্তাব সম্বন্ধে সভার যে নিয়মাবলী আছে তদনুসারে সংশোধনী পেশ করিতে হয়। ধারাসমূহ ও তাহার সংশোধকের উপর বিতর্ক চলিতে থাকে। প্রতি ধারার উপর ভোট গ্রহণ করা হয়। বিলের প্রস্তাবনা সহ সমস্ত ধারাগুলি গৃহীত হইলে বিলের দ্বিতীয় পাঠ সমাপ্ত হয়।

(3) এই সকল বিলের তৃতীয় পাঠের সময় সমগ্র বিলটি গ্রহণ করা হইবে কি না—তাহা লইয়াই আলোচনা চলে। উত্থাপক সদস্য প্রস্তাব করেন যে বিলটি যেরূপভাবে সভায় স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপভাবে বিলটি গৃহীত হউক। এই পর্যায়ে বিলের ধারাগুলির খুঁটিনাটি বিষয়ে বিতর্কের স্থান নাই। বিলের মৌলিক বিষয়টি লইয়াই আলোচনা চলে। তবে অধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া শব্দগত পরিবর্তন বা কোন ভুল সংশোধন করা যাইতে পারে। ঐ প্রস্তাব পাশ হইয়া গেলে বিল সভায় পাশ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। সুতরাং প্রায় সকল বিলের পক্ষে প্রথম পাঠ হইতেছে বিলটি উত্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা। এই পর্যায়ে বিলের নীতি আলোচিত হয় ও ভোটের দ্বারা সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় পাঠে ধারাওয়ারী আলোচনা ও প্রতি ধারার উপর ভোট গ্রহণ। তৃতীয় পর্যায়ে বিল গৃহীত হইবে কিনা—এই বিষয়ে আলোচনান্তর ভোট হয়। বিলটি সভায় পাশ হইলে অপর কক্ষে বিলের আলোচনা শুরু হয়। দুই কক্ষের আলোচনা ও বিতর্ক পদ্ধতিতে কোন তফাৎ নাই। বিলটি অপর কক্ষেও পাশ হইয়া গেলেই আইনে পরিণত হয় না। পার্লামেন্ট হইতে পাশ হইবার পর বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য উপস্থাপিত হয় এবং তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

সিলেক্ট কমিটি ও রিপোর্ট পর্যায়ঃ কোন বিল উত্থাপক প্রস্তাব করিতে পারেন যে, বিলটি সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিবেচনা কমিটি (Select Committee) অথবা দুই সভার সদস্যদের কয়েকজনকে লইয়া একটি যুক্ত বিবেচনা কমিটির (Joint Select Committee) নিকট সুচিন্তিত মতামত দানের জন্য প্রেরণ করা হউক অথবা বিলটির উপর জনসাধারণের মতামত প্রকাশের জন্য প্রচার করা হউক।

যদি একটি যুক্ত কমিটি নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হয় তাহা হইলে

উত্থাপক তাহার কক্ষের কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করেন মাত্র। অপর কক্ষের সদস্যগণ সেই কক্ষদ্বারাই কমিটিতে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রথম কক্ষ অপর কক্ষকে অনুরোধ জানায়। যুক্ত কমিটির সাধারণতঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য লোকসভার ও এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য সভা হইতে লওয়া হইয়া থাকে। কক্ষের প্রতি দলের সদস্যসংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার যত ভাগ সেই অনুযায়ী কমিটির আসন বিভিন্ন দলের মধ্যে বন্টিত হয়।

সিলেক্ট কমিটি বা যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে ঐ কমিটি প্রয়োজন মত সাক্ষ্য গ্রহণ বা প্রয়োজনীয় দলিল তলব করিতে পারে। কমিটি বিলের লক্ষ্য ও বিভিন্ন ধারা বিস্তারিত আলোচনা করে। কমিটি বিলের মূল উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া বিভিন্ন ধারার সংশোধন ও প্রস্তাব করিতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাদের রিপোর্ট সভায় দাখিল করিতে হয় এবং তাহা সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভারতীয় পার্লামেন্টের খুব কম সংখ্যক বিলই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ন্যাশান্যাল লাইব্রেরী বিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাকে ব্যতিক্রম বলা যায়।

সিলেক্ট কমিটি বা বিবেচনা কমিটির সভাপতি তাহাদের মন্তব্যসহ রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্ট পেশ হইবার পর বিলের উত্থাপক এই সময় তিন ধরনের প্রস্তাবের যে কোন একটি উত্থাপন করিতে পারেন:

(1) কমিটির রিপোর্টসহ বিলটির বিচার বিবেচনা করা হউক;

(2) বিলটি রিপোর্টসহ পূর্বোক্ত সিলেক্ট কমিটি বা বিবেচনা কমিটিতে পুণরায় প্রেরণ করা হউক, অথবা

(3) বিলটি জনমত সংগ্রহের জন্য প্রচার করা হউক।

সরকারী বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রথম প্রস্তাবটিই করিয়া থাকেন এবং উহা সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে পাশ হইয়া যায়। এই স্তরে বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে আলোচনা চলে এবং সংশোধক প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ থাকে। শেষে বিলটি সংশোধিত বা অসংশোধিত আকারে ভোটে দেওয়া হয়। বিলটি এই স্তর উত্তীর্ণ হইবার পর তৃতীয় পাঠের (Third Reading) সূচনা হয়। বিলের পরবর্তী পরিক্রমা 'বিল পাশের বিভিন্ন স্তর' শীর্ষক আলোচনায় যেরূপ লিখিত হইয়াছে সেইরূপ (তৃতীয় পাঠ দ্রষ্টব্য)।

যুক্ত অধিবেশন: যদি দুই কক্ষ বিল সম্বন্ধে সকল বিষয়ে একমত হয় তাহা হইলেই উপরে লিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব কিন্তু এক কক্ষ বিল

পাশ করিলেও অন্য কক্ষ তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারে; দ্বিতীয়তঃ ছয় মাস বিলকে ফেলিয়া রাখিতে পারে। এই উভয় অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দুই কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে পারেন। যুক্ত অধিবেশনে লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করেন এবং অধিকাংশের ভোটে বিল গ্রহণ করা হইবে না বর্জন করা হইবে, তাহা স্থির হইয়া যায়।

এক কক্ষে বিল যে ভাবে গ্রহণ করা হইল, অপর কক্ষ ঠিক সেই ভাবে বিল পাশ না করিয়া সংশোধিত আকারে গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উল্লিখিত অপর কক্ষের সংশোধিত বিলটি প্রথম যেখানে আলোচনা হইয়াছে সেই কক্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম উত্থাপনের কক্ষ যদি বিচারবিবেচনা করিয়া সংশোধণগুলি গ্রহণ করে তাহা হইলে বিল দুই কক্ষেই গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়। যদি দুই কক্ষ একমত না হইতে পারে তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই অধিবেশনে লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিলের ভাগ্য নির্ণীত হয়।

রাষ্ট্রপতির সম্মতিঃ দুই কক্ষ কর্তৃক পাশ করা বিল যে কক্ষে প্রথম বিল উত্থাপিত হয় সেই কক্ষের সভাপতি স্বাক্ষর করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করেন। রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলে বিল আইনে পরিণত হয়, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা সম্মতি জ্ঞাপন না করিয়া যে কক্ষ হইতে বিল তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে সেই কক্ষে বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে কি পরিবর্তন তিনি ইচ্ছা করেন তাহাও জানাইয়া দিতে পারেন। তাহা হইলে দুই কক্ষেই বিলটি পূর্বোক্ত পদ্ধতি অনুযায়ী পুনরালোচিত হইবে এবং যদি ঐ বিল দুই কক্ষ গ্রহণ করে এবং উহা রাষ্ট্রপতির নিকট পুনঃপ্রেরিত হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির গত্যন্তর থাকে না, সম্মতি জ্ঞাপন করিতেই হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে বিলে সম্মতি দান বা অসম্মতি জ্ঞাপন অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিতে হয়। এই স্থলেও তাঁহার স্বাধীন মতামতের কোন স্থান নাই। রাষ্ট্রপতি কতদিনের মধ্যে বিল সম্পর্কে তাঁহার মতামত জ্ঞাপন করিবেন তাহা সংবিধানে উল্লিখিত নাই। ইহার সুযোগ লইয়া অনেক সময় মন্ত্রীমণ্ডলী অতিশয় বিতর্কমূলক বিল পুনর্বিবেচনার সুযোগ লইয়া থাকেন।

বেসকারী বিল সম্বন্ধে বিশেষ বিধান

প্রথমতঃ, বেসরকারী বিলের জন্য একমাসের নোটিশ প্রয়োজন। তবে সভার অধ্যক্ষের অনুমতি থাকিলে একমাসের কম নোটিশ দিলেও চলে। দ্বিতীয়তঃ, বেসরকারী বিলের জন্য এক একটি অধিবেশনে অধ্যক্ষ কর্তৃক কয়েকটি দিন ধার্য করিয়া দেওয়া হয়। কেবলমাত্র ঐ সকল নির্দিষ্ট দিনেই বেসরকারী সদস্যগণ নিজ নিজ বিল উত্থাপন করিতে পারেন। বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য লোকসভায় একটি কমিটি আছে, ইহাকে বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব কমিটি (Committee on Private Member's Bills and Resolution) বলে। বেসরকারী প্রতিটি বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিবার পূর্বে এই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। কমিটি বিলটি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিয়া থাকে। সংসদ ঐ রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহা ব্যতীত বেসরকারী বিল পাশের পদ্ধতি অন্য সকল বিলের অনুরূপ।

অষ্টাদশ অধ্যায়

পার্লামেণ্টের অর্থ বিষয়ক আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

সাধারণ আইন যে পদ্ধতিতে প্রণীত হয়, অর্থ বিল ও আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতি পূরাপূরি প্রযুক্ত হয় না। এই বিষয়টি বুঝিতে হইলে অর্থ বিল (Money Bill) ও বার্ষিক আয়-ব্যয় সংক্রান্ত সামগ্রিক বিল (Appropriation Act) ও রাজস্ব বিল (Financial Bill) সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

অর্থ বিলের সংজ্ঞা

অর্থ বিলের সংজ্ঞা সংবিধানের 110 ধারায় দেওয়া হইয়াছে। যে বিলে—

(1) কর ও সরকারী ঋণ সম্বন্ধীয় যে কোন প্রকারের প্রস্তাব ;

(2) সরকারের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিলে অর্থাগম ও ঐ তহবিল হইতে ব্যয় সংক্রান্ত প্রস্তাবাদি ;

(3) সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব অথবা ইউনিয়ন বা রাজ্য সরকারের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবাদি যাহাতে উল্লিখিত থাকে তাহাকেও অর্থ বিল বলে। 110 (2) ধারায় কতকগুলি ব্যতিক্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে বিলে জরিমানা আদায় বা লাইসেন্স বা অন্য কোন সুবিধা দান বাবদ ফি আদায়ের প্রস্তাব থাকে কিম্বা স্থানীয় কোন কর আদায়ের প্রস্তাব থাকে তাহাকে অর্থ বিল বলা যায় না। 110 (1) ধারায় যে সকল বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে কেবলমাত্র সেই সম্বন্ধীয় আইন প্রস্তাবকেই অর্থবিলের পর্যায়ে ফেলা যায়। কোন বিল অর্থ বিল পর্যায়ে পড়ে কি না সন্দেহ উপস্থিত হইলে লোকসভার স্পীকার বা অধ্যক্ষ যে সিদ্ধান্ত করিবেন তাহাই প্রামাণ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে।

বার্ষিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন (Appropriation Bill)

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ পরবর্তী আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে নিজ নিজ বিভাগ সম্বন্ধে আয়-ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি লোকসভার নিকট উপস্থাপিত করেন। পরে সকল বিভাগীয় আয়-ব্যয় মঞ্জুরির হিসাব একত্র করিয়া কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী একটি বৃহৎ বিল লোকসভায় উপস্থাপিত করেন। ইহাকে

বার্ষিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন Grand Appropriation Bill অথবা কেবলমাত্র Appropriation Bill বলা যায়।

বার্ষিক রাজস্ব আইন (Finance Bill)

লোকসভা বার্ষিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন দ্বারা ব্যয় মঞ্জুর করিয়া থাকে। রাজস্ব আইন দ্বারা কি উপায়ে এই ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব লোকসভা তাহাই মঞ্জুর করে। রাজস্ব আইনে কর স্থাপন, করের পরিবর্তন, কর প্রত্যাহার প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

বার্ষিক সামগ্রিক মঞ্জুরী আইনে (Appropriation Act) যে সকল ব্যয় লোকসভা অনুমোদন করিয়াছে কেবলমাত্র সেই ব্যয়ের জন্যই ভারত সরকারের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কতকগুলি বিষয়ে সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে ব্যয় করা যায়। সেইজন্য লোকসভার বার্ষিক অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।[1]

ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of India)

ভারত সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত (ক) কর ও শুল্ক বাবদ আয়; (খ) সকল প্রকার রাজস্ব; (গ) ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণ বাবদ সকল অর্থ এবং (ঘ) ভারত সরকারের নিকট হইতে যে গৃহীত ঋণ পরিশোধ দরুণ প্রদত্ত অর্থ একটি বৃহৎ অর্থ ভাণ্ডারে জমা করা হয়। এই তহবিলকে ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল বলা হয়।

পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত কোন অর্থই এই তহবিল হইতে তুলিয়া লওয়া চলে না। কর ও অন্যান্য খাতে এই ভাণ্ডারে নানা উৎস হইতে অর্থ আসিয়া জমা পড়ে এবং এই ভাণ্ডার হইতে সংবিধানের নিয়মানুসারে পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী বলে অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে।

ভারতের সরকারী অর্থ ভাণ্ডার (Public Accounts of India)

উপরে উল্লিখিত খাত ব্যতীত অন্যান্য খাত হইতে যে সকল অর্থ ভারত সরকার পাইয়া থাকে তাহা আর একটি ভাণ্ডারে জমা হয়। ইহাকে ভারতের সরকারী অর্থ ভাণ্ডার বলা হইয়া থাকে।

অনিশ্চিত ব্যয় বাবদ তহবিল (Contingency fund)

অনিশ্চিত ব্যয় বাবদ তহবিলটি সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী পার্লামেণ্ট

1 'স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পার্লামেণ্টের বার্ষিক ভোট ব্যতীত ব্যয়' শীর্ষক পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

কর্তৃক সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিষয়ে পার্লামেণ্টকৃত আইন অনুসারে সুবিধানুযায়ী অর্থ জমা করা হইয়া থাকে। এই ভাণ্ডার হইতে অনিশ্চিত ব্যয় বাবদ রাষ্ট্রপতি কোন ব্যয় নির্বাহের জন্য অগ্রিম দাদন দিতে পারেন।

বলা বাহুল্য, দাদনের পর পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে আইন করিয়া রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অগ্রিম অনুদান মঞ্জুর করিয়া থাকে।

অর্থ বিল পাশের পদ্ধতি

প্রথমতঃ, অর্থ বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা যায় না। সকল অর্থ বিলেরই লোকসভায় সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া কোন অর্থ বিল উত্থাপিত হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ, পূর্বেই বলা হইয়াছে একটি বিল অর্থ বিল কি না সে সম্বন্ধে তর্ক উঠিলে লোকসভায় স্পীকারের সিদ্ধান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ—লোকসভা কর্তৃক অর্থবিল আইন প্রণয়নের নিয়মানুসারে পাশ হইয়া গেলে স্পীকারকে ঐ বিলের মধ্যেই সহি করিয়া লিখিয়া দিতে হয় যে বিলটি একটি অর্থবিল। রাজ্যসভা অর্থবিল সংশোধন করিতে পারে না। ঐ সম্বন্ধে লোকসভার নিকট সুপারিশ করিতে পারে মাত্র। লোকসভা হইতে বিলটি রাজ্যসভায় পৌঁছিবার 14 দিনের মধ্যে রাজ্যসভাকে বিলটি সুপারিশসহ অথবা বিনা সুপারিশে লোকসভায় পাঠাইয়া দিতে হইবে। যদি তাহা ঐ সময়ের মধ্যে লোকসভায় ফেরত না দেওয়া হয় তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে বিলটি উভয় সভাই গ্রহণ করিয়াছে।

স্পীকার তাহার পর বিলটি যে অর্থবিল এইরূপ লিখিয়া সহি করিয়া দেন এবং তাহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। অন্যান্য বিলের ন্যায় রাষ্ট্রপতি অর্থবিলে পার্লামেণ্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাইতে পারেন না। সংবিধানের 111 ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করিতে অস্বীকার করিতে পারেন। বস্তুত এইক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। যেহেতু অর্থবিলগুলি সরকারী বিলের পর্যায়ে পড়ে সেইহেতু রাষ্ট্রপতির অর্থবিলে সম্মতি জ্ঞাপন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এইস্থলে লক্ষণীয় যে জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয় লোকসভাই অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। জনগণ প্রদত্ত করের সাহায্যেই সরকারের প্রশাসনযন্ত্র চলিতে থাকে। কর স্থাপন ও জাতির স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে অর্থ ব্যয় সম্বন্ধে এই কারণেই জনগণের প্রতিনিধিস্থানীয়

লোকসভাকে প্রায় একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। যাহারা কর দিতেছে তাহাদেরই প্রতিনিধি আয়-ব্যয় বিষয়ে সমালোচনা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তে আসিবে, ইহাই গণতন্ত্র সম্মত। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন অর্থবিল লোকসভায় আসিতেই পারে না। কার্যতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীই রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি বেসরকারী সদস্যগণকে অর্থবিল উত্থাপনের ক্ষমতা দেওয়া হইত, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার একটা অরাজকতা সৃষ্টি হইতে পারিত। বেসরকারী সদস্যগণের জাতীয় আয়-ব্যয়, স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল, কর স্থাপনের সুদূরপ্রসারী ফলাফল প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে না। এজন্য যে পুঙ্খানপুঙ্খ তথ্যাদি জানা প্রয়োজন তাহা সরকারের বাহিরে থাকিয়া বেসরকারী সদস্যগণ কিছুতেই তাহা জানিতে পারেন না। সুতরাং অর্থবিল সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা শুধু যে গণতন্ত্রসম্মত তাহাই নহে; এই ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও শৃঙ্খলাবদ্ধ আর্থিক প্রশাসনের পক্ষে অনুকূল। অর্থবিল সম্বন্ধে যে সকল সাংবিধানিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা ব্রিটেনের ধারা অনুসরণ করিয়াই সংবিধানে স্থান দেওয়া হইয়াছে। বলাবাহুল্য, ব্রিটেনের ঐ ব্যবস্থা শত শত বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছে।

লোকসভার বার্ষিক অর্থ সমীক্ষা

ভারত সরকারের রাজস্ব (Finance) এবং আয়-ব্যয় পরিচালনা ও সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা লোকসভার একটি বিশেষ কর্তব্য। সংবিধানে এইজন্য বিশেষ ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। ভারত সরকারের ও লোকসভার অর্থচক্র (Financial Circuit) শুরু হয় বাজেটে এবং শেষ হয় বার্ষিক রাজস্ব বিলে। এই চক্রের বিভিন্ন পর্যায় সংক্ষেপে এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(1) ইউনিয়ন সরকারের অর্থমন্ত্রী বাজেট এবং বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব লোকসভায় পেশ করেন।

(2) পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে সাধারণ আলোচনা হয়। লোকসভার সদস্যগণ এই সময় ভারতের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিতে পারেন। রাজ্যসভারও সাধারণ আলোচনার অধিকার আছে।

(3) দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ একে একে নিজ বিভাগের আয় ব্যয়ের হিসাব দিয়া অর্থ মঞ্জুরী দাবি করেন। ইহাকে ইংরাজীতে (Demand for Grant) বলে। সদস্যগণ মন্ত্রী প্রস্তাবিত

ব্যয়ের হ্রাসসূচক সংশোধক প্রস্তাব দাখিল করিতে পারেন। ব্যয় বৃদ্ধি মূলক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। কোন বিভাগে ব্যয়বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতে হইলে, ব্যয় হ্রাসের সংশোধন প্রস্তাব আনুষঙ্গিকভাবে উত্থাপন করিতে হয়। উত্থাপক সদস্য তাহার ভাষণে নিজ দাবি বুঝাইয়া বলেন। আলোচনার পর ভোটে লোকসভা সিদ্ধান্ত লয়।

(4) বিভিন্ন মঞ্জুরী একত্রিত করিয়া অর্থমন্ত্রী একটি বৃহৎ সামগ্রিক মঞ্জুরী আইন (Appropriation Bill) লোকসভায় দাখিল করেন। এই ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় পর্যায়ের ন্যায় সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে। এই বিলটি বিধানসভায় পাশ হইয়া রাজ্যসভায়ও যায়। স্পীকার সার্টিফিকেট লিখিয়া দেন যে বিলটি একটি অর্থবিল। অর্থবিল বিষয়ে রাজ্যসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাহারা বিলের কোন পরিবর্তন করিতে পারেন না। ঐ সম্বন্ধে সুপারিশ বা আলোচনা করিতে পারেন মাত্র। রাজ্যসভা হইতে লোকসভায় বিল ফেরত আসে এবং স্পীকারের পূর্বোক্ত প্রস্তাবের সার্টিফিকেট সহ রাষ্ট্রপতির নিকট তাহার সম্মতির জন্য বিলটি প্রেরিত হয়।

(5) বার্ষিক সামগ্রিক ব্যয় মঞ্জুরী আইনে (Appropriation Act) লোকসভা প্রধানত ব্যয় মঞ্জুর করিয়া থাকে। Finance Bill বা রাজস্ববিল পাশ করিয়া কি উপায়ে, কি কি কর স্থাপন করিয়া ঐ ব্যয় নির্বাহ হইতে পারে তাহাই নির্ধারণ করিয়া দেয়। রাজস্ব ব্যবস্থা চক্রের (Financial Circuit) শেষ রাজস্ব আইনে (Finance Act)।

এই স্থলে উল্লিখিত বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে নিম্নে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।

পার্লামেণ্টে বাজেট পেশ (Presentation of Annual Financial Statement and Budget)

ভারতের আর্থিক বৎসর পয়লা এপ্রিল হইতে একত্রিশে মার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাজেট অর্থমন্ত্রী কর্তৃক একত্রিশে মার্চের পূর্বে (সাধারণত ফেব্রুয়ারী মাসে) একটি নির্দিষ্ট দিনে লোকসভায় উপস্থাপিত হয়। আর্থিক বৎসর আরম্ভ হইবার বহু পূর্বে বিভিন্ন বিভাগ আগামী বৎসরে তাহাদের বার্ষিক আয় ব্যয়ের খসড়া দাবিপত্র তৈয়ার করিয়া অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রতি বিভাগের সহিত আবশ্যকমত অর্থমন্ত্রক ঐ বিভাগীয় দাবি সম্বন্ধে আলোচনা করে। প্রথমত আলোচনা বিভাগীয় সচিব স্তরে চলিতে থাকে। কিন্তু প্রয়োজন হইলেই বিভাগীয় মন্ত্রীগণ অর্থমন্ত্রীর সহিত আলোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভিন্ন বিভাগের আয় ব্যয় সম্বন্ধে

অর্থমন্ত্রণালয় মতৈক্যে পেঁছায়। অর্থমন্ত্রী সমস্ত বিভাগের আয় ব্যয় সম্বলিত দাবি দাওয়া একত্র করিয়া এবং তাহাদের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিয়া তাঁহার বাজেট বক্তৃতা ও বিবরণী প্রস্তুত করেন। তাহার পর রাষ্ট্রপতির অনুমতি ও নির্দেশানুসারে অর্থমন্ত্রী পার্লামেণ্টের সম্মুখে তাহা উত্থাপন করেন। অর্থমন্ত্রী তাহার বাজেট বক্তৃতা ও বিবরণীতে

(ক) জাতীয় আয়-ব্যয়ের চলতি বৎসরের অবস্থা হিসাবসহ বিবৃত করেন এবং

(খ) আগামী বৎসরে কিরূপ আয়-ব্যয় হইবার সম্ভাবনা এবং

(গ) সেইজন্য কোন নূতন কর স্থাপন করা প্রয়োজন হইবে কিনা তাহার ইঙ্গিত দেন।

(ঘ) এই সূত্রে কোন কর কমাইবার বা প্রত্যাহার করিবার কথাও তিনি প্রয়োজনমত উল্লেখ করেন।

(ঙ) অর্থমন্ত্রীর বিবৃতিতে জাতীয় ঋণের হিসাব থাকে।

(চ) যেসকল ব্যয় স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী-ক্রমে ব্যয় হইবে এবং যে সকল ব্যয় জাতীয় স্থায়ী অর্থভাণ্ডার হইতে ব্যয় হইবে, পার্লামেণ্টের ভোট ব্যতিরেকে—এই দুই ধরনের ব্যয় পৃথক পৃথক ভাবে দেখাইতে হয়। ইহা ব্যতীত চলতি বৎসরের ও আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়-ব্যয় দুইটি বিভিন্ন হিসাবে দাখিল করিতে হয়। এগুলি হইল :

(1) সরকারের রাজস্বখাতে আয় ব্যয়, (Revenue Income and Expenditure) ;

(2) সরকারের মূলধন, বিনিয়োগখাতে আয় ব্যয় (Capital Income and Expenditure)।

রাজস্বখাতের আয় ব্যয়ের মধ্যে থাকে, করের খাতে আয় ও কর সংগ্রহের জন্য ব্যয় ইত্যাদি। মূলধন বিনিয়োগের খাতে আয় ব্যয়ের মধ্যে থাকে, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের খাতে ব্যয় এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের নিকট হইতে সংগৃহীত মূল্য ইত্যাদি।

স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে পার্লামেণ্টের বার্ষিক ভোট ব্যতীত ব্যয় (Expenditure Charged on the Consolidated Fund)

পার্লামেণ্টের মঞ্জুরী ব্যতীত সরকার এক পয়সাও ব্যয় করিতে পারে না। তাই প্রতি বৎসর পার্লামেণ্ট ব্যয় মঞ্জুর করিয়া থাকে, নতুবা সরকার অচল হইয়া যায়। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম আছে।

কতকগুলি খাতে ব্যয়ের জন্য সরকারকে পার্লামেণ্টের বার্ষিক ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয় না। যথা;

(ক) রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা এবং তাহার দপ্তরের যাবতীয় খরচ।

(খ) রাজ্যসভার সভাপতি ও লোকসভার স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের বেতন ও ভাতা।

(গ) জাতীয় ঋণ পরিশোধ বাবদ যাবতীয় ব্যয়।

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাতা এবং পেনসেন ও তাহাদের দপ্তরের ব্যয়।

(ঙ) ভারতের ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের (Auditor General of India) বেতন ভাতা এবং দপ্তর সংক্রান্ত ব্যয়।

(চ) আদালতের রায় অনুসারে সরকার কর্তৃক দেয় অর্থ।

(ছ) কেন্দ্রীয় (ইউনিয়ন) নিয়োগ কমিশনের ব্যয়। ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্টকে এই তালিকায় আরও বিষয় যোগ করিয়া দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

বিশেষভাবে লক্ষ করিতে হইবে যে যদিও উপরোক্ত খাতে ব্যয়সমূহ পার্লামেণ্টের বার্ষিক ভোটের আওতায় আসে না, তথাপি ঐ সমস্ত বা যে কোন বিষয়ই পার্লামেণ্টের আলোচনায় উত্থাপিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে।

মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক অনুদান দাবি (Demands of Grants)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিরেকে কোন ব্যয়ের দাবি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা বস্তুতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীরই ক্ষমতা কারণ রাষ্ট্রপতি অন্য সকল বিষয়ের ন্যায় এই বিষয়েও মন্ত্রী মণ্ডলীর মতানুসারে কাজ করিয়া থাকেন। বাজেটের সাধারণ আলোচনার পর সরকারের বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ একে একে বিভাগীয় ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য লোকসভায় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তাহার সমর্থনে যুক্তি দেখাইয়া বক্তৃতা করেন। ইহাকে ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি বলা হয় (Demand for Grant)। বিরোধীপক্ষীয় সদস্যগণ ব্যয় মঞ্জুরী কমাইয়া দিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারেন। তাহারা ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব আনিতে পারেন না। সাধারণত বিরোধী দলের প্রস্তাবকগণ নামমাত্র ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব মাধ্যমে বিভাগের পরিচালনার সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাকে Token cut বা প্রতীকী হ্রাস বলা যাইতে পারে। মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষীয় সদস্যগণ বক্তৃতা দিয়া বিভাগীয় ব্যয়ের দাবি সমর্থন করেন এবং বিভাগ

সম্বন্ধে গঠনমূলক প্রস্তাবও উত্থাপন করিতে পারেন। সর্বশেষে বিভাগীয় মন্ত্রী সমালোচনার উত্তর দেন এবং শেষে ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়া হয়। প্রস্তাব যদি পাশ হইয়া যায় তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে পার্লামেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলীর উপর আস্থা নাই। এই অবস্থায় মন্ত্রীমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু যেহেতু মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন রহিয়াছে সেইহেতু মন্ত্রীর প্রস্তাবই পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে।

অনুদানের দাবিসমূহ উত্থাপিত হইবার পূর্বেই লোকসভার নেতার সহিত পরামর্শ করিয়া স্পীকার বা অধ্যক্ষ অনুদান দাবির জন্য কত দিন ধার্য করা হইবে তাহা স্থির করিয়া দেন। বলাবাহুল্য, যাহাতে অনুদান দাবির উপর আলোচনা ভাল করিয়া ও বিস্তারিতভাবে চলিতে পারে তদনুযায়ী স্পীকার সময়কাল ধার্য করিয়া থাকেন। নির্দিষ্ট দিনগুলির শেষে দিনে অপরাহ্ণ পাঁচটায় যদি দেখা যায় যে কতকগুলি বিভাগীয় অনুদান দাবি পাশ করা বাকি রহিয়াছে তাহা হইলে ঐ সকল দাবির আর আলোচনাই হয় না। সমস্ত দাবিগুলি একত্র করিয়া স্পীকার লোকসভার ভোটে দেন।

অর্থ অধিগ্রহণ বিল (Appropriation Bill)

বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ কর্তৃক উত্থাপিত ব্যয় সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি লোকসভা কর্তৃক গৃহীত হইলে, অর্থমন্ত্রী অর্থ অধিগ্রহণ বিল লোকসভায় উত্থাপন করেন। এই বিল দ্বারা সরকার সকল বিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রস্তাব করিয়া দাবি করেন যে ঐ পরিমাণ অর্থ লোকসভা কর্তৃক মঞ্জুর করা হউক। সরকারকে ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে ঐ পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবার অনুমতি দেওয়া হউক।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে অর্থ অধিগ্রহণ বিলে প্রতি বিভাগীয় ব্যয় পৃথক পৃথক ভাবে দেখানো হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহা ব্যতীত এই বিলে সরকারী ব্যয় দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখানো হয়:

(ক) সেইসকল ব্যয় যাহা পার্লামেণ্টের ভোটের আওতার মধ্যে এবং

(খ) অন্যান্য ব্যয় যাহার জন্য সংবিধান অনুযায়ী পার্লামেণ্টের মঞ্জুরীর প্রয়োজন হয় না।

লোক সভা বা রাজ্যসভা কোন সভাতেই অর্থ অধিগ্রহণ বিলের সংশোধন করা যায় না। আরও লক্ষণীয় যে অর্থ অধিগ্রহণ বিল দ্বারা যে অর্থ পার্লামেণ্ট মঞ্জুর করে তাহার বাহিরে এক পয়সাও মন্ত্রীমণ্ডলী খরচ করিতে পারে না।

বিভাগীয় ব্যয় মঞ্জুরী দ্বারা সরকারকে অর্থ ব্যয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় না। উহার দ্বারা কেবল বলা হয় কি পরিমাণ অর্থ প্রতি বিভাগের জন্য পার্লামেণ্ট মঞ্জুর করিতে রাজি আছে। স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে ঐ মঞ্জুরী বলে কোন অর্থ ব্যয় করা চলে না। অর্থ অধিগ্রহণ বিল দ্বারাই ঐ ক্ষমতা প্রার্থনা করা হয়। অন্যান্য বিলের ন্যায় ঐ ধরনের বিলও সংসদের উভয় সভা কর্তৃক পাশ হওয়া প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে যদিও রাজ্যসভা ও লোকসভার ক্ষমতা একই প্রকার, অর্থ বিলের বিষয়ে রাজ্যসভার ক্ষমতা সীমিত। উভয় সভা বিলটি গ্রহণ করিলে এবং বিধিমত রাষ্ট্রপতি বিলটিতে সম্মতি দান করিলে বিল আইনে পরিণত হয় এবং সরকার এই আইন বলে মঞ্জুরীকৃত অর্থ ব্যয় করিবার অধিকারী হন।

অতিরিক্ত বাজেট (Supplementary Budget)

প্রায়ই দেখা যায় যে আর্থিক বৎসরের জন্য অর্থ অধিগ্রহণ আইন দ্বারা সংসদ যে অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছে, সরকারকে তাহা অপেক্ষা কোন কোন খাতে বেশী ব্যয় করিতে হইয়াছে। অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন দুইভাবে ঘটিতে পারে :

(ক) অকস্মাৎ জরুরী অবস্থার আবির্ভাবের জন্য সরকার মঞ্জুরী-অতিরিক্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইতে পারেন। যথা, বন্যা, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের দরুণ এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে।

(খ) কোন জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করিতে না হইলেও অন্য কোন কারণে ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব ওলট পালট হইয়া যাইতে পারে এবং এই অবস্থায় অতিরিক্ত খরচ হইতে পারে। অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে পার্লামেণ্টের শরণাপন্ন হইতে হয়। প্রথমত নূতন ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি উত্থাপন করিতে হয়। ঐ দাবি পার্লামেণ্ট মানিয়া লইলে নূতন অর্থ অধিগ্রহণ বিল (Supplementary Appropriation Bill) পেশ করিতে হয়। যে অতিরিক্ত অর্থ আবশ্যক সেই পরিমাণ অর্থই সরকার পার্লামেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। দুই সভা বিধিমত বিলটি পাশ করিলে এবং রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিলেই উহা আইনে পরিণত হয়।

জরুরী অনুদান (Emergency Grant)

জরুরী (Emergency) অবস্থায় এইরূপ অনুদান মঞ্জুর করা হয়। জাতি যখন যুদ্ধ-বিগ্রহের মত জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বেশী

পরিমাণে অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য যে এইরূপ অবস্থায় কোন্ খাতে কত ব্যয় হইতে পারে তাহা সঠিক অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। সেই জন্য জরুরী অবস্থায় মন্ত্রীমণ্ডলী সাধারণভাবে আনুমানিক ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি লোকসভায় উত্থাপন করে এবং উহা লোকসভা গ্রহণ করিলে মন্ত্রীসভা জরুরী অর্থ অধিগ্রহণ বিল পার্লামেণ্টের সম্মতির জন্য উত্থাপিত করিয়া থাকে।

বিশেষ অনুদান (Exceptional Grant)

বার্ষিক সাধারণ ব্যয়াদির বহির্ভূত কোন বিশেষ প্রয়োজনে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলীকে স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করিবার জন্য বিশেষ অনুদান মঞ্জুর করিতে পারে। এই স্থলেও অধিগ্রহণ বিল (Appropriation Bill) উত্থাপন করা আবশ্যক।

হিসাব সাপেক্ষে অর্থ অনুদান (Vote on Account)

পার্লামেণ্টের সংবিধানোক্ত আয়ুষ্কাল শেষ হইবার পর নূতন নির্বাচন হয় এবং নূতন মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি মন্ত্রীমণ্ডলী পার্লামেণ্টের পাঁচ বৎসর আয়ুষ্কাল শেষ হইবার পূর্বে পদত্যাগ করে এবং রাষ্ট্রপতি সংসদ ভাঙ্গিয়া দেন তাহা হইলে পাঁচ বৎসরের পূর্বেই নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নূতন নির্বাচনের পর নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হয়। উভয়ক্ষেত্রে এমন সময়ে নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠিত হইতে পারে যখন মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে বাজেট প্রস্তুত করিয়া ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদে পেশ করিবার সময় থাকে না। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট পেশ না করিতে পারিলে উপযুক্ত আলোচনান্তর পয়লা এপ্রিলের পূর্বে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অর্থ সম্বন্ধীয় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা সম্ভব হইয়া উঠে না। অথচ পয়লা এপ্রিল নূতন আর্থিক বৎসর শুরু হয়। এইরূপ অবস্থায় মন্ত্রীমণ্ডলী রাষ্ট্রপতির আনুষ্ঠানিক নির্দেশক্রমে পার্লামেণ্টের নিকট কয়েক মাসের জন্য সরকার চালাইবার উপযোগী আয়-ব্যয়ের একটি মোটামুটি হিসাব দাখিল করিয়া অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে। পরে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব সহ পূর্ণাঙ্গ বাজেট ও অন্যান্য আয়-ব্যয়ের দাবি মন্ত্রীসভা পেশ করিবে, এই প্রতিশ্রুতিতে পার্লামেণ্ট প্রথমোক্ত দাবি মঞ্জুর করিয়া থাকে।

হিসাব সাপেক্ষে দাবি মঞ্জুরীর প্রস্তাবাদি অর্থবিল সংক্রান্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী পার্লামেণ্ট আলোচনা করে এবং ঐ সম্বন্ধীয় বিধি অনুযায়ী

পাশ করিয়া দেয়। তাহার পর রাষ্ট্রপতির সম্মতি হইলে হিসাব সাপেক্ষে অনুদান বিল আইনে পরিণত হয়। অন্য কোন সঙ্গত কারণে যদি বাজেট অনুদান দাবি ও অর্থ অধিগ্রহণ আইন একত্রিশে মার্চের মধ্যে শেষ করা সম্ভব না হইয়া ওঠে, তাহা হইলেও হিসাব সাপেক্ষে অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা (Vote on Account) করা যাইতে পারে।

রাজস্ব বিল (Finance Bill)

বার্ষিক অর্থ অধিগ্রহণ আইন (Appropriation Act) দ্বারাই অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা চক্রের সমাপ্তি ঘটেনা। বার্ষিক রাজস্ব বিল (Finance Bill) নামক একটি বিলও আলোচনার পর পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিমত আইনে পরিণত করিতে হয়। রাজস্ব বিল দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডলী কয়েক ধরনের প্রস্তাব করিতে পারে:

(ক) নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব;

(খ) স্থায়ী আইন অনুযায়ী যে সকল কর ধার্য আছে তাহার পরিবর্তন;

(গ) দ্বিতীয় প্রকারের কোন কর রহিত করা।

এইস্থলে প্রধান করসমূহ উল্লেখ করা হইতেছে, যথা আয়কর (Income Tax), বাণিজ্য শুল্ক (Custom Duty), আভ্যন্তরীণ শুল্ক (Excise Duties) প্রভৃতি। ইহা ছাড়া পোষ্ট, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন বাবদ সরকারী আয়ও উল্লেখযোগ্য। অর্থ অধিগ্রহণ আইনদ্বারা পার্লামেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলীকে সরকার পরিচালনার ব্যয় মঞ্জুর করে; রাজস্ব বিলে কিরূপে সেই অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে তাহাই নির্দেশ করা হয়। রাজস্ব বিল আইনে পরিণত হইলে বার্ষিক অর্থ ব্যবস্থা-চক্রের সমাপ্তি ঘটে।

সরকারী আয় ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ

সংবিধানে সরকারী আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ব্যতীত লোকসভা ঐ বিষয় সম্বন্ধে আভ্যন্তরীণ নিয়মকানুন প্রণয়ন করিয়া আয় ব্যয়ের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

প্রথমতঃ, আয় ব্যয়ের জন্য মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভার নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কোন অর্থই ব্যয়িত হইতে পারে না। বাজেট, অনুদান দাবি, অর্থ অধিগ্রহণ আইন, রাজস্ব আইন—অর্থ ব্যবস্থার এই চার স্তরের প্রতি স্তরে পার্লামেণ্ট, বিশেষত লোকসভা মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ পায়। অর্থ বিলের উপর ভোটে মন্ত্রীমণ্ডলী লোকসভায় পরাজিত হইলে মন্ত্রীমণ্ডলী পদত্যাগ করিতে বাধ্য।

কোন করই পার্লামেণ্টের অনুমতি ব্যতীত ধার্য করা যায় না। কোন অর্থই পার্লামেণ্টের মঞ্জুরীকৃত আইনের নির্দেশ ব্যতীত ব্যয় করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, সরকারের খরচের উপর কড়া নজর রাখিবার জন্য সংবিধান একজন নিরপেক্ষ উচ্চপদস্থ বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। তিনি হইতেছেন ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General)।

পার্লামেণ্ট যে উদ্দেশ্যে যত পরিমাণ অর্থ মঞ্জুর করে তাহা ঠিক সেই মঞ্জুরি অনুযায়ী পার্লামেণ্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট বিভাগ দ্বারা নির্দিষ্ট খাতে ব্যয় হইতেছে কিনা, পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁহার প্রধান কার্য। ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক এই বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করেন। রাষ্ট্রপতি ঐ রিপোর্ট পার্লামেণ্টের দুইকক্ষে প্রেরণ করেন। এই রিপোর্ট পার্লামেণ্টের সরকারী হিসাব কমিটির (Public Accounts Committee) নিকট আলোচনার জন্য প্রেরণ করা হয়। সরকারী হিসাব কমিটি আলোচনান্তর তাহাদের মন্তব্য রিপোর্ট আকারে প্রস্তুত করেন। এই রিপোর্ট পার্লামেণ্টে আলোচনা হয় এবং এই আলোচনার মাধ্যমে আয়-ব্যয় সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার সুযোগ ঘটে।[1]

ইহা ব্যতীত পার্লামেণ্টের আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimate Committee) ভারত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে যে পরিমান অর্থ পার্লামেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমীক্ষা করিয়া একটি রিপোর্টও প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই রিপোর্টও পার্লামেণ্টে আলোচিত হয়। ইহাও পার্লামেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার আর একটি উপায়।[2]

পার্লামেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

অর্থ মঞ্জুরী সংক্রান্ত উপরোক্ত উপায়গুলি ছাড়া পার্লামেণ্ট সদস্যগণের হস্তে, ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীমণ্ডলীকে সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণের আরও কয়েকটি রাজনৈতিক হাতিয়ার আছে। সেই সমস্ত উপায়গুলি অর্থ বিষয়ে ও মন্ত্রী-

1 এই সূত্রে উনবিংশ অধ্যায়ের 'সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

2 এই সূত্রে উনবিংশ অধ্যায়ের 'আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি' শীর্ষক আলোচনা দ্রষ্টব্য।

মণ্ডলীকে সাধারণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার কাজে লাগানো যাইতে পারে। এই উপায়গুলি হইতেছে : (1) অনাস্থা প্রস্তাব ; (2) মুলতুবী প্রস্তাব ; (3) পার্লামেণ্টে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিতর্ক ; (4) প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ; (5) অনুসন্ধান কমিশন বা কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব ও তাহার রিপোর্টের উপর বিতর্ক ; (6) দৃষ্টি আকর্ষনী নোটীশ দ্বারা কোন বিষয় উত্থাপন ; (7) সরকারী নীতি বিষয়ক প্রস্তাবের উপর বিতর্ক ; বার্ষিক বাজেট অধিবেশনের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতির (বস্তুতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীর) সরকারী নীতি বিষয়ক ভাষণের উপর বিতর্ক প্রভৃতি। এই বিষয়ে পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়

পার্লামেণ্টের কমিটি ব্যবস্থা

কমিটি ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ঃ আধুনিক কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের ভূমিকা ব্যাপক ও জটিল। শুধু রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নহে, আধুনিক রাষ্ট্র সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নাগরিকগণের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। জাতির প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান পার্লামেন্টকেই এই গুরু দায়িত্ব প্রধানতঃ বহন করিতে হয়। এই কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিতে হইলে নানাবিধ আইনের শুধু নীতি নহে, সেই সমস্ত আইনের নানা দিক সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। প্রস্তাবিত আইন কার্যে পরিণত হইলে কি কি সুবিধা অসুবিধা হইতে পারে এবং কিরূপে আইন প্রণয়ন দ্বারা তাহা লাভ করা যায়, সেই সকল বিষয়ও বিস্তারিত ভাবে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক হয়। দ্বিতীয়তঃ, আইন-প্রণয়ন ব্যতীত কোন বিষয়ে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং মন্ত্রী-মণ্ডলীর কার্যাবলীর সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রিত করাও পার্লামেণ্টের কর্তব্যের অন্তর্গত। তৃতীয়তঃ, পার্লামেণ্টের ও সদস্যগণেয় অধিকার এবং পার্লামেন্টের কার্য পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়েও নানাবিধ নিয়মাবলী প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে (ক) আইন প্রণয়ন, (খ) মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলীর পরীক্ষা ; ও (গ) লোকসভার অধিকার ও আভ্যন্তরীণ কার্যাবলী পরিচালনের জন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থা—এই তিন প্রকারের কাজ লোকসভাকে সম্পন্ন করিতে হয় ; এই সমস্ত বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য অল্পসংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট কমিটির প্রয়োজন হয়। এই সকল কর্তব্য সুসম্পন্ন করিবার দায়িত্ব মূলতঃ পালামেন্টের উপরই রহিয়াছে। কিন্তু লোকসভার বা রাজ্য-সভার ন্যায় অথবা ব্রিটেনের কমন্স্ সভার ন্যায় বৃহৎ সভার পক্ষে এই কাজ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ বৃহৎ সভায় সাধারণ আলোচনা চলে ; কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। এইজন্য বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্রে কমিটি প্রথার উদ্ভব হইয়াছে।

কমিটিগুলি হয় একটি সভার সদস্যগণকে লইয়া অথবা উভয় সভার সদস্যগণকে লইয়া গঠিত হইতে পারে। দ্বিতীয় ধরনের কমিটিকে যুক্ত কমিটি বলা হয়। কমিটির সদস্যসংখ্যা পার্লামেণ্টের উপর নির্ভর করে।

প্রতি কমিটির সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার উহার সভাপতি নিয়োগ করিয়া থাকেন। কমিটিতে সাধারণতঃ এবং যথাসম্ভব সকল দলের প্রতিনিধিদের আনুপাতিকভাবে স্থান দেওয়া হয়। কমিটিগুলিকে অন্যভাবে শ্রেণী বিভাগ করা আবশ্যক। কতকগুলি কমিটি স্থায়ী (Standing Committees), আর কতকগুলি অস্থায়ী (Ad hoc Committee)। অস্থায়ী কমিটিগুলি নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত হয় এবং সেই কাজ সম্পন্ন হইলে উহার আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া যায়। কোন বিশেষ আইন বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও রিপোর্ট দেওয়ার জন্য যে কমিটি নিযুক্ত হয় তাহা অস্থায়ী কমিটি। স্থায়ী কমিটি নির্দিষ্ট কালের জন্য, সাধারণতঃ একবৎসরের জন্য, নিযুক্ত হইয়া থাকে। সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি এবং আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি স্থায়ী কমিটির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

স্থায়ী কমিটি সমূহ

(1) সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি (Public Accounts Committee)

লোকসভার সরকারী হিসাব কমিটি আর একটি প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে পার্লামেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলীর অর্থব্যয় প্রভৃতির উপর তদারকি করিবার সুযোগ পায়। লোকসভার আভ্যন্তরীণ নিয়মাবলী অনুযায়ী এই কমিটি নিযুক্ত হয়। লোকসভার 15 জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটি লোকসভা কর্তৃক প্রতি-বৎসর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব মূলক নিয়মানুসারে নির্বাচিত হয়। রাজ্য-সভার 7 জন সদস্য ঐ সভা হইতে একই নিয়মে নির্বাচিত হইয়া লোক-সভার এই কমিটিতে সহযোগী সদস্যরূপে যোগ দেন। অর্থ আয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার ভূমিকা সীমিত বলিয়াই রাজ্যসভাকে লোকসভার এই কমিটিতে সমমর্যাদা দেওয়া হয় নাই। প্রথানুযায়ী কমিটিতে নির্বাচিত বিরোধীপক্ষীয় সদস্যগণের মধ্য হইতে কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। স্পীকার এই মনোনয়ন দিয়া থাকেন। সরকারী হিসাব কমিটি অর্থ-অধিগ্রহণ আইন (Appropriation Act), অর্থ সম্বন্ধীয় অন্যান্য আইন, এবং অর্থব্যয় সংক্রান্ত অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের বিবরণ পুঙ্খানু-পুঙ্খভাবে পরীক্ষা করিয়া লোকসভার নিকট নিজ রিপোর্ট পেশ করে। সরকারী হিসাব পরীক্ষককমিটির কার্যাবলী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করিয়া সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া থাকে, যথা : পার্লামেণ্ট যে বিভাগকে অর্থমঞ্জুর করিয়াছে, তাহা ভারতের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল হইতে সংশিষ্ট

ভারপ্রাপ্ত অধিকারিকেরা সরকারী কাজে খরচ করিবার উদ্দেশ্যে, পার্লামেণ্টের মঞ্জুরি অনুযায়ী তুলিয়াছেন কি না ; দ্বিতীয়তঃ, মঞ্জুরীকৃত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে কিনা এবং হইয়া থাকিলে তাহার সঙ্গত কারণ আছে কি না, তৃতীয়তঃ, যে উদ্দেশ্যে অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে সেই উদ্দেশ্যেই কি অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে ? চতুর্থতঃ, বিভিন্ন বিভাগ কি অর্থের অপচয় অথবা প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করিয়াছে ? সরকারী হিসাব কমিটির অধিবেশনে বিভিন্ন বিভাগের সচিবগণ আসিয়া তাহাদের বিভাগগুলি সম্বন্ধে সরকারী হিসাব কমিটির প্রশ্নাদির উত্তর দিতে বাধ্য থাকেন। এই কমিটির অধিবেশনে অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের অধীনস্থ বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকিয়া কমিটিকে সাহায্য করেন।

সরকারী আয় ব্যয় সম্বন্ধে অর্থ নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক কর্তৃক প্রস্তুত প্রতি বিভাগের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় বিস্তারিত বিবরণী লোকসভার হিসাব পরীক্ষা কমিটির কার্য সম্পাদনে সাহায্য করিয়া থাকে। ঐ রিপোর্ট পার্লামেণ্টের সকল সদস্যগণকেও দেওয়া হইয়া থাকে। সরকারী হিসাব কমিটির বিবরণী পার্লামেণ্টে নিয়মিতভাবে দাখিল করা হয় এবং পার্লামেণ্টে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। যদি কমিটির রিপোর্টে কোন বিভাগ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকে তাহা হইলে বিরোধী সদস্যগণ ঐ সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া থাকেন। এইরূপে পার্লামেণ্ট ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ ও বিষয়টির জটিলতার দরুণ এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সকলক্ষেত্রে কার্যকর হইয়া উঠিতে পারে না। তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে পার্লামেণ্টে সদস্যগণের সমালোচনার সুযোগ রহিয়াছে এবং এই সুযোগ যে ব্যবহৃত হয় না তাহাও নহে। এইজন্য বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীগণ লোকসভার সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটিকে সমীহ করিয়া চলেন এবং ঐ কমিটির রিপোর্টে যদি কোন বিভাগ সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য থাকে তাহা হইলে ঐ বিভাগীয় মন্ত্রীকে পার্লামেণ্টের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। এই সম্পর্কে আরও একটা কথা স্মরণ করা প্রয়োজন এই যে এই কমিটির বিরোধী, সরকারপক্ষীয় ও নির্দলীয় সকল সদস্যগণই নিরপেক্ষভাবেই বিচার বিবেচনা করেন। তাহাদের নিকট কোন দলীয় ফতোয়া (whip) দেওয়াও হয় না।

অতীত বৎসরের ব্যয় সম্বন্ধে সরকারী হিসাব কমিটি বিচার বিবেচনা করিয়া থাকে। এইজন্য হিসাবকমিটির কার্যাবলী post mortem পরীক্ষা বা শবব্যবচ্ছেদের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করে। ব্যয়

সংক্রান্ত ত্রুটি বিচ্যুতি দেখাইয়া কমিটি পার্লামেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমালোচনার খোরাক যোগায়। দ্বিতীয়তঃ, কমিটি পরোক্ষভাবে কোন বিশেষ বিভাগকে সতর্ক করিয়া দেয় যেন ভবিষ্যতে অনুরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি না ঘটে। সর্বশেষে স্মরণীয় যে ব্যয় সম্বন্ধে গঠনমূলক প্রস্তাবও এই কমিটি পার্লামেণ্টের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটি তাহাদের রিপোর্টে কেবলমাত্র অতীত বর্ষের কার্যাবলীর সমালোচনা মূলক মন্তব্য করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না।

এই সম্পর্কে সর্বশেষে লক্ষণীয় যে হিসাব পরীক্ষা কমিটির সভাপতি ঐ কমিটির লোকসভার বেসরকারী সদস্যগণের মধ্য হইতে স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। সরকারের নির্ভীক সমালোচনা অব্যাহত রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই নিয়মটি ভারতীয় পার্লামেণ্ট ব্রিটিশ হাউস অফ্ কমন্সের Public Account Committec-র প্রথা হইতে গ্রহণ করিয়াছে।

(2) আনুমানিক ব্যয় পরীক্ষা কমিটি (Estimates Committee)

সরকারী হিসাব কমিটি অর্থ ব্যয় হইয়া যাইবার পর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখে পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থ ব্যয় হইয়াছে কি না। কিন্তু অনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি চলতি আর্থিক বৎসরের ব্যয় সম্বন্ধে গঠন মূলক সমালোচনা করে। সরকার সাধারণতঃ আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী অর্থের অনুদান দাবি করে এবং পার্লামেণ্ট তাহা মঞ্জুর করে। কিন্তু যে পরিমাণ অর্থ দাবি করা হইয়াছিল তাহার প্রয়োজন নাও হইতে পারে। যাহাতে ব্যয়ের খাতে কোন অপচয় না ঘটে এবং যে ভাবে ব্যয় সংক্ষেপ হইতে পারে তাহাই নির্দেশ করা এই কমিটির প্রধান কাজ। ইহা ব্যতীত কমিটি যদি মনে করে যে কোন বিভাগের সাংগঠনিক উন্নতি সাধনদ্বারা বিভাগীয় ব্যয় নির্বাহ দক্ষতা (Financial Administration) বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে কমিটি বিভাগীয় সংগঠন পদ্ধতির সংস্কারেরও প্রস্তাব করিতে পারে। কমিটি কোন বিভাগীয় অর্থব্যবস্থা সম্বন্ধে অথবা কি ভাবে অর্থ অনুদানের দাবি পার্লামেণ্টে পেশ করা উচিত, সেই বিষয়ে বিকল্প নীতি সুপারিশ করিতেও পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে চলতি বাজেট বৎসরে বিভিন্ন বিভাগ কিরূপে অর্থব্যয় করিতেছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া আপন মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা কমিটিকে দেওয়া হইয়াছে।

এই বিষয়ে যেমন যেমন কাজ হইতেছে সেই অনুযায়ী কিংবা

বর্ষশেষে তাহারা রিপোর্ট দিতে পারেন। এই রিপোর্ট সমূহ পার্লামেণ্টে দাখিল করা হয়, পৃথক ভাবে আলোচিত হয় না। তবে সদস্যগণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া সরকারের সমালোচনা করিতে পারেন। এই কমিটিতে বাজেট বৎসরের জন্য অর্থাৎ এক বৎসরের জন্য সমানুপাতিক ভোটের ভিত্তিতে সদস্যগণ নির্বাচিত হন। 30 জন সদস্যের মধ্যে 20 জন লোকসভার এবং 10 জন রাজ্যসভার। রাজ্যসভার সদস্যগণ সহযোগী সদস্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন। কমিটির সভাপতি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। এই কমিটির কার্যাবলী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। করদাতাগণের অর্থ সুষ্ঠভাবে পার্লামেণ্টের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় হইতেছে কি না তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কমিটি তদারকি করে এবং যথোপযুক্ত সুপারিশ করিয়া থাকে। এইজন্য নির্বাচিত সদস্যগণের সরকারী ব্যয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই কারণে প্রতি বৎসর কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ অবসর গ্রহণ করেন। দুই-তৃতীয়াংশ পুরাতন সদস্য কমিটিতে থাকিয়া যান। এইভাবে এই কমিটিতে অভিজ্ঞতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

(3) কার্যপরিচালনা সংক্রান্ত পরামর্শদাতা কমিটি (Business Advisory Committee)

লোকসভার প্রতি অধিবেশনের প্রারম্ভে এই কমিটি নিযুক্ত হইয়া থাকে। কমিটির সদস্য সংখ্যা 15। সকলেই স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। সাধারণতঃ, বিভিন্ন দলের নেতৃস্থানীয় সদস্যগণকে এই কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়। স্পীকারই এই কমিটির সভাপতি। লোকসভার কার্যাবলী যাহাতে সহজে, দক্ষতা সহকারে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই ব্যবস্থা করাই এই কমিটির লক্ষ্য। লোকসভার কার্যসূচী এই কমিটিই নিয়ন্ত্রিত করে। লোকসভায় ক্ষমতাশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ও অন্যান্য দলের নেতৃবর্গ এই কমিটির সহিত সহযোগিতা করিয়া থাকেন। নূতন কমিটি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই কমিটি কাজ করিয়া চলে।

(4) বেসরকারী বিল ও প্রস্তাব কমিটি (Committee on Private Member's Bills and Resolution)

এই কমিটির সদস্যসংখ্যা 15। ইহার আয়ুষ্কাল এক বৎসর। সদস্যগণ স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হন। বেসরকারী বিলগুলি পরীক্ষা করিয়া

দেখা, বিলগুলির গুরুত্বপূর্ণ কি গুরুত্বপূর্ণ নহে, জরুরী বা জরুরী নহে—এইরূপে শ্রেণী বিভাগ করা ; আইনগতভাবে বিলটির কোন ধারা লোকসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতার বহির্ভূত কিনা বিচার করা এবং কত সময় বেসরকারী বিলের আলোচনার জন্য দেওয়া যাইতে পারে প্রভৃতি বিষয় এই কমিটি বিবেচনা করিয়া স্থির করে। লোকসভায় বেসরকারী প্রস্তাব আলোচনার জন্যও এই কমিটি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

(5) **আবেদন সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Petitions)**

15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সভাপতি তিনিই মনোনীত করেন। ভারতীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের যে কোন বিল বা জনস্বার্থসম্পর্কিত বিষয় সম্বন্ধে লোকসভার নিকট আবেদন করিবার অধিকার আছে। এই সকল আবেদন, আবেদন-সংক্রান্ত কমিটিতে রিপোর্টের জন্য প্রেরিত হয়। নূতন কমিটি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুরাতন কমিটি কাজ করিয়া চলে।

(6) **নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (Rules Committee)**

15 জন সদস্য বিশিষ্ট স্পীকার কর্তৃক মনোনীত এই কমিটির সভাপতি স্বয়ং স্পীকার। লোকসভার কার্যাবলীর নিয়মাদির কোন পরিবর্তন প্রয়োজন কি না ; প্রয়োজন হইলে, কি পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এই সকল বিষয়ে নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি লোকসভার নিকট সুপারিশ করিতে পারে।

(7) **সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Public Undertakings)**

1963 সালে নভেম্বর মাসে লোকসভার প্রস্তাব দ্বারা এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু 1964 সালে এই কমিটি প্রথম গঠিত হয় ও কাজ আরম্ভ করে। দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স্ কর্পোরেশন, এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশান্যাল, অয়েল এণ্ড ন্যাচারল গ্যাস কমিশন এবং অন্যান্য সমস্ত সরকারী ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলি এই কমিটির সমীক্ষার অন্তর্গত। কমিটি নিম্নলিখিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে: (ক) সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধীয় সকল প্রকার রিপোর্ট ও হিসাব পরীক্ষা ; (খ) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে যদি অর্থনিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষকের কোন রিপোর্ট থাকে তাহা বিবেচনা করা ; (গ) সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনাগত স্বাধীনতা মানিয়া লইয়া, কমিটির বিচার করিয়া দেখিতে হয়

প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ের নীতি অনুযায়ী দক্ষতার সহিত পরিচালিত হইতেছে কি না ; (ঘ) লোকসভার স্পীকার ইচ্ছা করিলে সরকারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে, সরকারী হিসাব কমিটি বা আনুমানিক অর্থ-ব্যয় কমিটির হস্তে যে কর্তব্য ন্যস্ত আছে, তাহার কিয়দংশ এই কমিটিকে বিচার করিয়া দেখিবার নির্দেশ দিতে পারেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সরকারী ব্যবসা পরিচালনা সম্বন্ধে সরকারী নীতি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন কার্যাবলী এই কমিটির পরীক্ষার অন্তর্গত নহে। সরকারী ব্যবসা আজকাল নানাদিকে বিস্তৃত হইতেছে এবং হইবে। এইরূপ অবস্থায় এই কমিটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। এইজন্য সতর্কতার সহিত এই কমিটির গঠন ব্যবস্থা স্থির করা হইয়াছে। প্রতি বৎসর কমিটির এক পঞ্চমাংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। যাঁহারা সর্বাপেক্ষা পুরাতন তাঁহারাই বিদায় লইয়া থাকেন। এইরূপে কমিটি গঠন পদ্ধতির মধ্যে অভিজ্ঞতা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—দুই-এরই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(8) স্বাধিকার সংক্রান্ত কমিটি (Committee of Privileges)

লোকসভার অধিবেশনের প্রারম্ভে 15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক মনোনীত হয়। পার্লামেণ্টের ও সদস্যগণের স্বাধিকার রক্ষা সম্বন্ধে এই কমিটি বিচার বিবেচনা করিয়া সুপারিশ করিয়া থাকে এবং তারপর পার্লামেণ্ট ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(9) সদস্যগণের লোকসভার অধিবেশনে অনুপস্থিতি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Absence of Members from the Sittings of the House)

15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি স্পীকার কর্তৃক এক বৎসরের জন্য মনোনীত হয়। 60 বা ততোধিক দিন সদস্য অনুপস্থিত থাকিলে তাহাকে স্পীকারের নিকট দরখাস্ত করিতে হয় এই মর্মে, যে স্পীকার যেন তাহার অনুপস্থিতি মার্জনা করেন। এইরূপ অবস্থায় ঐ সদস্যের আসনটি শূন্য হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইবে কি না, অথবা তাহাকে ছুটি মঞ্জুর করা হইবে—এই সকল প্রশ্ন বিচার বিবেচনা করিয়া সংসদে রিপোর্ট দাখিল করা এই কমিটির কাজ।

(10) সরকারী প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কমিটি (Committee on Government Assurances)

15 জন সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি এক বৎসরের জন্য স্পীকার

কর্তৃক মনোনীত হয়। মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইতে পারে না। সরকার পক্ষ যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা যথাযথ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে পালিত হইয়াছে কি না বিচার বিবেচনা করিয়া এই কমিটি পার্লামেণ্টের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিয়া থাকে এবং তদনন্তর পার্লামেণ্ট এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লক্ষণীয় যে বিলাতের পার্লামেণ্টে এইরূপ কমিটি নাই।

(11) বিভাগীয় আইন প্রণয়ন পরীক্ষা কমিটি (Committee on Subordinate Legislation)

পার্লামেণ্ট কৃত আইনদ্বারা অথবা সংবিধানের বিধান অনুযায়ী ক্ষমতা-প্রাপ্ত কোন মন্ত্রীর বিভাগ বা সরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা আধিকারিক যে নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়াছে তাহা যথাযথভাবে প্রস্তুত হইয়াছে কি না, এবং ঐ নিয়মাবলী প্রণয়নে পার্লামেণ্ট প্রদত্ত ক্ষমতা হইতে কোন অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করা হইয়াছে কি না, প্রভৃতি বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করিয়া পার্লামেণ্টে রিপোর্ট পেশ করা এই কমিটির কর্তব্য। এই কমিটির 15 জন সদস্যও স্পীকার কর্তৃক এক বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। মন্ত্রীগণ এই কমিটির সদস্য হইতে পারেন না। স্পীকার এই কমিটির বিরোধী দলীয় কোন নেতাকে সভাপতি নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই ব্যবস্থাও সমীচীন হইয়াছে। কারণ সরকারপক্ষের সদস্য সভাপতি হইলে তাহার পক্ষে নিরপেক্ষভাবে সর্বদা সমালোচনা ও সতর্কতার চক্ষু জাগ্রত রাখা সম্ভব না হইতেও পারে।

এই প্রসঙ্গে বিভাগীয় আইন প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনা অপরিহার্য। আধুনিক সকল রাষ্ট্রই কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রের কল্যাণকামী ভূমিকা আছে। এই জন্য নানা প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রের উপর বর্তিয়াছে। নাগরিকগণের আর্থিক উন্নতি, সামাজিক নিরাপত্তা; রাষ্ট্রীয় শিল্প পরিচালন ব্যবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ও চাকুরীর ব্যবস্থা প্রভৃতি অগণিত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু এইরূপ নানা ধরনের আইনের খুঁটিনাটি পার্লামেণ্ট কর্তৃক সুষ্ঠুভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব নহে। কারণ আইন প্রণয়ন ব্যতীত নানা কার্য পার্লামেণ্টের সম্পন্ন করিতে হয়। দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে পথনির্দেশ, রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার উপর তীব্র দৃষ্টি রাখা, মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক নীতি প্রভৃতি বিষয়ে

পার্লামেণ্টের গুরুতর কর্তব্য রহিয়াছে। এইজন্য খুটিনাটি বিষয়ে নজর দেওয়া এবং তদনুযায়ী বিস্তারিতভাবে আইন প্রণয়ন পার্লামেণ্টের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না। ইহা ব্যতীত উপরে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্যগণের বিস্তারিত জ্ঞানও থাকে না, থাকা সম্ভবও নহে। এই কারণে আধুনিক রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট সমূহ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের, অর্থাৎ বিশেষ বিভাগের উপর ঐ সকল বিষয়ে নিয়মাবলী (Rules and Regulations) প্রণয়ন করিবার ভার দিয়া থাকে। দেখা গিয়াছে যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভাগীয় নিয়মাবলী গুরুত্ব অপরিসীম কারণ ঐ সকল নিয়মাবলী আইনের মতই কার্যকর হইয়া থাকে। নিয়মাবলী প্রণয়নের মধ্য দিয়া যে ক্ষমতা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে তাহা আইন প্রণয়নের ক্ষমতার তুল্য। কিন্তু সাধারণতঃ আইন প্রণয়ন পার্লামেণ্টেরই কাজ। অর্থাৎ যে ক্ষমতা পার্লামেণ্টের ব্যবহার করা উচিত তাহা কার্যত সরকারের একটি বিভাগ ব্যবহার করিতেছে। এই জন্য নিয়মাবলী সমূহের বিচার বিবেচনা অত্যাবশ্যক। ব্রিটেনের একজন ভূতপূর্ব লর্ড চ্যান্সেলর, লর্ড হিউয়ার্ট বিভাগীয় আইন প্রণয়নকে 'New Despotism' অর্থাৎ নূতন স্বৈরতন্ত্র আখ্যা দিয়াছেন। ভারতীয় পার্লামেণ্ট এই কারণ বিভাগীয় আইন প্রণয়ন নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিভাগীয় আইন প্রণয়ন পরীক্ষা কমিটি নামক কমিটি নিযুক্ত করিয়াছে। কমিটির রিপোর্ট পার্লামেণ্টে পেশ করিতে হয় এবং তদনন্তর বিভাগীয় আইন প্রণয়নে ত্রুটি বিচ্যুতি আলোচিত হয় এবং প্রয়োজনানুসারে তাহা সংশোধিত হইয়া থাকে।

অস্থায়ী কমিটি

(1) বিল সংক্রান্ত সিলেক্ট কমিটি (Select Committee on Bills)

লোকসভায় কোন বিল সম্বন্ধে যদি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে বিলটি লোকসভার সিলেক্ট কমিটিতে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠানো হউক তাহা হইলে এইরূপ কমিটি নিযুক্ত হয়। কমিটির সদস্যগণের নাম বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা উত্থাপক সদস্য উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে সকলেই লোকসভা দ্বারাই নির্বাচিত হইয়া থাকেন। স্পীকার সদস্যগণের মধ্য হইতে সিলেক্ট কমিটির সভাপতি মনোনীত করেন। মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হইলে তিনিই সাধারণতঃ স্পীকার কর্তৃক কমিটীর সভাপতি নিযুক্ত হন। সিলেক্ট কমিটি বিলের বিভিন্ন ধারার প্রয়োজন অনুযায়ী কোন বিশেষজ্ঞ বা কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে সাক্ষী হিসাবে কমিটিতে আহ্বান করিতে পারে। কোন

প্রয়োজনীয় দলিল দস্তাবেজও ইহারা তলব করিতে পারে। লোকসভা কর্তৃক পূর্ব-নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কমিটির সভাপতি কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় উপস্থাপিত করেন। যে কোন বিল লোকসভার সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠাইয়া যুক্ত কমিটিতে (Joint Select Comm ttee) প্রেরণ করা যাইতে পারে। বেসরকারী উত্থাপক যুক্ত কমিটিতে উভয় সভার সদস্য স্থান পাইয়া থাকেন। প্রায়শঃ যুক্ত কমিটির দুই তৃতীয়াংশ লোকসভা হইতে এবং এক তৃতীয়াংশ রাজ্যসভা হইতে নির্বাচিত হন।

(2) অনুসন্ধান কমিটি (Committee of Enquiry)

লোকসভায় বা রাজ্যসভায় বা উভয়কক্ষে গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইতে পারে। রিপোর্ট দিবার পর কমিটির কাজ সমাপ্ত হইয়া যায়। কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট পার্লামেণ্টের উভয় সভায় বা কোন একটি সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু হইতে পারে। বিরোধী পক্ষ রিপোর্টে উদ্‌ঘাটিত তথ্য অবলম্বন করিয়া সরকারপক্ষকে সমালোচনা করিতে পারে। যে সকল পন্থায় পার্লামেণ্ট মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিয়ন্ত্রণ করে, কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব তাহার অন্যতম। কিন্তু ঐ ধরনের প্রস্তাব লোকসভায় গৃহীত হয় না, যদি না সরকারপক্ষ উহা সমর্থন করে। উহাদের বিরোধিতা থাকিলে কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব পাশ না হওয়ারই সম্ভাবনা, কারণ সরকার পক্ষে সর্বদা লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে। অনেক সময় সরকারপক্ষ হইতেই প্রস্তাব আসে, তাহা হইলে প্রস্তাব পাশ হইয়া যায় এবং কমিটি যথারীতি কাজ করে।

রাজ্যসভার কমিটি ব্যবস্থা

লোকসভার কমিটি অপেক্ষা রাজ্যসভার কমিটি সংখ্যা অনেক কম। তবে ঐ সভাতেও কয়েকটি কমিটি রহিয়াছে এবং ঐ কমিটিগুলির গঠন পদ্ধতি লোকসভার কমিটিগুলির মত। নিয়মাবলী সংক্রান্ত কমিটি (Rules Committee), কার্যপরিচালনা বিষয়ক পরামর্শদাতা কমিটি (Business Advisory Committee), অধিকার সম্বন্ধীয় কমিটি (Privileges Committee), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বিংশ অধ্যায়

রাজ্যসমূহের শাসন বিভাগ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চল লইয়া গঠিত। ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ন্যায় প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া সুনির্দিষ্ট শাসনতন্ত্র বিদ্যমান। রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ইউনিয়ন সরকারের শাসনব্যবস্থার অনুরূপ। কেন্দ্রে যেমন প্রশাসনিক বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ রহিয়াছে, রাজ্যেও সেইরূপ বিভিন্ন বিভাগ রহিয়াছে।

রাজ্যপাল: রাজ্যের প্রশাসনিক বিভাগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন রাজ্যপাল। একমাত্র ভারতীয় নাগরিকগণই রাজ্যপাল নিযুক্ত হইতে পারেন। তিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। রাজ্যপালের বয়স অন্ততঃ 35 বৎসর হওয়া আবশ্যক। যদিও তাহার কার্যকাল 5 বৎসর তথাপি তাহার কার্যকাল শেষ হইলেও যতদিন পর্যন্ত তাহার পরবর্তী রাজ্যপাল নিযুক্ত না হন, সেই পর্যন্ত তিনি রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাজ্যপালের কার্যকালে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা চলে না অথবা কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা তাঁহার বিরুদ্ধে দায়ের করা যায় না। রাজ্যপাল হিসাবে তাহার কাজকর্মের জন্য তাঁহাকে কোন বিচারালয়ে জবাবদিহিও করিতে হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাহাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তিনি স্বেচ্ছায় ইস্তফাও দিতে পারেন।

রাজ্যপাল অন্য কোন 'লাভজনক পদ' (Office of Profit) গ্রহণ করিতে পারেন না। তিনি কেন্দ্রীয় বা যে কোন রাজ্যের আইন সভার সদস্যও থাকিতে পারেন না। যদি রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হইবার পূর্বে তিনি কোন আইন সভার সদস্য থাকেন, তাহা হইলে তিনি যেদিন হইতে রাজ্যপালের পদ গ্রহণ করেন, সেই দিনই তাহার আইন সভার সদস্যপদ শেষ হইয়া যায়। রাজ্যপালের কার্যকালে তাহার বেতন, ভাতা প্রভৃতি হ্রাস করা চলে না। রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund of the State) হইতে তাহার বেতন, ভাতা প্রভৃতি দেওয়া হইয়া থাকে। এইজন্য বিধানমণ্ডলীর বাৎসরিক ভোটের প্রয়োজন হয় না। তিনি বিনা ভাড়ায় সরকারী ভবনে থাকিবার অধিকারী। তিনি 5,500 টাকা বেতন পাইয়া থাকেন। একই ব্যক্তি একাধিক রাজ্যের রাজ্যপাল

নিযুক্ত হইতে পারেন। রাজ্যপাল পদে অভিষিক্ত হইবার সময় রাজ্যপালকে রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করিতে হয় যে তিনি ভারতীয় সংবিধান সর্বতোভাবে রক্ষা করিবেন।

রাজ্যপালের নিয়োগ ব্যবস্থা

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হন। সংবিধান পরিষদে এই বিষয়টি লইয়া মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকের মত ছিল যে নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যপালকে নিযুক্ত করা উচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনোনয়ন প্রথাই গৃহীত হয়। সংবিধান পরিষদে রাজ্যপাল নিয়োগ সম্পর্কে চারটি বিকল্প প্রথা আলোচিত হইয়াছিল। (1) জনসাধারণের ভোটে নির্বাচন ; (2) রাজ্যের বিধানসভা অথবা বিধানসভা ও বিধান পরিষদ, উভয়সভা কর্তৃক নির্বাচন ; (3) রাজ্যের নিম্নতম সভা কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি নামের মধ্যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজনকে মনোনয়ন ; (4) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়ন। যে সকল যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া এই শেষোক্ত প্রথা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, বলা হয় যে যদি রাজ্যপাল জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে তিনি জনপ্রতিনিধিত্ব দাবি করিয়া মন্ত্রীমণ্ডলীর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে পারিতেন। এইরূপ অবস্থায় রাজ্যপাল ও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত উপস্থিত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপালকে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ চালাইয়া যাইতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল যদি বিধানমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন, তাহা হইলে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন এবং তাহাদেরই ইচ্ছানুযায়ী চলিতে বাধ্য হইতেন। এই অবস্থায় তাহার নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। সংবিধানে রাজ্যপালকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজ্যপাল যদি বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন তাহা হইলে সংবিধানের এই উদ্দেশ্য মিথ্যায় পরিণত হইত। তৃতীয়তঃ, বিধানসভা কর্তৃক প্রেরিত কয়েকটি নামের মধ্য হইতে যদি রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে বাছিয়া লইতেন তাহা হইলেও নিরপেক্ষতা রক্ষা করিয়া সাংবিধানিক কর্তব্য সম্পাদন তাহার পক্ষে সুকঠিন হইত।

এই প্রথা গৃহীত হইলে রাজ্যপাল বিধানসভার বৃহত্তম দলের ক্রীড়নক হইয়া পড়িতেন। দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে তিনি থাকিতে পারিতেন না।

সংবিধান পরিষদের সদস্যগণ একটি বৃহত্তর ও গুরুতর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তাহারা নানাদিক বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতে হইবে। যে সকল কারণে সংবিধান পরিষদ কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাহা এইস্থানে সংক্ষেপে বিবৃত করা অপরিহার্য। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, ভাষান্ধতা, অনুন্নত জাতি ও উপজাতি সমূহের উন্নতি সাধন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতির তাগিদে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা সুষ্ঠু-ভাবে পরিষদের সদস্যগণের সম্মুখে দেখা দেয়। এইজন্য তাঁহারা কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র গঠনের নীতি গ্রহণ করেন। এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়াই তাহারা স্থির করেন যে রাজ্যপালের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজন। এইজন্য সংবিধান পরিষদ ব্যবস্থা করেন যে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। সাংবিধানিকভাবে রাজ্যপাল একাধারে রাজ্যসরকারের সর্বোচ্চ কর্তা এবং অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি বা এজেণ্ট। একদিকে তিনি রাজ্যের স্বার্থের রক্ষক অন্যদিকে তিনি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি।

রাজ্যপালের নির্বাচনের পক্ষে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনয়নের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত রাজ্যপাল রাজ্যের স্বার্থ অপেক্ষা কেন্দ্রের স্বার্থ রক্ষার্থে বেশি তৎপর হইবার সম্ভাবনা। এই প্রথা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। ভারতে কেন্দ্রমুখীন যুক্তরাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই রাজ্যপাল নিয়োগ প্রথা স্থিরীকৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যপালগণ প্রতি রাজ্যের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল-গণকে পদচ্যুত করিতে পারেন কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যপালগণকে কেবলমাত্র ইমপীচ্মেণ্ট প্রথায় পদচ্যুত করা যায়। এই যুক্তি খণ্ডন করিবার জন্য বলা হইয়া থাকে যে এই তুলনা একান্তই অসমীচীন। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপদ্ধতি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের গঠনপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বস্তুতঃ ভারতীয় সংবিধানে অনেকাংশে কানাডার প্রাদেশিক লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর (উপরাজ্যপাল) নিয়োগের নীতি অনুসৃত

হইয়াছে। সংবিধান পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য আল্লাদি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার পরিষদে এই কথাটির স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছিলেন। কানাডার ডোমিনিয়নে উপরাজ্যপালগণ (Lieutenant-Governor) রাষ্ট্র-প্রধান গভর্ণর জেনারল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনি উপরাজ্যপালগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে উপরাজ্যপালকে কেন পদচ্যুত করা হইল তাহার কারণ দর্শাইতে হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতির সেরূপ কোন বাধ্য-বাধকতা নাই।

৮ রাজ্যপালের শাসন ক্ষমতা

সংবিধানদ্বারা রাজ্যের সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। তিনি এই ক্ষমতা স্বয়ং অথবা তাহার অধীনস্থ কর্মচারী-বৃন্দের সাহায্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে সকল বিষয়ে রাজ্য বিধান-মণ্ডলী আইন প্রণয়ন করিবার অধিকারী সেই সমস্ত বিষয়েই রাজ্যপালের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিস্তৃত। কিন্তু প্রথানুযায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যসকল মন্ত্রীবর্গকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই বিষয়েও কার্যতঃ রাজ্যপালের মনোনয়ন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। কারণ বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে তাহার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী যে সকল মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়োগ করিতে বলেন সেই অনুসারেই রাজ্যপাল অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করেন। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের কার্যকাল সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী রাজ্যপালের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। রাজ্যপাল বিভিন্ন মন্ত্রীবর্গের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পন করেন। রাজ্যের সকল প্রশাসনিক কাজকর্ম রাজ্য-পালের নামেই চলে, কারণ তিনিই রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তিনিই রাজ্যের প্রধান আইনজ্ঞ কর্মচারী এ্যাডভোকেট জেনারেলকে এবং রাজ্য সরকারী চাকুরী কমিশনের সদস্যগণকে নিয়োগ করেন। শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করিবার জন্য রাজ্যপাল নিয়মাবলীও প্রণয়ন করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, রাজ্যপালের এই সকল ক্ষমতা বস্তুতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীরই ক্ষমতা এবং যতদিন মন্ত্রীমণ্ডলীরই পশ্চাতে বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন রহিয়াছে ততদিন মন্ত্রীমণ্ডলী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু কতকগুলি বিষয়ে রাজ্যপালের আপন বিচারবুদ্ধি-অনুযায়ী কাজ করিবার অধিকার আছে। সেই সকল স্থলে তিনি মন্ত্রী-মণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য নহেন।

উপজাতি কল্যাণ সম্বন্ধে রাজ্যপালকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। যে সকল রাজ্যে এই উপজাতি সমস্যা বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে সেই সকল রাজ্যে রাজ্যপাল উপজাতি কল্যাণের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া থাকেন। বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা এইরূপ তিনটি রাজ্য। আসামে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল শাসনের জন্য রাজ্যপালকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলে এই বিশেষ ক্ষমতার উল্লেখ আছে।

রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিলে রাজ্যপাল প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হন। তখন সকল প্রশাসনিক ও আইনগত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির বিশ্বস্ত স্থানীয় প্রতিনিধিরূপে স্থায়ী কর্মচারীগণের সাহায্যে প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তেমনি কোন রাজ্যে সংবিধান অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িলে বা রাজ্যের দারুণ অর্থসংকট উপস্থিত হইলে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দ্বারা সাময়িকভাবে নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই দুই অবস্থাতেই রাজ্যপালের হাতে অনেক প্রকৃত ক্ষমতা আসিয়া পড়ে।

রাজ্যপালের আইন প্রণয়ন বিষয়ক ক্ষমতা

রাজ্যপাল রাজ্যের বিধানমণ্ডলীর অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিধানমণ্ডলী বলিতে রাজ্যপাল, বিধানসভা ও বিধান পরিষদ (যে সব রাজ্যে দ্বিতীয় কক্ষ বর্তমান) বুঝায়। কিন্তু রাজ্যপাল বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হইতে পারেন না। তিনি রাজ্য বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আহ্বান ও রাজ্যপালরূপে বিধানমণ্ডলীতে ভাষণ দান করেন। বিধানমণ্ডলীতে তিনি বাণী প্রেরণ করিতে পারেন এবং পুনরায় আহ্বান না করা পর্যন্ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য অধিবেশনের অবসান ঘটাইতে পারেন। বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতাও রাজ্যপালকেই দেওয়া হইয়াছে।

আর্থিক বৎসর শুরু হইবার পূর্বে তিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী কর্তৃক বিধান সভায় বাজেট পেশ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। নূতন বছরের আনুমাণিক আয়-ব্যয় ও চলতি বছরের (অর্থাৎ যে বৎসর শেষ হইতে চলিয়াছে) আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব এই বাজেটের অন্তর্ভূক্ত হয়। তাহার সুপারিশ ব্যতীত ব্যয় মঞ্জুরীর জন্য কোন দাবি উত্থাপন করা যায় না। বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তিনি উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়া থাকেন। এই ভাষণে মন্ত্রীমণ্ডলীর

সরকার-পরিচালন নীতি প্রতিফলিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ এই ভাষণ মন্ত্রীমণ্ডলীকর্তৃক প্রস্তুত হইয়া থাকে।

যে সকল বিল বিধানমণ্ডলী কর্তৃক পাশ হয় সেই সকল বিলই রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য তাহার নিকট প্রেরিত হয়। এই বিষয়ে রাজ্যপালকে কতকগুলি বিকল্প ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে। (1) তিনি বিলটি অনুমোদন করিতে পারেন, (2) অনুমোদন করিতে অস্বীকার করিতে পারেন, (3) এই দুই পন্থার একটিও অবলম্বন না করিয়া রাষ্ট্রপতির সম্মতি বা অসম্মতির জন্য বিল তাহার নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, (4) রাজ্যপাল নিজ অভিমত সম্বলিত বাণীসমেত বিলটির অন্তর্গত কোন বিশেষ ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অথবা কোন ভাবে বিলটি সংশোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বিলটি বিধানমণ্ডলীর নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। এইরূপ অবস্থায় বিধানমণ্ডলী রাজ্যপালের সুপারিশ আলোচনা করিতে বাধ্য থাকেন। বিধানমণ্ডলী রাজ্যপালের মত গ্রহণ করিতে পারে বা অগ্রাহ্য করিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রে বিল যদি পুনরায় রাজ্যপালের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় তাহা হইলে যে রূপেই ফিরিয়া আসুক না কেন রাজ্যপালকে বিলে সম্মতি দিতেই হইবে। অর্থবিল রাজ্যপাল বিধানমণ্ডলীর নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠাইতে পারেন না। তিনি হয় সম্মতি দিবেন অথবা সম্মতি দিতে অস্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ এই দ্বিতীয় ক্ষমতাটি রাজ্যপালের নাই। সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাহাকে কাজ করিতে হয়। সেইজন্য বিধানমণ্ডলী হইতে যেরূপে অর্থবিল পাশ হইয়া আসে তাহাই রাজ্যপালকে অনুমোদন করিতে হয়। সংবিধানে আরও বলা হইয়াছে যে যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে কোন বিল হাইকোর্টের মর্যাদা বা ক্ষমতার পরিপন্থী তাহা হইলে তিনি বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি বা অসম্মতির জন্য উহা প্রেরণ করিবাব ব্যবস্থা করিতে পারেন।

বিধানমণ্ডলীর অধিবেশনের কাল ব্যতীত অন্য সময়ে অর্থাৎ বিধানমণ্ডলীর ছুটি বা অবসর সময়ে রাজ্যপাল যদি মনে করেন যে রাজ্যে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক, তখন তিনি ঐ পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য হুকুম আইন (অর্ডিন্যান্স) প্রণয়ন করিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ব্যতীত নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে হুকুম আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা রাজ্যপালের নাই। (1) যে যে বিষয়ে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমতি ব্যতীত রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বিল উত্থাপণের ক্ষমতা নাই ; (2) যে যে বিষয়ে বিল

প্রণয়ন করিতে হইলে রাজ্যপাল সেই বিল সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতির অভিমতের জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া থাকেন ; (3) যে যে বিষয়ে রাজ্য বিধানমণ্ডলী কর্তৃক প্রণীত বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত আইনে পরিণত হইতে পারে না ।

(হুকুম আইনের (Ordinance) মর্যাদা বিধানমণ্ডলীকৃত আইনেরই মত এবং তেমনি বাধ্যতামূলক। বিধানমণ্ডলী যখন অধিবেশনে মিলিত হয় তখন হুকুম আইনটি বিধানমণ্ডলীতে উপস্থাপিত করিতে হয় এবং যদি বিধানমণ্ডলী উহা অনুমোদন না করে তাহা হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। রাজ্যপাল যে কোন সময়ে হুকুম আইন প্রত্যাহার করিয়া লইতে পারেন ।)

রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা

(রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তার আসনে আসীন। যে সকল ক্ষমতা রাজ্যপালকে দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি ব্যতীত অন্য সকল ক্ষমতাই কার্যতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত। যে সকল বিষয়ে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুসারে তিনি কাজ করিতে বাধ্য নহেন সেই সকল ক্ষমতাগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।)

(1) মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ সম্বন্ধে তাহার আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত লইবার অধিকার আছে। এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাটি অনেকাংশে সীমিত। কারণ মন্ত্রীমণ্ডলীকে বিধানসভার অধিকাংশের সমর্থন পুষ্ট হইতে হয়। এই জন্য যে দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ তাহার নেতাকেই রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিযুক্ত করিতে হয়। নতুবা তিনি স্থায়ী রাজ্যসরকার গঠন করিতে পারেন না এবং রাজ্য শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনে তাহাকে ব্যর্থ হইতে হয়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে কোন দলেরই বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই। এইরূপ অবস্থায় রাজ্যপালের এই ক্ষমতাটি প্রকৃত ক্ষমতা হইয়া দাঁড়ায়।

(2) যদি রাজ্যের বিধানসভার সরকার পক্ষের কয়েকজন সদস্য দলত্যাগ করিয়া বিরোধীর ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ইহার ফলে মন্ত্রীমণ্ডলী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিতে পারেন। এখানে তাহার ক্ষমতা স্বেচ্ছাধীন ও নিরঙ্কুশ। উপরোক্ত অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার অধিবেশনের অবসান করাইয়া দিতে অনুরোধ করিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিতে অনুরোধ

করিতে পারেন কিন্তু রাজ্যপাল সে পরামর্শ গ্রহণ না'ও করিতে পারেন যদি তিনি আপন বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী মনে করেন যে বিরোধী সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে এবং তাহারা মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সক্ষম।

(3) রাজ্যপাল যদি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন যে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-মণ্ডলী দুর্নীতি পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন অথবা তাঁহারা এমন সকল আচরণে লিপ্ত হইয়াছেন যাহার দ্বারা জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতি বিপন্ন হইতে পারে তাহা হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির সহিত পরামর্শান্তর মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করিয়া দিতে পারেন। এই ক্ষমতা রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্গত হইবার যৌক্তিকতা আছে এই কারণে যে মন্ত্রীমণ্ডলী পূর্বোক্তরূপে ব্যবহার করিলে তাঁহারা পদাধিকার করিবার সময় যে শপথ গ্রহণ করেন তাহা ভঙ্গ করিবার দোষে দোষী হইয়া থাকেন।

(4) সাধারণ অবস্থায় সাংবিধানিক আয়ুষ্কাল শেষ না হইলে বিধান-সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় না। কিন্তু মন্ত্রীসভা বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে মন্ত্রীমণ্ডলী বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের সুযোগ আছে। তিনি যদি পরিস্থিতি বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে বিরোধী সদস্যগণ স্থায়ী মন্ত্রীসভা গঠন করিতে সমর্থ তাহা হইলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ নাও করিতে পারেন।

(5) সংবিধানের 167 (ক) ধারা অনুসারে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর নিকট রাজ্যের আইন বা প্রশাসনিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য চাহিয়া পাঠাইতে পারেন। কি কি তথ্য তিনি জানিতে চাহিবেন তাহা স্থির করিবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তাহার আছে। সংবিধান দ্বারা মুখ্যমন্ত্রী তথ্য জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। এই বিষয়টিও রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অন্তর্গত।

(6) যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয় সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যদি ঐ বিষয় মন্ত্রীপরিষদে আলোচিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ দিতে পারেন যে ঐ বিষয়টি মন্ত্রীপরিষদে আলোচিত হউক।

(7) রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া কোন বিলে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে পারেন অথবা বিধানমণ্ডলীতে পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। এই বিষয়েও তিনি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে বাধ্য নহেন।

(8) বিধানমণ্ডলী দ্বারা গৃহীত বিল রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও তিনি তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী।

(9) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কতকগুলি বিষয় সম্বন্ধে হুকুম আইন (Ordinance) প্রণয়ন করিবার পূর্বে রাজ্যপালের পক্ষে রাষ্ট্রপতির নিকট হইতে উপদেশ প্রার্থনা করা বাধ্যতামূলক। এই বিষয়েও মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ তিনি লইতে বাধ্য নহেন। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে হুকুম আইন প্রণয়ন করিতে হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অপরিহার্য।

(10) রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হইবে কি না—এই বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি রাষ্ট্রপতিকে আপন মতামত জানাইয়া দিবার অধিকারী। তাহার এই অধিকারটিও নিরঙ্কুশ এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ দ্বারা সীমিত নহে।

(11) আসামের রাজ্যপালকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে ঐ সকল ক্ষমতা রাজ্যপালের নিজস্ব বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ব্যবহৃত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক বিষয় এবং খনি সম্পদ হইতে আসাম ও স্বায়ত্বশাসিত জেলার পরিষদের মধ্যে সরকারী লভ্যাংশ বণ্টন বিষয়ে কোন বিবাদ মীমাংসা এই পর্যায়ে পড়ে। উপরোক্ত দুইটি বিষয়ে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী করা হইয়াছে।

মন্ত্রীমণ্ডলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে সংবিধানে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক নেতৃত্ব রাজ্যপালের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা মন্ত্রীমণ্ডলীই ব্যবহার করেন। সংবিধান পরিষদের এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তবে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ইচ্ছাধীন ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারেন। এই বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা হইয়াছে।

রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্য সকল মন্ত্রীকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। মন্ত্রীমণ্ডলী যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়িত্বশীল। সকল মন্ত্রীকেই হয় বিধানসভা অথবা বিধান পরিষদের সদস্য হইতে হয়। রাজ্যপাল ইচ্ছা করিলে, যে ব্যক্তি বিধানমণ্ডলীর কোন সভারই সদস্য নহেন, এমন ব্যক্তিকেও মন্ত্রীপদে নিয়োগ করিতে পারেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাহাকে হয় বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য হইতে হইবে। নতুবা তাহার মন্ত্রীত্বের অবসান

হয়। সংবিধানে বলা হইয়াছে যে মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গের কার্যকাল রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন, কিন্তু প্রথানুযায়ী কার্যতঃ যতদিন পর্যন্ত মন্ত্রীমণ্ডলী বিধানসভার অধিকাংশের আস্থাভাজন থাকেন, ততদিন তাহারা মন্ত্রীপদে আসীন থাকিতে পারেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর সামাজিক গঠন

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইবার পর হইতে যে সকল মন্ত্রীসভা পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলীর সামাজিক গঠনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। এই সূত্রে পশ্চিমবঙ্গে 1950 সাল হইতে 1952 সাল পর্যন্ত বিগত পঁচিশ বৎসরে যে সকল মন্ত্রীসভা গঠিত হইয়াছে তাহার সামাজিক বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠী ঐ সকল মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়াছে। এই বিষয়ে একটা ধারাবাহিকতাও লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীতে যে সমাজগোষ্ঠীর মানুষ স্থান পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে বর্ণহিন্দুর প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, প্রতি মন্ত্রীসভায় মুসলমান, আদিবাসী, তপ্‌শীলী সম্প্রদায়ের মানুষ, নারী, দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলের নেপালী ভাষা-ভাষী ব্যক্তি ও পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী রাজস্থানী সম্প্রদায়কে স্থান দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠী বা প্রভাবশীল অংশ যাহাতে মন্ত্রীসভায় থাকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ ব্যবস্থা সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায়-নীতি সম্মত বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আদিবাসী, তপ্‌শীলী সম্প্রদায় ও নারীগণের প্রতি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্দেশে ন্যায় বিচারের অপরিহার্যতা উল্লিখিত হইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্ত্রীমণ্ডলীতে ঐ কয়টি সামাজিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব (representation) সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীর সামাজিক গঠন তলাইয়া দেখিলে ধরা পড়ে যে মন্ত্রীমণ্ডলীতে ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য থাকে। এই প্রাধান্য প্রায়ই সংখ্যাগত ও প্রভাবগত দুই ভাবেই লক্ষিত হয়। চতুর্থতঃ, প্রকৃত কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় সকল বিধানমণ্ডলীতে খুবই অল্প, এই কারণে মন্ত্রীসভার মধ্যেও তাহাদের দেখিতে পাওয়া যায় না। বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণের মধ্যে যাঁহারা নিজেদের কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ বলিয়া দাবি করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। সুতরাং সামাজিক বিন্যাসে হয়তো তাঁহারা শ্রমিক বা কৃষক আন্দোলনে কিছু পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু তাহা নিরর্থক। তাহাদিগকে কৃষক বা শ্রমিক বলা

চলে না। ইদানিংকালে অল্পসংখ্যক বিত্তবান কৃষক বিধানমণ্ডলীতে নির্বাচিত হইতেছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দুই একটি রাজ্যে মন্ত্রীপদে নিযুক্তও হইয়াছেন। পঞ্চমতঃ, যে সকল রাজ্যে বিধানপরিষদ বর্তমান, সেই সকল রাজ্যে বিধানপরিষদ হইতেও কতিপয় মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ষষ্ঠতঃ, পেশার দিক দিয়া বিচার করিলে দৃষ্ট হয় যে আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক, শিল্প বাণিজ্যের সহিত যুক্ত ব্যক্তিবর্গ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, সম্পন্ন কৃষক এবং কৃষক ও শ্রমিক নেতাগণ মন্ত্রী-মণ্ডলীতে স্থান পাইয়া থাকেন। সপ্তমতঃ, রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল এবং জনবহুল জেলাগুলি হইতে নির্বাচিত সদস্যগণের ভিতর হইতে মন্ত্রী মনোনীত হইয়া থাকে। অষ্টমতঃ, রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রথম শ্রেণীর নেতৃবর্গ, যাঁহারা সদস্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদেরও মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান দেওয়া হয়, নতুবা মন্ত্রীসভার গুরুত্ব কমিয়া যায়। বলা বাহুল্য যে সকলক্ষেত্রেই মন্ত্রী মনোনয়ন দলের সদস্যবৃন্দের মধ্য হইতেই হইয়া থাকে।

কেন্দ্রের মন্ত্রীমণ্ডলীর সমাজ গঠন

কেন্দ্রেও বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মানুষ মন্ত্রীসভায় স্থান পাইয়া থাকেন। রাজ্যের মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে যে সকল উপদান (factor) কার্যকর হয়, কেন্দ্রেও সেই সকল উপাদান সক্রিয় হইয়া থাকে। এইগুলি ব্যতীত কেন্দ্রে আরও দইটি অতিরিক্ত সমস্যা দেখা দেয়। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন মন্ত্রীমণ্ডলীতে যথাসম্ভব প্রতি রাজ্য হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণের মধ্য হইতে মন্ত্রীগণ মনোনীত হইয়া থাকেন। নতুবা যে রাজ্যের সদস্যগণের ভিতর হইতে কোন মন্ত্রীই নিযুক্ত হন না সেই রাজ্যের সদস্যগণ ও জনসাধারণ কেন্দ্রের উপর বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যের জনসংখ্যাও একটি মাপকাঠি যাহার দ্বারা মন্ত্রীমণ্ডলীতে ঐ রাজ্যের সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান পাইয়া থাকেন। এই কারণেই উত্তর প্রদেশের সংসদ সদস্যগণ মন্ত্রীমণ্ডলীর গঠনে সংখ্যাগত ভাবে সিংহ-ভাগ পাইয়া থাকেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীর কার্যাবলী (Functions)

মন্ত্রীমণ্ডলী মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যশাসনের মূলনীতি নির্ধারণ করেন। এই বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীর দায়িত্ব গুরুতর ও ব্যাপক। আধুনিক কালে সরকারের কর্তব্যাদি নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। সামাজিক, রাজনৈতিক

ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারকে নানা দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে হয়। এই সকল নীতি ও দায়িত্ব যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করিতে হইলে যে সময় দেওয়া প্রয়োজন এবং প্রতি বিষয় সম্বন্ধে যে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা আবশ্যক তাহা মন্ত্রীমণ্ডলীর সদস্যগণের থাকে না। এই জন্য মন্ত্রীমণ্ডলীকে নির্ভর করিতে হয় স্থায়ী সরকারী কর্মচারীগণের উপর (permanent civil service)। মন্ত্রীমণ্ডলী নীতি নির্ধারণ করেন, এই নীতির রূপায়ণের দায়িত্ব সরকারী কর্মচারীগণের। সকল দেশেই বর্তমান সংসদীয় গণতন্ত্র এই দুই-এর মিলিত প্রচেষ্টায় সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। যাহাতে মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত প্রশাসন নীতি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয় তাহা পরিদর্শন করার ভার মন্ত্রীগণের উপর ন্যস্ত আছে। সুতরাং শাসনযন্ত্রকে ঠিক পথে পরিচালিত করা মন্ত্রীমণ্ডলীর দ্বিতীয় কর্তব্য। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্ডলীকে আইন প্রণয়নে নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হয়। বিধানমণ্ডলী আইন প্রণয়ন কর্তা সন্দেহ নাই কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে কার্যতঃ এই ক্ষমতার নেতৃত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীকে গ্রহণ করিতে হয়। তাহার কারণ এই যে মন্ত্রীমণ্ডলীতে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবর্গ রহিয়াছেন। চতুর্থতঃ, সরকারী আয় ব্যয়, কোন নূতন কর স্থাপন, কোন কর প্রত্যাহার বা হ্রাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই বিধানমণ্ডলীর ক্ষমতাভুক্ত; কিন্তু এই সকল বিষয়ে মন্ত্রীমণ্ডলী বিশেষতঃ মন্ত্রীপরিষদ বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যের আয় ব্যয় ও কর সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত উত্থাপন করা চলে না। রাজ্যপাল এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে মন্ত্রীগণের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, কারণ তাহারাই রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত বিশ্বস্ত কার্যনির্বাহক।

মন্ত্রীপরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলী

সংবিধানে মন্ত্রীমণ্ডলীর (Council of Ministers) উল্লেখ আছে। রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যের কার্য পরিচালনা করিবেন বলিয়া সংবিধানে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। মন্ত্রীমণ্ডলী সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর মন্ত্রীদের লইয়া গঠিত হয়। পরপর মর্যাদা অনুযায়ী তাহারা হইতেছেন মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী। কেন্দ্রেও ঐরূপ শ্রেণীভেদ আছে। কেন্দ্রে যেমন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রথাগতভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারগোষ্ঠি অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদ গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি রাজ্যে রাজ্যেও মন্ত্রীমণ্ডলীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট একটি মন্ত্রী বৈঠক গড়িয়া উঠীয়াছে। ইহাকে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট বলা যাইতে পারে।

ক্যাবিনেট অপেক্ষাকৃত ছোট বলিয়া জরুরী বিষয়ে গোপন আলোচনা দ্বারা রাজ্যশাসন নীতি নির্ধারণের সুবিধা হয়। মন্ত্রীপরিষদে কোন রাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করিলে আহ্বান করিতে পারেন যদি উক্ত রাষ্ট্রমন্ত্রীর বিভাগীয় কোন বিষয় মন্ত্রীপরিষদে আলোচিত হয়। উপমন্ত্রী-গণকে সাধারণতঃ আহ্বান করা হয় না। যদিও প্রথাগতভাবে রাজ্যের সুবিধার জন্য মন্ত্রীপরিষদের উদ্ভব হইয়াছে, তথাপি মন্ত্রীপরিষদই কার্যতঃ শাসনতন্ত্রে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। মন্ত্রীপরিষদ যে নীতি গ্রহণ করেন অন্যান্য মন্ত্রীগণও তাহা মানিয়া লন। এই প্রথাগত নিয়মটি একটি স্থির নীতি হইয়া দেখা দিয়াছে।

ক্যাবিনেট দপ্তর (Cabinet Secretariat)

কেন্দ্রে যেমন একটি ক্যাবিনেট দপ্তর বা Cabinet Secretariat গড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনি প্রতিরাজ্যে একটি করিয়া Cabinet Secretariat স্থাপিত হইয়াছে। ক্যাবিনেট এবং মন্ত্রীমণ্ডলীর সভা ও আলোচনা সম্বন্ধে সমস্ত কাগজপত্র ও দলিলাদি রক্ষা, ক্যাবিনেট কার্যাবলীর বিবরণী প্রভৃতি প্রস্তুত ও তাহা মন্ত্রীগণকে সরবরাহ এবং সর্বপ্রকার করণিক সাহায্য প্রদান এই দপ্তরের কর্তব্যের অন্তর্গত। ক্যাবিনেট দপ্তর মুখ্য-মন্ত্রীর পরিচালনাধীন।

(1) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সংবিধান অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং তাহার কার্যকালও রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন।

মুখ্যমন্ত্রীকে বিধানসভার অথবা বিধানপরিষদের সদস্য হইতে হইবে। বিলাতে প্রথাগতভাবে কেবলমাত্র কমন্স্ সভার সদস্যই প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন ; লর্ড সভার সদস্যকে রাজা বা রানীর প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত

করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী যে কোন একটি সভার সদস্য হইলেই চলে। বিধানসভা বা বিধান পরিষদের সদস্য নহেন, এমন ব্যক্তিকেও রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করিতে পারেন কিন্তু তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে যে কোন একটি সভার সদস্য হইতে হইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। তাহার কার্যকালও রাজ্যপালের ইচ্ছাধীন। কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে রাজ্যপালের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের অধিকার কার্যতঃ অত্যন্ত সীমিত। কারণ বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই তাহার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতপক্ষে যতদিন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ও তাহার মন্ত্রীমণ্ডলীর পশ্চাতে বিধানসভার অধিকাংশের সমর্থন থাকে ততদিন মুখ্যমন্ত্রী তাহার পদে আসীন থাকেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের এই নিয়ম যেমন প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে প্রযোজ্য, মুখ্যমন্ত্রী সম্বন্ধেও তেমনিই প্রযোজ্য। রাজ্যপাল মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যের শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথাগতভাবে মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ গ্রহণ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই। তবে রাজ্যপালের কয়েকটি বিষয়ে ইচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretionary power) আছে; এই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাহার মন্ত্রীমণ্ডলীর পরামর্শ লইতে অস্বীকার করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কিন্তু সে সুযোগ নাই। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর তরফ হইতে তাঁহাকে যে কাজ করিতে বলেন প্রথাগতভাবে রাষ্ট্রপতি তাহাই করিতে বাধ্য থাকেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানী এবং প্রধানমন্ত্রীর সহিত যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ভারত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সহিত ঠিক সেই সম্বন্ধই বিদ্যমান।

মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণকে তাহাদের পদে আসীন হইবার পূর্বে রাজ্যপাল তাহাদিগকে শপথ বাক্য পাঠ করান এবং প্রতিজ্ঞা করাইয়া লন যে সরকারী কাজে প্রয়োজনীয় গোপনতা রক্ষা করিয়া চলিবেন। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণের বেতন বিধানমণ্ডলী স্থির করিয়া দেয়।

বস্তুতঃ সকল প্রশাসনিক কার্য রাজ্যপালের নামেই চলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রশাসনের কার্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। সংবিধানে লিখিত হইয়াছে যে রাজ্যপালই বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলীর বিভিন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্রীরই পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল বিভাগ বণ্টন করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যপালের স্বাধীন ক্ষমতা নাই। সংবিধানের 167 ধারা অনুসারে মুখ্যমন্ত্রীর উপর রাজ্যপাল সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, রাজ্যের প্রশাসন, প্রস্তাবিত আইন বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যপালকে সকল সংবাদ দিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল যদি ঐ দুইটি বিষয়ে কোন তথ্য জানিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে মুখ্যমন্ত্রীকে ঐ তথ্য রাজ্যপালকে জানাইতে হয়। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক আলোচিত হয় নাই এইরূপ কোন বিষয়ে যদি কোন মন্ত্রী সিদ্ধান্ত লইয়া থাকেন, তাহা মন্ত্রীমণ্ডলী কর্তৃক বিচার-বিবেচনা করিবার জন্য রাজ্যপাল নির্দেশ দিলে মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের নির্দেশ অনুসারে কাজ করিতে হয়। মন্ত্রীমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্বের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই এই নির্দেশ সংবিধানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(2) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীমণ্ডলী

মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর স্রষ্টা ও অধিনায়ক। তিনিই মন্ত্রীগণকে বাছিয়া লইয়া থাকেন এবং তাহার পরামর্শ অনুযায়ী রাজ্যপাল মন্ত্রীগণকে নিয়োগ করেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দলের নেতৃস্থানীয় অন্যান্য ব্যক্তিকে সাধারণতঃ মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান দিতেই হয়। তাহারই পরামর্শে রাজ্যপাল দপ্তর বণ্টন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে রাজ্যপালের এই মন্ত্রী নিয়োগ ও দপ্তর বণ্টন বিষয়ে স্বাধীন ক্ষমতা নাই। মুখ্যমন্ত্রী দপ্তরগুলির পুনর্বণ্টন এবং এক মন্ত্রীকে অন্য দপ্তরে স্থানান্তরিতও করিতে পারেন। রাজ্যপালের মাধ্যমে তিনি যে কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতেও পারেন। তিনি নিজে পদত্যাগ করিয়া সমগ্র মন্ত্রীসভাই ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং নূতন মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করিতে পারেন অথবা রাজ্যপালকে পরামর্শ দিতে পারেন যে বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হউক।

মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্যকে লইয়া মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট গঠন করিয়া থাকেন। মন্ত্রীমণ্ডলী সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রথাগতভাবে উদ্ভুত মন্ত্রীপরিষদ মন্ত্রীমণ্ডলীর সকল ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে। মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত মন্ত্রীমণ্ডলীকে মানিয়া লইতে হয়। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের সদস্যগণকে মনোনীত করেন বটে, তবে প্রধান প্রধান দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণকে মন্ত্রীপরিষদে বা ক্যাবিনেটে তিনি স্থান না দিয়া পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদে সভাপতিত্ব করেন। তাহার ইচ্ছানুযায়ী মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেটের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের তারিখ, স্থান ও কাল তিনিই স্থির করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন এবং সরকারী নীতিকে একটি সামগ্রিকতা ও একত্ব দান করিয়া থাকেন। সাধারণভাবে প্রতিটি দপ্তরের উপর তাহার নজর রাখিতে হয় যাহাতে সরকারের নীতি ও

কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে। বিভিন্ন বিভাগের সহিত কোন মতদ্বৈধ উপস্থিত হইলে মুখ্যমন্ত্রী তাহার সমাধান করিয়া থাকেন। বিভিন্ন মন্ত্রীগণ বিভাগীয় কোন সমস্যার সমাধানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ লইয়া থাকেন। এইরূপ অবস্থায় উপযুক্ত উপদেশ দিয়া বিভাগীয় মন্ত্রীকে সহায়তা করা মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম কর্তব্য। বিভিন্ন বিভাগের উপর সাধারণ তদারকি ও মন্ত্রীকে পরামর্শ দান প্রভৃতি কার্যাবলী তাঁহাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ধীর স্থির ভাবে সম্পন্ন করিতে হয়, যাহা দ্বারা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মনে না করেন যে তাহার দপ্তর পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রী অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছেন। ক্যাবিনেটে মুখ্যমন্ত্রীর আসনের মর্যাদা তাহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি, কৌশল, বিচক্ষণতা ও সর্বোপরি তাহার ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে।

(3) মুখ্যমন্ত্রী ও আইনসভা

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা, এই জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। মুখ্যমন্ত্রীরূপে তিনি সমগ্র বিধানমণ্ডলীর নেতা। বিধানসভার অভ্যন্তরেও তিনি প্রায়শ: নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অর্থাৎ তিনি নিজেই বিধানসভার নেতা (Leader of the House) হইতে পারেন এবং অধিবেশনের সময় প্রাত্যহিক কার্যাবলী সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করিলে বিধানসভার নেতা (Leader of the House) হিসাবে অন্য কোন মন্ত্রীর নিয়োগের ব্যবস্থা করিতেও পারেন। তাহাকে বিধানমণ্ডলীর নিজ দলীয় সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। বিধানমণ্ডলীর সরকারী দলের সভায় ঐ যোগাযোগের সুবিধা ঘটিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বিরোধী দলগুলির সহিত বিশেষত: তাহাদের নেতৃবর্গের সহিত তাহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করাও অত্যাবশ্যক। তিনি বিধানমণ্ডলীতে সরকারী দলের নেতৃত্ব করেন বলিয়া তাহাকেই গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নীতি ও বিল সম্বন্ধে বিধানমণ্ডলীতে বক্তৃতা করিয়া সরকারী নীতি বা উত্থাপিত বিল সমর্থন করিতে হয়। বিধানমণ্ডলীতে কোন সমস্যা দেখা দিলে তাহা সমাধানের জন্য তাহাকেই মুখ্য ভূমিকা লইতে হয়।

(4) মুখ্যমন্ত্রী ও জনসাধারণ

মুখ্যমন্ত্রীর দল জনসাধারণের সমর্থনেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইজন্য জনসাধারণের প্রতি সরকারী দলের রাজনৈতিক দায়িত্ব এক

হিসাবে প্রত্যক্ষ। জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সেইজন্য মন্ত্রীমণ্ডলীর পক্ষে অপরিহার্য। যদি মন্ত্রীমণ্ডলী এই রাজনৈতিক কর্তব্যে অবহেলা করে তাহা হইলে পরবর্তী নির্বাচনে সরকারী দল পূর্বের ন্যায় জনসাধারণের সমর্থন লাভ না করিতে পারে। এইজন্য জনসাধারণের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করিতে মুখ্যমন্ত্রীকে তৎপর হইতে হয়। সরকারের বিভিন্ন বিষয়ক নীতি জনসাধারণ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট হইতেই জানিতে চায়। কারণ তিনিই মন্ত্রীমণ্ডলীর নেতা। অন্যান্য মন্ত্রীগণ সাধারণতঃ নিজ নিজ দপ্তর সম্বন্ধে প্রচার কার্য চালাইয়া থাকেন কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যে কোন দপ্তরের কার্যাবলী এবং প্রশাসনিক মূলনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে জানাইবার অধিকারী। জনসাধারণের সহিত সংযোগ রক্ষা করিলে জনমত কোন্ নীতি বা আইন সম্বন্ধে কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছে জানা যায় এবং তদনুযায়ী সরকারী নীতির পরিবর্তনও সম্ভব হয়। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা খুবই প্রয়োজনীয়। কারণ জনমত অনুযায়ী শাসনযন্ত্রকে পরিচালনা করাই গণতন্ত্রের মূলকথা। রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা, বক্তৃতা, সংবাদপত্রের বিবৃতি এবং সাংবাদিক সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইতে পারেন তাহাই তাঁহার দলের পক্ষে কাম্য। এই সকল দিকেই মুখ্যমন্ত্রীকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

1952 সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্ট হয় এবং জ্যোতি বসু ঐ পদে নিযুক্ত হন। অজয় মুখোপাধ্যায় তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। যখন 1952 সালে দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসে, তখনও ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। দলীয় পরিস্থিতির ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্যই ঐরূপ বন্দোবস্ত হয়; অন্য দুই একটি রাজ্যেও অনুরূপ ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু উপ-মুখ্যমন্ত্রীর পদ সৃষ্টি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।